প্রবৃত্তি মার্গ।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়
প্রণীত।

দাস গুপ্ত এণ্ড কোং,
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।
৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৬।

মূল্য ২॥০

ভূমিকা।

পূর্ব্বপ্রকাশিত "কি চাই" প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম, "প্রাণি-মাত্রকে আকাঙ্ক্ষাপরতন্ত্র হইতে হইবে, এই তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া আমরা মনুষ্যের সর্ব্বরূপ কার্য্যজগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি।" তাহাতে সকলেই সন্দিহান হইয়া বলিয়াছিলেন, "তাহা কি করিয়া হইতে পারে?" নিবৃত্তিমার্গই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনাদির প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহার স্থলে প্রবৃত্তিমার্গের স্থাপনা করিতে পারিলে, মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য ভিন্নপথগামী হইয়া পড়ে; তজ্জন্য আকাঙ্ক্ষার সর্ব্বময়ত্ব সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াই পূর্ব্বপ্রবন্ধ শেষ করিয়াছিলাম।

এই পুস্তকের কলেবর বহু বিস্তৃত করিয়া প্রকাশ করিতে আমি উপদিষ্ট হইয়াছিলাম। আমার বিবেচনায় ঐরূপ বিস্তার অপরিহার্য্য নহে। যখন পাঠকের নিজের চেষ্টা ব্যতীত সহজ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বোধগম্য হয় না, তখন অত্যন্ত জটিল দার্শনিক বিষয় বোধগম্য হইতেই পারে না। ঐ চেষ্টার মূলে আর একটী বিষয়ের আবশ্যক—অধীত বিষয়ের সহিত কতকটা সহানুভূতি; অন্যথায় বুঝিবার চেষ্টা আইসে না। তাহা কিছু না থাকিলে, এই গ্রন্থের কলেবর শতগুণ বৃদ্ধি করিলেও ফললাভ করা যাইত না। আর তাহা থাকিলে, যাহা লেখা হইয়াছে তাহাতেই কতকটা কার্য্য হইতে পারে।

'ক' চিহ্নিত শ্লোকগুলি আমার হইয়া পণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুচরণ তর্করত্ন মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আর আমার কোন আত্মীয় এই গ্রন্থের বহু অশুদ্ধি সংশোধন করিয়াছেন। যাহা রহিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন—অন্যে দায়ী। ইঁহাদের উভয়ের নিকট আমি এজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। ইঁহারা কেহই এই পুস্তকের মতামতের জন্য দায়ী নহেন। গীতার শ্লোকের যে সমস্ত অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের কৃত অনুবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তির আলোচনাস্থলে নিম্নলিখিত বিষয়ের উল্লেখ করিতে বাদ পড়িয়াছে :—এই নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তি জৈবনিকের দেহনির্ম্মাণ-মূলক আদি প্রবৃত্তির প্রসার। এই দেহনির্ম্মাতৃপ্রবৃত্তি প্রথমে স্বকীয় দেহনির্ম্মাণকার্য্যে সীমাবদ্ধ থাকে ; পরে ইহা বিস্তৃত হইয়া মাতৃস্নেহরূপে সন্তানে বর্ত্তায় ; ক্রমে উপচিকীর্ষারূপে সমগ্র জীবজগৎকে বেষ্টন করে। আরও প্রশস্ত হইয়া, যখন স্বীয় দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্রজগৎকে বেষ্টন করে, তখন ইহাকে নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তি বলা যায়। ১৩২৫ সাল।

সূচিপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।—শাস্ত্রাদির মূল্য নিরূপণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—ক্রমবিকাশবাদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।—কি চাই?

(প্রবৃত্তির ক্রমবিকাশ)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।—কি করি? অর্থাৎ কর্ত্তব্যকর্ম্ম কি?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।—জ্ঞান কাহাকে বলে ?

প্রবৃত্তি মার্গ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শাস্ত্রাদির মূল্য নিরূপণ।

১। সত্যের অনুসন্ধান।

জগৎপদ্ধতির মধ্যে সত্যের অনুসন্ধানে বহির্গত হওয়া গিয়াছে। সত্যই শ্রেষ্ঠ বন্ধু; আমার, তোমার, হিন্দুর, মুসলমানের, খ্রীষ্টিয়ানের, সকলেরই স্থায়ী বন্ধু। মিথ্যার সহিত বন্ধুতা করিয়া লাভবান্ না হওয়া যায় এমন নহে; সংসারে সহস্র সহস্র লোক জাল জুয়াচুরি করিয়া যে অর্থ-সম্পৎ মান-মর্য্যাদা সঞ্চয় করিয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া হিংসা করা যাইতে পারে, তাহাদের অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে। অনেক জাতিও মিথ্যার সাহায্যে উন্নতি লাভ করিয়াছে; জাল জুয়াচুরির কথা বাদ দিয়া একমাত্র পাশববলের উপর সংস্থাপিত যে উন্নতি, তাহা মিথ্যার উপর স্থাপিত উন্নতি বলা যাইতে পারে; কারণ এই ভিত্তির অসারত্ব, অস্থায়িত্ব প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে এবং কালে আরও হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে। মিথ্যার মন্দির আপাতমনোরম হইলেও তাহা বিশেষ স্থায়ী হইতে পারে না। সত্যের জয়স্তম্ভ কিন্তু চিরস্থায়ী। বাস্তবিক পক্ষে সত্যের ও মিথ্যার মধ্যে স্থায়িত্বের পার্থক্য একটী প্রধান পার্থক্য। এই সত্যের সাক্ষাৎ কোথায় পাইব? কোথায় ইহার বাসস্থান?

"আবার কোথায়? যথায় শতসহস্র যজ্ঞাগ্নি ভূমিকে পবিত্র করিয়াছে, কোটিকোটি মহামন্ত্র লক্ষলক্ষ পূত কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া বায়ুকে পবিত্র করিয়াছে, দেবতা যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব যাহার আকাশ পবিত্র করিতেছেন, সেই সরস্বতী দৃষদ্বতী বিধৌত পুণ্যভূমি—যেথানে তোমার বাস, যেথানে তোমার পিতৃপুরুষগণের বাসস্থান ছিল, যে ভূমিতে তাঁহাদের অস্থি মিশ্রিত রহিয়াছে, যে ভূমি তোমার অস্থিমজ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছে—সেইখানে সন্ধান কর। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রমুখ দেবগণ, নিখিলব্রহ্মাণ্ডপরিজ্ঞাত ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ, যে নিত্যশাশ্বতসনাতন ধর্ম্ম বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শনাদি কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে সন্ধান কর। কেন? তুমি কোথায় জন্মিয়াছ জান কি? তবে সত্যের সন্ধান কোথায় করিতে হইবে তাহা জান না?"

২। মনুষ্যের মেধার অপ্রচুরতাবশত শাস্ত্রাদিতে ভ্রম জন্মিয়াছে।

এই জ্ঞান যখন প্রথম প্রচার হয় তখন এক সুবিধা ছিল—লেখাপড়ার বালাই ছিল না, শ্রুতিস্মৃতির দ্বারাই জ্ঞানের ধারণা হইত। দেবতা ও ঋষিগণ এই সনাতন জ্ঞান কীর্ত্তনকালে কয়েকটী বিষয় কীর্ত্তন করিতে বিরত হইয়াছিলেন: ১ম।—মেধাকে কি উপায়ে অভ্রান্ত অক্ষয় অব্যয় করিতে হয় তাহা কীর্ত্তন করেন নাই। তাহাতে এক বিষম বিপদ উপস্থিত হইল; কালপ্রভাবে মেধার মধ্যে লুকাচুরি খেলা চলিতে লাগিল; শ্রুতি স্মৃতি আর মনের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ধরিয়া রাখা চলিল না—লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যকতা আসিয়া পড়িল। আমরা স্বীকার করিতেছি যে ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণ এবং ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ এই জ্ঞানের প্রচারক। এই জ্ঞানের আয়তন নিতান্ত কম নহে—বেদ ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদই বা কত! এই সমস্ত শাস্ত্র কলিযুগের বহুপূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। এই সমস্ত যাঁহাদের কণ্ঠে বিরাজ করিত এবং শিষ্য উপশিষ্যক্রমে কণ্ঠান্তরে স্থানান্তরিত হইত তাঁহারা সকলেই কি ত্রিকালজ্ঞ, ভ্রান্তিসম্ভব-বিরোহিত ছিলেন? তাহা যদি না হয় তবে যে শাস্ত্র আমরা পাইয়াছি তাহাতে ইঁহাদের মেধার বৈলক্ষণ্যজনিত ভ্রম-

প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে। ইঁহাদের ভ্রমোদ্গার আর ঋষিবাক্য এক হইতে পারে না। এইরূপ ভ্রমপ্রমাদ যে বর্ত্তিয়াছে তাহার প্রমাণ—

বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্নাঃ নানামুনীনাং মতয়োবিভিন্নাঃ।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

নহিলে এ বিভিন্নতা ঘটিল কেন? যদি বলা যায়, তাঁহারাও ত্রিকালজ্ঞ, অন্তত অভ্রান্তমেধাবিশিষ্ট ছিলেন, এইরূপ ভ্রমপ্রমাদ ঘটে নাই; সেস্থলে ভ্রান্তির দ্বিতীয় কারণ আলোচনা করা যাউক।

৩। শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিবার উপকরণের অনিত্যতাজনিত ভ্রম।

এই জ্ঞান নিত্যশাশ্বত হইলেও, যখন তাহা লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যকতা হইয়া পড়িল, তখন ঋষিগণ লিখিবার নিত্যশাশ্বত উপকরণ ব্যবস্থা করিয়া গেলেন না। তমোগুণের আধিক্যপূর্ণ যুগসমূহে এই উপকরণ নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হইয়া পড়িল। বজ্র হইতে নির্ম্মিত কাগজ এবং সপ্ত সাগরের জল যাহা বিধৌত করিতে পারে না, সেকালে এরূপ মসী থাকিলেও, এমন কি সত্যযুগের সাত্ত্বিকভাবাপন্ন কীটসম্প্রদায় শাস্ত্রগ্রন্থের মর্ম্ম বুঝিয়া তাহা উদরসাৎ করিবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিলেও, অন্যান্য যুগে ইহাদের উপদ্রব নিতান্তই ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, নিত্যশাশ্বত পদার্থ, নশ্বর পদার্থকে অবলম্বন করিয়া আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে গ্রন্থসমূহের পুনঃপুন অনুলিপি প্রস্তুত করিতে হইয়াছে; অনেক সময় অনেক গ্রন্থের অনেক নষ্টপ্রায় অংশের পুনর্লিপি প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। এই যুগযুগান্তরব্যাপী লেখকঅনীকিনী সকলেই যদি ত্রিকালজ্ঞ না হয়েন, তবে পুনরায় ভ্রমপ্রমাদের কারণ আসিয়া পড়ে। শাস্ত্রাদির প্রারম্ভ যত প্রাচীন মনে করা যাইবে, এই প্রমাদ তত বৃদ্ধি হইবে। ঋষিগণের সামান্য শিথিলতাবশত এই দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল মনে করিয়া, তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা হয়। অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার সামান্য লিপির স্থায়ী উপকরণের অভাবে ভ্রান্তি-দুষ্ট হইল ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। এই লিপিকরগণ যে ত্রিকালজ্ঞ

ছিলেন না, অনেকে যে আদৌ সাধারণ জ্ঞানবিশিষ্ট ছিলেন না, পাঠান্তরের প্রাচুর্য্যই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। দেশভেদে এই পাঠান্তর এত বেশী যে, একই গ্রন্থের বিভিন্ন অনুলিপিকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে—দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র এবং বাঙ্গালাতে সংরক্ষিত পুরাণেতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র, এমন কি বেদাদির প্রাচীন পুঁথি মিলাইয়া দেখিলেই তাহা বিশেষভাবে জানা যাইবে। লিপিকারগণের অনবধানতা বা স্বেচ্ছাচারিতা বশত শাস্ত্রের ভিতর যে সমস্ত ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সনাতন হইতে পারে না। জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত একটী মাত্র লিপি-প্রমাদে সমাজে কি লোমহর্ষণ ব্যাপার বিধিবদ্ধ হইল—

ইমা নারী রবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে॥

এই ঋকের 'অগ্রের' স্থলে যিনি 'অগ্নে' বসাইয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্য দেখিলেই বেশ বুঝা যাইবে। মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতের স্বহস্তলিখিত পুঁথি বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে কোন গোল ছিল না; কিন্তু এখন তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ বলিয়া যাহা পাওয়া যায়; তাহা ভ্রমশূন্য বলা যাইতে পারে না।*

---

* (ক) সহমরণ স্থলে ঋক্‌বেদের 'অগ্রে' এই পাঠ পরিবর্ত্তিত হইয়া রঘুনন্দনের সময় যেরূপ 'অগ্নে' পাঠ হইয়াছিল, সেইরূপ স্মৃতির পাঠও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ—

১। প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
কামতো ব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহজায়তে॥ ৩।২২৬।

(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ)

এই যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকাকার মিতাক্ষরায় ঐ বচনের অর্থ করিয়াছেন যে, অভক্ষ্য ভক্ষণকারীর (অর্থাৎ বিলাত প্রত্যাগত প্রভৃতি ব্যক্তির) প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ যাইবে না, কিন্তু সমাজে ব্যবহার্য্য হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিনিবন্ধকার জিকনও ঐরূপ 'ব্যবহার্য্য' পাঠই ধরিয়াছেন।

পরবর্ত্তীকালে রঘুনন্দন ঐ বচনস্থ 'ব্যবহার্য্য' শব্দের পূর্ব্বে একটী লুপ্ত অকার ধরিয়া 'অব্যবহার্য্য' এইরূপ শব্দের পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ যাজ্ঞবল্ক্যবচনের অর্থ করিয়াছেন যে, অজ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যাইবে; জ্ঞানকৃত অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃত পাপও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যাইবে, কিন্তু সমাজে ব্যবহার্য্য হইবে না।

৪। ভাষার পরিবর্ত্তনজনিত ভ্রম।

এই সনাতন ধর্ম্ম সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি সর্ব্বকালের জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। ব্যবস্থাপকগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন কিন্তু একটা চিরস্থায়ী ভাষার বন্দোবস্ত করিলেন না। যে ছন্দে ঋষিগণ জ্ঞানের প্রচার করিয়াছিলেন কালক্রমে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, অনেক স্থলে তাহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করাই কঠিন হইয়া পড়িল। বিভিন্ন টীকাকারগণ বিভিন্ন প্রকার অর্থ করিতে লাগিলেন। এরূপস্থলে ঋষিগণের প্রোক্ত শব্দমাত্র পাইয়াছি, তাহার অর্থ পাইয়াছি কিনা সন্দেহ। এখন এক শব্দই ব্রহ্ম বলিলে নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে—এবং ঘটিয়াছেও তাহাই –তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা আবিষ্কার করিতে গেলে বিষম বিপত্তি। নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী অর্থ অনেকে করিয়াছেন কিন্তু গোল হইতেছে যে এই সমস্ত টীকাভাষ্যকারগণের দল সকলেই ত্রিকালজ্ঞ না হইলে পুনরায় ভ্রান্তিপ্রমাদের সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে। সকলেই যে তাহা ছিলেন না, পরস্পরবিরোধী অর্থ করিয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছেন। ঋষিদিগের ত্রিকালের জ্ঞান, শাস্ত্রের অভ্রান্ততা, স্বীকার করিলেও এই ত্রিবিধ স্বাভাবিক কারণে শাস্ত্রের মধ্যে ভ্রান্তি

২। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচপতিতেপতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যোবিধীয়তে॥

(পরাশর সংহিতা)

মাধবাচার্য্য প্রভৃতি ঐ বচনের অর্থ করিয়াছেন যে, পতি অনুদ্দেশ হইলে বা নষ্ট, মৃত, সন্ন্যাসী অথবা ক্লীব হইলে এই পঞ্চ আপৎকালে অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে।

কিন্তু পরবর্ত্তীকালের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এই বচনের 'পতৌ' এই শব্দটির পূর্ব্বে একটী লুপ্ত অকার বসাইয়া অর্থ করিয়াছেন যে, বাক্‌দত্তা কন্যার পতির ঐরূপ কোন একটী দোষ পরে জানিলে ঐ পতির পরিবর্ত্তে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। অন্য কেহ 'পতিরন্যোবিধীয়তে' এই শব্দগুলির মধ্যে একটী অকার বসাইয়া 'অবিধীয়তে' এইরূপ করিয়া অর্থ করিয়াছেন; ঐরূপ হইলেও পত্যন্তর গ্রহণ করিবে না।

রোম ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতে কিন্তু এই দুই স্থানের ন্যায় চিন্তাস্রোতের বিশেষ স্বাধীনতা দেখা যায় না। স্বাধীনতা সংস্থাপনের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা বেশীদূর কৃতকার্য্যও হইতে পারেন নাই। দুই একজন সমধিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি স্বাধীন পথ উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইলেও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বাধীনতা লোপ হইয়া তৎপ্রদর্শিত পথ কিছুদূর স্বাধীনভাবে গমন করিয়া পুনরায় প্রাচীন পথে আসিয়া মিশিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কার্য্য পণ্ড হইতে দেখা যায়। চার্ব্বাকাদি দার্শনিক, বুদ্ধদেবাদি ধর্ম্মোপদেষ্টার, এইরূপই পরিণাম হইয়াছে। উদাহরণস্থলে বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান শাখার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুনরায় সেই দেবদেবী, পুনরায় সেই কর্ম্মকাণ্ড, বৌদ্ধধর্ম্মকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ভারতবর্ষে স্বাধীনচিন্তার এইরূপ অভাব স্থানীয় জলবায়ুর আপেক্ষিক শক্তির অভাববশতঃ ঘটিয়াছে অনুমান করিতে হইবে। মুসলমান রাজত্বের সময় আহেল্‌বিলায়ৎ অর্থাৎ মধ্য এসিয়া হইতে নবাগত সৈনিকপুরুষের অধিক আদর ছিল। দুই তিন পুরুষ এইদেশে বাস করিলেই তাহাদের নাকি শৌর্য্যবীর্য্যের হানি হইয়া যাইত। যে কারণেই হউক, হয়ত চীনদেশ বাদে ভারতবর্ষের ন্যায় এরূপ রক্ষণশীল (Conservative) দেশ আর দেখা যায় না। এখানে প্রাচীনেরই রাজত্ব, নূতন কোন উদ্ভিদ্ এখানকার মাটিতে আদৌ শিকড় বসাইতে পারে নাই। নূতন কিছু উৎপন্ন করিতে হইলে পুরাতনের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ভাস্করাচার্য্য বা তদ্রূপ কোন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ লিখিতেছেন; আভ্যন্তরীণ যুক্তি জ্যোতিষের অকাট্য প্রমাণ, প্রাচীনের দোহাই দিবার কোনই প্রয়োজন নাই। তথাপি তাহাকে বলিতে হইয়াছেঃ—এই শাস্ত্র ব্রহ্মা গণেশকে বলিয়াছেন, গণেশ নারদকে বলিয়াছেন, নারদ সেই বেদব্যাস—যাঁহার উদারস্কন্ধে যে যত ইচ্ছা শাস্ত্রের বোঝা চাপাইয়াছেন—তাঁহাকে বলিয়াছেন, ইত্যাদি। ব্রহ্মা গণেশ বলিলেন বলিয়া কি জ্যোতিষশাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি হইল? ইহার আত্ম-গৌরব যে কত মহান্ তাহা ভারতবাসী বুঝিল না; ব্রহ্মা বিষ্ণুর দোহাই না দিলে তাহা হয়ত স্থানই পাইত না। অথচ আভ্যন্তরীণ

সত্য না থাকিলে এই দোহাইতে সমাজের অপকার ভিন্ন উপকার নাই। স্বয়ং ভগবান্ গীতার ভূমিকা করিতেছেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥
স এবায়ং ময়াতেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যম্হ্যেতদুত্তমম্॥

এই অব্যয়যোগ আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন। মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে বলিলাম।

প্রাচীনের প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধাহেতু, দেবতা, ঋষিগণ যে জ্ঞানরাশি রাখিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী সময়ের লেখকগণ তাহারই ভিতর তাহাদের লেখা প্রবিষ্ট করাইয়া তাঁহাদের কৃতকার্য্য বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা না করিলে, প্রাচীনের স্কন্ধে না চাপাইলে এখানে কোন বিষয়ই গৃহীত হয় না। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, পরবর্ত্তীকালের এই সমস্ত লেখকগণ সকলেই, আদৌ ত্রিকালজ্ঞ ঋষির স্থান পাইতে পারেন না। তাঁহারা আমাদেরই ন্যায় ভ্রান্ত, আমাদেরই ন্যায় স্বার্থপর, আমাদেরই ন্যায় জঠরজ্বালানিপীড়িত। নিজের স্বার্থ সংস্থাপনের জন্য, গৌরববৃদ্ধির জন্য, ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিবার জন্য, মস্তিষ্কের আলোড়ন, লেখনীর সঞ্চালন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের কৃতকার্য্যের জন্য শাস্ত্রাদি বহুল-পরিমাণে বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

কালসহকারে অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থের কলেবর বহু বিস্তারিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমে মাত্র তিন বেদ ছিল, চতুর্থ বেদ ছিল না; ঐ বেদের রচয়িতাগণও কি সেই দেবতা ও ঋষিগণ? বেদের পর ব্রাহ্মণগ্রন্থ অনেক লোপ পাইয়াছে; তত্রাচ যাহা আছে তাহা রাশীকৃত। তাহাদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মত দেখা যায়, বিভিন্নরূপ ভাষা দেখা যায়, ভাবের উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টত্ব দেখা যায়। আরণ্যক, উপনিষদ্, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস সম্বন্ধেও একথা সম্যক্ প্রযুজ্য।

এক সময়ে মহাভারতের সূচী হইয়াছিল; বর্ত্তমান পঞ্চম বেদ সে সূচী পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। এ সমস্তটাই কি বেদব্যাসের লেখা? বর্ত্তমান মহাভারত তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলে হয়ত তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া যাইবে। গীতা অতি পবিত্র গ্রন্থ। অনেকে ইহার এক অধ্যায় সন্ধ্যা-আহ্নিকের ন্যায় পাঠ করিয়া থাকেন। ইহার কিছু অংশ পাঠ না করিলে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয় না। ইহার মধ্যে ভাবের পরস্পর যে সাঙ্ঘাতিক বৈষম্য রহিয়াছে তাহার দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥

হত হইলে স্বর্গ পাইবে। জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব হে কৌন্তেয়! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর।

ইহাও গীতার শ্লোক! এই শ্লোকে গীতার ধর্ম্মব্যাখ্যার শ্রাদ্ধ হইতেছে। পরবর্ত্তী একটী মাত্র শ্লোকের সহিত তুলনা করা যাউক।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যাবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্ম ফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥

হে পার্থ! অবিবেকিগণ এই শ্রবণ-রমণীয় জন্ম-কর্ম্মফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্য্যের সাধন-ভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য বলে। যাহারা বেদবাদরত "(তদ্ভিন্ন) আর কিছুই নাই" ইহা যাহারা বলে তাহারা কামাত্মা, স্বর্গপর, ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত।

পুনশ্চ—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং।
অনার্য্যযুষ্ঠম স্বর্গমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥

হে অর্জ্জুন! এই সঙ্কটে অনার্য্য-সেবিত স্বর্গহানিকর এবং অকীর্ত্তিকর তোমার এই মোহ, কোথা হইতে উপস্থিত হইল?

তাহা হইলে 'স্বর্গ' 'কীর্ত্তি' বাঞ্ছনীয় বিষয়।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তিতেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥

লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। সমর্থ ব্যক্তির অকীর্ত্তির অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।

কিন্তু—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্
আত্মন্যেবাত্মনাতুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

যখন সকল প্রকার মনোগত কামনা বর্জ্জিত হয় আপনাতে বা (আত্মাতে) আপনি তুষ্ট থাকে তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়।

এইরূপ বহু শ্লোক আছে। এখন কীর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা, অকীর্ত্তির ভয় কি কামনা নহে?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'বেদবাদরত ;' আবার বলা হইতেছে—

'ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদানিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন'

হে অর্জ্জুন! বেদ সকল ত্রৈগুণ্য বিষয়। তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসুচৈব দানেষু যৎপুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎসর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরংস্থানমুপৈতি চাদ্যং ॥

শাস্ত্রে বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে জ্ঞানীরা এই নির্ণীত তত্ত্ব অবগত হইয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন, এবং জগতের মূলকারণ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এস্থলে বেদকে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থলে দেওয়া হইতেছে; বৈদিক যজ্ঞকেও নিম্ন স্থানে দেওয়া হইতেছে।

কিন্তু—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ম্ কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

যজ্ঞার্থ যে কর্ম্ম তদ্ভিন্ন অন্যত্র কর্ম্ম ইহলোকে বন্ধনের কারণ। হে কৌন্তেয়! তুমি সেই জন্য (যজ্ঞার্থ) অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর।

এই যজ্ঞ কি ?—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবন্তি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥

অন্ন হইতে ভূত সকল উৎপন্ন। পর্জন্য হইতে অন্ন জন্মে। যজ্ঞ হইতে পর্জন্য জন্মে। কর্ম্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি।

তাহা হইলে ইহা বৈদিক যজ্ঞ। আবার পাওয়া যাইতেছে :—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বম্ কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥

হে পরন্তপ! ফলের সহিত সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত আছে। অতএব হে পার্থ! দ্রব্যময় দৈবযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।

এখন ইহার সামঞ্জস্য কে করিবে? এইরূপ ভূরি ভূরি অসঙ্গতি বাহির করা যাইতে পারে। প্রাচীন পূজনীয় গ্রন্থের ভিতর দিয়া নিজের স্বার্থপ্রণোদিতবাক্য প্রচারজনিতচেষ্টার ফল ভিন্ন এই অসঙ্গতির আর কি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের ভিতর বহু প্রক্ষিপ্ত বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

৬। সূত্রাকারজনিত ভ্রম।

মৌলিক শাস্ত্রাদি সূত্রাকারে রচিত হউক আর নাই হউক, সূত্রাকারেই আবহমান কাল হইতে ধৃত হইয়া আসিতেছে। অবশ্য মনে রাখিবার সুবিধার জন্য এরূপ হইয়াছে বলিতে হইবে। সূত্রাকৃতি এই সুবিধাবিশিষ্ট হইলেও ইহার এক মহৎ অসুবিধা আছে, তাহা সূত্রের অর্থ লইয়া। অনেক সূত্রের সঙ্কীর্ণতার জন্য প্রকৃত অর্থ বুঝিবার পক্ষে বাধা রহিয়াছে; নানার্থ, পরস্পর বিরোধী কদর্থ করিবার বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। সূত্রের শব্দমাত্র লইয়া আমাদের প্রয়োজন নহে, অর্থ লইয়াই প্রয়োজন। অনেক স্থলে শুদ্ধার্থ নির্ণয় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; কুদর্থজনিত ক্রিয়া সর্ব্বদা সমাজে আচরিত হইতেছে।

৭। রাজনৈতিক সংঘর্ষ জনিত বিকৃতি।

শাস্ত্রমধ্যে ভ্রমপ্রমাদ প্রবেশ করিবার সপ্তম কারণ: ভারতবর্ষে রাজনৈতিক সঙ্ঘর্ষ। ইহার অষ্টম কারণ: ধর্ম্ম সঙ্ঘর্ষ। ইংলণ্ডের

ইতিহাসে পাঠ করা গিয়াছে, তথাকার রাজা অষ্টম হেন্‌রী তাঁহার পুরাতন স্ত্রীটিকে পরিত্যাগ করিয়া আর একটী নূতন স্ত্রী গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এ সময়ে তথায় রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। ঐ ধর্ম্মযাজক রাজার এই শুভসঙ্কল্পে বাধা প্রদান করায় ইংলণ্ডে ধর্ম্মান্তর প্রতিষ্ঠা করা হইল। ভারতবর্ষে এরূপ অভিনয় হয় নাই তাহা মনে করা যাইতে পারে না; বরং অনেক গ্রন্থের দুর্দ্দশা দেখিয়া বহুবার হইয়াছে মনে করিতে হইবে। গৌড়ের রাজবংশ এককালে বৈষ্ণব ছিল; বল্লালসেন বা ঐরূপ কেহ, তন্ত্রোক্ত শাক্ত ধর্ম্মের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া ঘোরতর শাক্ত হইলেন্। অমনি রাজ্যমধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। চিরকালই রাজকীয় পুস্তাকাগারে প্রাচীন বিশুদ্ধ গ্রন্থাদি সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। রাজার পরে, এই সংরক্ষণ কার্য্য কর্ম্মচারিগণ ও উপরাজগণ তাহাদের স্ব স্ব পুস্তকাগারে, রাজার অনুকরণে, সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বল্লালসেন পঞ্চ মকারের মাহাত্ম্য অনুভব করিবামাত্র গরীব বৈষ্ণবধর্ম্মাধিকারের কার্য্য গেল; তৎস্থলে জনৈক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে যত প্রবল, রাজা-প্রজার মধ্যে তত দেখা যায় না। ভৈরবাচার্য্য তখনই রাজার কর্ণে সর্ব্বদা লাগাইয়া আদেশ বাহির করিলেন—রাজপুস্তকালয়ে যত মৌলিক, সাধারণের বিশ্বাস্য বৈষ্ণব-গ্রন্থ আছে তাহার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া নূতন অঙ্গের সংযোজনা করিয়া, তাহাই মৌলিক বলিয়া সাধারণে প্রচারিত হউক। ইহার ফল হইল কি, না ভগবান্ বিষ্ণুকে আধাবিষ্ণু আধাশক্তি মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইল; উপরে রহিলেন শক্তি, নিম্নে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইতে লাগিলেন বিষ্ণু। বৈষ্ণব গ্রন্থের মধ্যে শক্তির প্রাধান্য প্রবেশ করাইয়া দিয়া এবং হয়ত বাদ-ছাদ দিয়া, গৌড়দেশস্থিত বৈষ্ণবগ্রন্থের, বৈষ্ণবধর্ম্মের নাককাণ কর্ত্তন করিয়া মাথা মুড়াইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল; কারণ রাজার আজ্ঞা, অনুশাসন ও উৎপীড়নে কর্ম্মচারিগণ বৈষ্ণবগ্রন্থের দুর্দ্দশা সাধন করিল, উপরাজগণও তাহাই করিল। যে না করিল, তাহাকে কোন রকমে বনে বাদাড়ে আত্মরক্ষা ও পুঁথি রক্ষা করিতে হইল। অত্যাচার ও হতাদরের মধ্যে

পড়িয়া সেই বিশুদ্ধ গ্রন্থের একটীও হয়ত টিকিয়া থাকিয়া আমাদের হস্ত পর্য্যন্ত পৌঁছাইল না। আর যদিও এক আধটি পৌঁছিয়া থাকে, আমরা তাহার সহিত ভূরি ভূরি কৃত্রিম বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহার কিছুই মূল্য নাই অথচ তাহাও আমরা শাস্ত্র বলিয়া পূজা করিতেছি। মনে করা যাউক, গৌড়ের পরবর্ত্তী কোন রাজা শাক্ত মত পরিত্যাগ করিয়া শৈবসম্প্রদায় ভুক্ত হইলেন। এইবার শক্তির প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল; বৈষ্ণবধর্ম্মের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল শক্তিগ্রন্থের ততোধিক দুর্দ্দশা হইল। মনে করা যাউক, শৈব শাক্ত না হইয়া এবার গৌড়ের সিংহাসনাধিষ্ঠাতা জৈন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এবার সমগ্র শৈব শাক্ত বৈষ্ণব গ্রন্থের দুর্দ্দশার পালা উপস্থিত হইল। উপরোক্ত ঘটনাগুলি কেবলমাত্র উপন্যাস নহে। সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের ফলে শাস্ত্রাদির দুর্দ্দশা যিনি সরলভাবে দেখিবেন, তিনি ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। এইত গেল কোন দেশের রাজার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের ফল; ইহাপেক্ষা বিজেতা বলপূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্রের যে অনিষ্ট করিয়াছে তাহা আরও কঠোর—সে কথা বলা যাইতেছে।

অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষে পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-সঙ্ঘর্ষ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার প্রথমাবস্থায় দেবাসুর সংগ্রাম। দেবোপাসক ও অসুরোপাসকের মধ্যে যে কিরূপ কঠোর সংগ্রাম চলিয়াছিল এবং পরস্পরকে সমূলে বিনাশ করিতে উভয়পক্ষ কিরূপ বিষম উদ্যম করিয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পুরাণে পাওয়া যায়। এই সংগ্রাম যে একটা রূপক নহে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সহিত যে নিত্য দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে তাহার কাব্য নহে, ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে প্রাচীন আসুরীয়গণের অস্তিত্ব ও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি তাহা সপ্রমাণিত করিতেছে। এই দ্বন্দ্বের সময় আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে বাস করিত কি না সন্দেহ করিলেও, বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আসুরধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। স্বয়ং বুদ্ধদেব এই সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন, কপিলবস্তুর রাজা-প্রজাগণ এই ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, কেহ কেহ এরূপও অনুমান করিতেছেন। সে যাহা হউক,

পুরাণেতিহাসের সময়ে ভারতবর্ষে বহু অসুরের বাস ছিল, তাহাদের অবস্থাও নিতান্ত হীন ছিল না, বরং তাহারাই যে বিশেষ বীর, রাজা রাজ-চক্রবর্ত্তী ও শিল্পকৌশলী ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। মহাভারতের সময়ে ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী কৌরবগণ বা অন্য কেহ নহে —জরাসন্ধ। ঐ জরাসন্ধ আবার দেবদ্বেষী, বিশেষত কৃষ্ণদ্বেষী। হিরণ্য-কশিপুর সময় হইতেই অসুরগণ বিষ্ণুদ্বেষী। এই জরাসন্ধ আবার যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনের অন্তরায়; তবে কি সে অসুরোপাসক? তাহার জামাতা কংস কিন্তু পুরাণে স্পষ্টত অসুর বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এই কংসও কৃষ্ণদ্বেষী। দেবোপাসক যুধিষ্ঠিরের রাজসভা নির্ম্মাণ করিবার জন্য ময়দানবকে ডাকিয়া আনিতে হইয়াছিল; দৈত্য, দানব ও অসুর একার্থবাচক শব্দ। পৌরাণিক যুগে ভারতবর্ষে দৈব ও আসুর উভয় ধর্ম্মই প্রচলিত ছিল এবং উভয় সম্প্রদায় মধ্যে সঙ্ঘর্ষ ছিল, মনে করা যাইতে পারে। আসুরীয়া প্রদেশে না কি গণেশাদি দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; তবে তথায়ও দেবোপাসক এক সম্প্রদায় ছিল। আসুর ধর্ম্মের পরে জৈন, বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্ম্মের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ দেখা যায়; বৈদিক ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়—যথা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ দেখা যায়। ইহার ফলেও শাস্ত্রাদির অবনতি ও বিকৃতি ঘটিয়াছে, এরূপ মনে করা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে; বরং বহুশতবৎসরব্যাপী সঙ্ঘর্ষের ফলে তাহা আদৌ ঘটে নাই, মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত। অশোক যখন প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের একছত্রী রাজা হইয়া বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন; শক, যবন, পারদ, পহ্লবগণ, অর্দ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া বহুকাল ধরিয়া বিদেশীয় বিজাতীয় রাজত্ব যখন পরিচালন করিয়া গেল; তখন শাস্ত্রাদির অত্যল্প অবনতি ও বিকৃতি ঘটে নাই, ইহা মনে করাই অযৌক্তিক। না ঘটিলে শাস্ত্রের এরূপ দুর্দ্দশা কেন? যে অতি মূর্খ, যে অতি কুসংস্কারাপন্ন, যাহার স্বাধীন চিন্তাশক্তি কখনও জাগরিত হয় নাই, তাহাকেই আমি জিজ্ঞাসা করি, শাস্ত্রের সমস্তটা সত্য একথা সে বিশ্বাস করিতে পারে কি?

"সমস্তটাই সত্য বটে, তবে আমরা যে বুঝিতে পারি না

তাহা আমাদের বুদ্ধির স্বল্পতানিবন্ধন, শাস্ত্রের দোষবশত নহে। কলিযুগে অন্নগত প্রাণ, মানবের আয়ু কম, বুদ্ধি কম, কাজেই শাস্ত্রের মধ্যে দোষ লক্ষিত হয়; বাস্তবিক তাহা আমাদেরই দোষ।"

দোষ যাহারই হউক, এখন কর্ত্তব্য কি? দেশশুদ্ধ লোক গলায় দড়ি দিয়া মরিব না বাঁচিয়া থাকিব? বাঁচিয়া থাকিলে আরও বিপদ—কি করিব, কি না করিব, ইহা স্থির করিতেই হইবে, অন্যথায় বাঁচিয়া থাকা চলে না।

"শাস্ত্রানুসরণ কর।"

তাহাতে যদি গোল মিটিত, তবে আর এত কথা বলিতে গেলাম কেন।

৮। সর্ব্বথা শাস্ত্রানুসরণ অযৌক্তিক।

শূদ্রস্তুবৃত্তিমাকাঙ্ক্ষেৎ ক্ষত্রমারাধয়েদ্ যদি।
ধনিনং বাপ্যুপারাধ্য বৈশ্যং শূদ্রোজিজীবিষেৎ॥
বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলম্॥
শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রোহি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে।

১০—১২৯—মনুসংহিতা।

এখন আমি শূদ্রাদপি শূদ্র এ শাস্ত্রবাক্য পালন করি কিরূপে?

হীনবর্ণোঽধিকবর্ণস্য যেনাঙ্গেনাপরাধং কুর্য্যাৎ তদেবাস্য শাতয়েৎ॥
একাসনোপবেশীকট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ॥
নিষ্ঠীব্যোষ্ঠদ্বয় বিহীনঃ কার্য্যঃ॥ আক্রোশয়িতা চ বিজিহ্বঃ॥
দর্পেণ ধর্ম্মোপদেশকারিণো রাজা তপ্তমাসেচয়েৎ তৈল মাস্যে॥

—বিষ্ণুসংহিতা।

শূদ্র দূরের কথা, ম্লেচ্ছ মোক্ষমূলার প্রভৃতির প্রতি এই ব্যবস্থা করিতে গেলে, তাহারাও হয়ত শাস্ত্রবাক্য অবহেলা করিয়া দ্বিজাতীর পবিত্র গাত্রে এককালীন পদাঘাত করিতে আসিবে। তখন মনুত্রিবিষ্ণুহারীতের দোহাই দিয়াও পবিত্রতা কেন, প্লীহারক্ষা করা দায় হইবে। ইহাদের

কাহারও দর্পের অভাব নাই। হায় রে সে কাল! আবার কবে আসিবে? ভগবান্ আবার কবে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন?

"শাস্ত্রের অবমাননা করাই তোমার অভিপ্রায়, নচেৎ অনন্ত শাস্ত্রবাক্য থাকিতে, এইটি টানিয়া বাহির করিয়া কি গৌরব লাভ হইল? শাস্ত্রের সমস্তটারই আচরণ করিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই; যাহা সম্ভব হয় তাহা আচরণ করিতে বাধা কি?"

কি হিসাবে সম্ভব অসম্ভব বলিতেছেন? কতটুকু সম্ভব, কতটুকু অসম্ভব, তাহা কে স্থির করিয়া দিবে?

"নিজের বুদ্ধির দ্বারা স্থির করিতে পার; তবে দুর্বুদ্ধি করিও না।"

আর কিছুরই আবশ্যক নাই। কলিকালের এই তণ্ডুলোদগত বুদ্ধি শাস্ত্রের উপর প্রয়োগ করিবার কিঞ্চিন্মাত্র অধিকার পাইলেই আমাদের কার্য্য সিদ্ধি হইল। তাহা হইলেই, কেবলমাত্র শাস্ত্রে আছে বলিয়াই তাহা সত্য এবং করণীয় হইল না—আমাদের বুদ্ধির অনুকূল হওয়া আবশ্যক।

"তাহা নহে। তোমার বর্ণিত কারণসমূহের ফলে শাস্ত্রাদিতে সামান্য আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছে এরূপ মনে করিলেও ইহা প্রমাণ হইতেছে না যে ইহার অধিকাংশই লিপিপ্রমাদদুষ্ট বা প্রক্ষিপ্ত; এবং তজ্জন্য সর্ব্বদাই ঋষিগণের প্রোক্ত অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারকে উপেক্ষা করিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করা শ্রেয়।"

সেই সামান্য আবর্জ্জনাই যথেষ্ট। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির সহায়তা ভিন্ন ঐ আবর্জ্জনা ত্যাগ করিবার অন্য উপায় নাই; প্রকৃত ঋষিবাক্য উদ্ধার করিবার অন্য পথ নাই, জীবনের কালোচিতকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সম্ভব নাই। এই আবর্জ্জনা সামান্য নহে—রাশীকৃত। বহুকাল-সঞ্চিত এই আবর্জ্জনারাশি পচিয়া উঠিয়া ভারতের বায়ুমণ্ডলকে কলুষিত করিতেছে। শৈব, বৈষ্ণব শাস্ত্রে, বিশেষতঃ তন্ত্র শাস্ত্রে যে সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহার সমস্তটার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা যায় কি? যদি না করা যায়, যদি অংশ বিশেষ আধ্যাত্মিক ব্যাপার না হয়, তবে তাহা কি শাস্ত্র? তাহা কি ধর্ম্ম? কোন্ স্থানের ধর্ম্ম—স্বর্গের না নরকের? কাহার ধর্ম্ম—মানুষের না পিশাচের? কে সেই অংশের প্রচারক—ঋষি না চণ্ডাল?]

শাস্ত্রের দোষই কীর্ত্তন করিলাম, ইহার মলিনতাই অঙ্গে মাখিলাম, আর কিছুই করিলাম না। বহুদিন হইতে ইহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা যাইতেছে। তাহার ফলে, লেখকের ক্ষুদ্রবুদ্ধির নিকটেও ইহার মূল্য ক্রমশ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। জগতের অঙ্কে হিন্দুজাতির এই উপহারের মূল্য আছে কি না, এরূপ উপহার আর কেহ রচিত করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। যতদিন মানবজাতির উন্নতির অবস্থা থাকিবে ততদিন ইহা আদরণীয় থাকিবে, সেই উন্নতির পথপ্রদর্শক হইবে। ইহার নিন্দা করা আমার আদৌ উদ্দেশ্য নহে; কেবলমাত্র ইহা যে সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ নহে, ইহা যে বহুলোকের মূর্খতা, সাময়িক স্বল্পদৃষ্টি ও স্বার্থপরতা বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা দেখানই উদ্দেশ্য। স্থানান্তরে আমি দেখাইয়াছি কি কারণে এই জ্ঞানের স্রষ্টা ঋষিগণ, মানবজীবনের অতি উচ্চ প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ততদূর উচ্চে আমরা উঠিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ, ইউরোপীয়ানরা পারিয়াছে কি না সন্দেহ, কতদিনে পারিবে তাহাও সন্দেহ। তবে ইহা বলা যাইতে পারে, জ্ঞানের দ্বারা তথায় উঠিতে হইবে; অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা উঠা যাইবে না বরং বিপরীত দিকেই যাইতে হইবে—আমাদের হইয়াছেও তাহাই। বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে, সংস্কৃত ভাষায় যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে এবং যাহাই প্রাচীন বলিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহাই শাস্ত্র নহে। আল্লোপনিষদও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল; তাহা ত শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হয় না। এই পুস্তকের ইতিহাস স্পষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে বলিয়া ইহা উপনিষদের স্থান অধিকার করে নাই; কিন্তু প্রাচীনকালে এরূপ শত শত গ্রন্থ, শাস্ত্র না হইয়াও, বহুপরবর্ত্তী সময়ে শাস্ত্রের স্থান গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে এবং প্রকৃত শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যেও বহু অশাস্ত্রীয় শব্দ, শ্লোক, অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে;

অতএব—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

"যে সমস্ত মত বহু শাস্ত্রে বহুবার ব্যক্ত হইয়াছে, যে সমস্ত মত শাস্ত্রের মেরুদণ্ড, তাহা বিনাবিচারে গ্রহণ করিব না কেন ?"

এই আপত্তির ভিতরে ত্রিবিধ বিচার রহিয়াছে। ১। বহুবার যে মত ব্যক্ত হয় তাহা প্রক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই বা অল্প। ২। কতবার ব্যক্ত হইলে তাহা শাস্ত্রীয় মত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। ৩। এই মতের এতবার অভিব্যক্তি হইয়াছে, সুতরাং ইহা প্রকৃত শাস্ত্রীয় মত। তাহা হইলেই ইহা বিনা বিচারে শাস্ত্রানুসরণ করা হইল না, বিচারের সাহায্যে সেই কার্য্য করা হইল। এ পরিচ্ছেদের ঐ মাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়; জ্ঞানের পথ উন্মোচন করাই উদ্দেশ্য।

৯। হিন্দুর আদর্শ কি ?

আজকাল হিন্দুর আদর্শ, আর্য্যভাব কি তাহা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই আদর্শ কি নূতন কিছু ? ইহাতে কি নূতন কিছু আছে, না ইহা মানব মনের সাধারণ আদর্শ ? এই আদর্শ বুঝিবার জন্য ধর্ম্ম, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি জটিল বিষয় অগ্রে না ধরিয়া, মানুষের কার্য্যকলাপের অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য দুই একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া দেখা যাউক। এক সময়ে ভারতবর্ষে কলাবিদ্যার প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল; ইহা চৌষট্টি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল ;—

পূর্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ ষোড়শ কলায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥

আজিও আমাদের অতীত, অকৃত্রিম ভাস্কর্য্য চিত্রবিদ্যা ইত্যাদির উচ্চ প্রশংসা ইউরোপে দিন দিন বাড়িতেছে; কাব্য নাটকাদির ত কথাই নাই। এই প্রাচীন চিত্রাবলী ও ভাস্কর্য্যের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টি করিয়া কি দেখিতে পাই ? স্বাভাবিকত্বে প্রাচীন গ্রীস বা আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রবিদ্যার নিকট ইহা দাঁড়াইতে পারে না; এমন কি স্বভাবের অনুসরণ অনেক স্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বকই পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহার উচ্চাংশ স্বভাবের প্রতিকৃতি নহে, বাস্তবের গঠন নহে, অতিদূরগামী কল্পনাকে অবয়ব দিবার চেষ্টা। সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে বলা যায় না, সামান্যই সফল হইয়াছে। কিন্তু সেই সামান্য সফলতার মূর্ত্তিই বিংশতাব্দীর

সভ্যতার সম্মুখে সৌন্দর্য্যের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া ধরিয়াছে। অধঃপতিত মধ্যযুগে এই বিদ্যার বিশেষ অবনতি হইয়াছিল; সেই উচ্চ কল্পনা হৃদয়ে ধারণ করিবার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু ইহা পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। এই পুনর্জ্জীবন লাভের জন্য, এই আদর্শের অস্তিত্ব মাত্র লোপ না হইয়া ইহা যে বিদ্যমান রহিয়াছে তজ্জন্য, আমরা মহামতি হ্যাভেল্ সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞ। বাস্তবিক তাঁহার ন্যায় উচ্চ হৃদয় ভিন্ন এ উচ্চ আদর্শ আর কে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? অভিনব চিত্রক সম্প্রদায়, প্রাচীন সেই আদর্শ এবং তাহাতে উপনীত হইবার যে প্রণালী কথিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে না। প্রাচীনগণ যে উপায়ের দ্বারা এই আদর্শ চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার অনেক দোষ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা হইলেও ভিন্ন পথে যাইবার উপায় নাই। ভিন্নপথে গেলে আদর্শই লোপপ্রাপ্ত হয়। কাজেই অল্পে অল্পে প্রাচীন পন্থারই উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। এমন সময় আসিয়াছে যে, এই আদর্শ ধরিয়া চলিলে ভারতবর্ষীয় চিত্রবিদ্যা কালে জগতের বিস্ময়ের বিষয় হইতেও পারে। তাহা যদিও না হয়, এটা স্থির যে সে পথ ত্যাগ করিয়া আপাতমনোরম বিদেশীয় পথের অনুসরণ করিলে ইহা চিরকাল ঘৃণ্য বই কোনকালেই প্রশংসার্হ হইবে না।

কলাবিদ্যা সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছে ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিবে। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম প্রাচীন ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় ধর্ম্মের অনুকরণ করিলে তাহা নিতান্তই হেয় হইয়া পড়িবে। আর একটা বিষয় সম্বন্ধেও এ কথা বলা যাইতে পারে: দর্শন বা Speculative philosophy সম্বন্ধে। যাহা বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, যাহা জ্ঞান ব্যতীত অন্যরূপ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতেও দেশীয় আদর্শ বর্জ্জন করিয়া বিদেশীয় আদর্শের অনুসরণ করিলে কার্য্য ভাল হইবে না; *দেশীয় আদর্শ, দেশীয় পন্থারই চর্চ্চা করিতে হইবে। এই ত্রিবিধ বিষয়ে* বিভিন্ন জাতির স্বতন্ত্রতা রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন, অন্যথায় বিচিত্রতার অভাব হইয়া পড়ে। অবশ্য জাতিবিদ্বেষমূলক কোন আদর্শের কথাই হইতেছে না। এরূপ আদর্শ আদর্শই নহে, জগন্নিহিত

সত্যের উপর তাহার ভিত্তি নহে, মিথ্যার উপর ভিত্তি ; কাজেই তাহা স্থায়ী আদর্শ নহে। পরস্পর সংঘর্ষিত না হইয়াও কলাবিদ্যা, ধর্ম্ম ও দর্শন, বিভিন্নমুখী হইতে পারে। ধর্ম্ম অর্থে, ধর্ম্মের বিশুদ্ধ অংশই বুঝিতে হইবে। তবে বিজ্ঞান বিভিন্নরূপ হইতে পারে না ; মানব হৃদয়ের উপর ইহা নির্ভর করে না ; ইহা সর্ব্বত্র সমান ; দেশ কালভেদে ইহার প্রভেদ হয় না। অতএব হিন্দুর আদর্শ হইতেছে :-বিজ্ঞানের সহিত বিরোধ না করিয়া জাতীয় ধর্ম্ম, দর্শন ও কলাবিদ্যার উন্নতি সাধন করা। ইহাতেই নিজের ও পরের, স্বজাতির ও বিজাতির, সমগ্র মানবজাতির, তৃপ্তির ব্যবস্থা হইতে পারে। আমাদের নিজের যাহা আছে তাহার মধ্যে যাহা কিছু রাখিতে পারা যায় তাহা রাখিতেই হইবে, বর্জ্জন করা চলিবে না, বিজাতির অনুকরণ করা চলিবে না। তবে যাহা নিতান্ত আবর্জ্জনা তাহা অবশ্যই বর্জ্জন করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রমবিকাশ বাদ।

১। দেবতা ও ঈশ্বরের কল্পনা।

এই দৃশ্যমান জগৎ কোথা হইতে আসিল? এই জগতের বক্ষে যে সমস্ত স্থায়ী চিহ্ন কালকে উপহাস করিয়া নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে—আকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদি, পৃথিবীতে অভ্রংলিহ শৈলমালা, দিগন্ত-বিস্তারিত জলরাশি; আজীবন যাহা দেখিতে পাইতেছি, আমার অস্তিত্বের পূর্ব্বেও যাহারা বর্ত্তমান ছিল এরূপ শুনিতে পাইতেছি—তাহারা কোথা হইতে আসিল? আবার এই জগতে সর্ব্বদা যে বহুল-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে—এক বস্তু রূপান্তর গ্রহণ করিয়া ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, একস্থান হইতে স্থানান্তরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে—তাহাই বা কেন হইতেছে? আজ বৃক্ষ অঙ্কুরিত, কাল বহুবিস্তৃত; আজ যে মনুষ্য জীবিত, কাল সে মৃত; আজ যে আকাশ নির্ম্মল, কাল তাহা ঘনঘটাচ্ছন্ন; আজ যাহা মলয় মারুত, কাল তাহা প্রচণ্ড ঝটিকা। এই পরিবর্ত্তনই বা কে ঘটাইতেছে? এই প্রশ্নের অতি সহজ উত্তর আছে—ভগবান, জগৎপিতা, 'জন্মাদস্যযতঃ'—তিনি সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই এই সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছেন; সৃষ্টিস্থিতিলয় তিনিই করিতেছেন। এখন এই সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি কিরূপে ঘটিল দেখা যাউক; যিনি ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে কে সৃষ্টি করিল দেখা যাউক।

আমাদের শাস্ত্রের মতে জগতের আদিম অবস্থাই ভাল; পরবর্ত্তী অবস্থা ক্রমশ নিম্নগামী। সত্যযুগে মানুষের দৈর্ঘ্য একবিংশতি হস্ত, আয়ু লক্ষ বৎসর, তত্র পুণ্যং পূর্ণম্, পাপং নাস্তি। তারপর ত্রেতা দ্বাপর, বিশেষত কলিযুগে ক্রমেই কমিতে লাগিল। এরূপ বিশ্বাস অন্যান্য প্রাচীন জাতির মধ্যেও দেখা যাইতেছে। সে যাহা হউক, মনুষ্যের উন্নতি

সম্বন্ধে যাহা হউক, পৃথিবী যে এককালে অনুন্নত ছিল, ক্রমশ উন্নত হইয়াছে, তাহার আভাস শাস্ত্রাদির মধ্যেও পাওয়া যায়।*

তম অসীত্তমসা গূঢ়হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছেনাভ্‌পিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্॥

ঋগ্বেদ ১০ ম মণ্ডল।

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্ন বর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল, ইত্যাদি।

এই পৃথিবী আদিতে জলময় ছিল, স্থলচর জীবের বাসের উপযোগী ছিলনা। ধরিয়া লওয়া যাউক ঐ উপযোগীতা ক্রমান্বয়ে জন্মাইয়াছে ও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাণী যখন প্রথম আবির্ভূত হইল তখন তাহার দেহ ও মন উন্নত ছিল না। বাসস্থানের উপযোগিতা বৃদ্ধিসহকারে উন্নত হইয়াছে; এবং শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ইহাও ধরিয়া লওয়া যাউক যে সত্যযুগেরও পূর্ব্বে বা তাহার প্রারম্ভে ঐ অনুন্নত অবস্থা ছিল, ঐ যুগে ঐ উন্নতি চরমসীমায় উঠিয়াছিল, পরে আবার অবনতি ঘটিয়াছে। অনুন্নত অবস্থায় মানুষের মনের ভাব কিরূপ থাকে, তাহা আমরা এখনও পাঠ করিতে পারি: বালক, নিম্ন শ্রেণীর লোক এবং অসভ্য সমাজের লোকের সহিত মিশিয়া তাহা এখনও জানিতে পারি। অন্যান্য লোকের কথা বাদ দিয়া প্রাথমিক নর-বালকের মনের বিকাশ পাঠ করা যাউক। যদি কখনও মানুষ প্রথমে অনুন্নত থাকিয়া পশ্চাৎ উন্নতি লাভ করিয়া থাকে, তবে সামাজিক মনোভাবের ক্রমবিকাশ ব্যক্তিগত মনোভাবের বিকাশেরই অনুরূপ পর্য্যায়ে হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে হইবে: অর্থাৎ এক্ষণে একটি বালকের চিন্তাশক্তি ক্রমশ যে ভাবে উন্নতিলাভ করে, তখনকার সমাজের মানুষও—এক জীবনে না হইয়া তাহাদের জাতীয় জীবনে, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে—ঐরূপ ভাবেই উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

---

* (ক) "অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসুবীজমবাসৃজৎ।"
"দ্বিধাং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে"
"যথা কর্ম্মতপো যোগাৎ সৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্।" মনু।১।৪১

এই যে জগতের ব্যাপার, সাধারণতঃ ইহা সেই বালকের কৌতূহল উদ্দীপিত করে না; যে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত রোজই ঘটিয়া থাকে, বালক তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর হয় না; তাহার যে কারণ অনুসন্ধান করা যাইতে পারে বা ঐ অনুসন্ধানের কোন আবশ্যকতা আছে তাহা আদৌ তাহার মনে উদিত হয় না।—কিন্তু এই তেজোময় গোলক মধ্যাহ্নকালে বিনামেঘে অকস্মাৎ যখন আবরিত হয়, তখন তাহার কল্পনা জাগরিত হইয়া উঠে; অনন্ত ধৈর্য্যশালিনী বসুমতী—যিনি শতশত অশ্ব হস্তির পদপ্রহারেও বিশেষ বিচলিত হন না—তিনি হঠাৎ যখন গা ঝাড়া দিয়া উঠেন; যে বায়ুর স্পর্শ সুখের কারণ, শ্রমের বিনাশন, সেই বায়ু যখন আবার উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গাছপালা, ঘর দরজা উড়াইয়া লইয়া যায়; বিদ্যুৎ যখন ঘন ঘন অট্টহাস্য করিতে থাকে; বজ্র যখন কড় কড় নাদে দিগ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে থাকে; তখন স্বভাবের এই সমস্ত ক্রিয়ার কারণ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি তাহার হৃদয়ে উত্থিত হয়। বালককে নিজ হইতে যদি কারণ স্থির করিতে হইত তবে সে কি স্থির করিত? তাহার পক্ষে কি স্থির করা সম্ভব? এই ঝটিকা সে নিজের শক্তিদ্বারা প্রবাহিত করিতেছে না কিম্বা তাহার পরিচিত কোন ব্যক্তিদ্বারাও প্রবাহিত হইতেছে না। তবে কে করিতেছে? কোন তৃতীয় ব্যক্তি। কে সে? তাহার কার্য্য দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, সে অমিতবলশালী।—আমরা মরুত পাইলাম। বালক পবনদেবের কল্পনা করিল, রাহুর কল্পনা করিল, বজ্রপাণি ইন্দ্রের কল্পনা করিল। এখন তাহার কল্পনাশক্তি অল্প; সে যাহা চক্ষে দেখে বা কর্ণে শুনে তাহাই ভাঙচুর করিয়া তাহাকে একটা কাল্পনিক জীব সৃষ্টি করিতে হয়। কাজেই এই সমস্ত দেবতা মানুষেরই অনুরূপ হইয়া পড়ে; তবে দুই হস্তের স্থলে চতুর্হস্ত হইতে পারে, আকারে যথেষ্ট বড় হইতে পারে, বর্ণে যথেষ্ট কাল হইতে পারে এবং মুখব্যাদন যথেষ্ট আয়ত হইতে পারে।

আর এক শ্রেণীর ঘটনা আদিম অবস্থায় মানুষের কৌতূহল উদ্রেক করিবে। মৃত্যু ত সর্ব্বদাই ঘটিতেছে; তাহাতে তাহার কৌতূহল উদ্দীপিত হয় না। কোন রোগী বা আহত ব্যক্তি যখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া

থাকে, মৃতের সহিত যখন তাহার কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না; হঠাৎ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সে যখন পুনর্জীবিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে থাকে তখন কারণানুসন্ধিৎসা জন্মায়: মনে করিতে বাধ্য হয় যে ইহার অভ্যন্তরের কোন পদার্থ কতক সময়ের জন্য স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল, পুনরায় ফিরিয়া আসিল—নহিলে এরূপ ঘটিবে কেন? এইরূপ আরও কারণে আদিম অবস্থায় কৌতূহল উদ্দীপিত হয়; তাহার বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া, পুনরায় জড় জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে যাওয়া যাউক। প্রথমতঃ এই কৌতূহল আকস্মিক বিপদপাত-সাপেক্ষ ছিল, ক্রমান্বয়ে ইহার বিস্তার হইতে লাগিল; মানুষের মন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে নিত্য ঘটনীয় সাধারণ ঘটনাই বা কেন ঘটে? সূর্য্য রোজ রোজই বা কেন উঠে আবার কোথায় যায়? স্বাভাবিক ঘটনাবলীর কারণানুসন্ধিৎসার চরমোৎকর্ষতা হইল যখন কোন মনীষি পক্ক ফল কেন মাটিতে পড়িল, এই প্রশ্ন করিলেন। সে কথায় আমাদের আবশ্যক নাই, আদিম অবস্থার কথাই বলা যাউক। এই কৌতূহলের ফল এই হইল যে, জগতে যাহা কিছু গতিবিশিষ্ট বা পরিবর্ত্তনশীল তাহাই মনুষ্যানুরূপ শক্তিবিশিষ্ট দেবতাদ্বারা চালিত হয় বলিয়া কল্পিত হইল। ক্রমান্বয়ে যাহা গতিবিশিষ্ট নহে—যথা পর্ব্বতাদি, তাহাই বা কোথা হইতে আসিল এবং সর্ব্বশেষে, জগন্মণ্ডল কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্ন মানুষের মনে উদয় হইল। ইহারই ফল ভগবান, বিধাতা বা সৃষ্টিকর্ত্তা। সরস্বতী যেমন ব্রহ্মার মানস-সম্ভূতা * স্বয়ং ভগবানও তদ্রূপ মানুষের মানস-সম্ভূত। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, একথা অস্বীকার করা যাইতেছে না যে মানুষের এরূপ মনোভাবও ভগবৎ প্রদত্ত; তিনি তাঁহার অপার করুণার বলে মানুষের মনে প্রকাশিত হইয়াছেন। এখন আমরা জগতের উপর কার্য্যকারিণী দ্বিবিধ শক্তির সন্ধান পাইলাম। এক দেবতা, আর যিনি দেবতারও সৃষ্টিকর্ত্তা, পরব্রহ্ম বা আদিকারণ। এখন তৃতীয় কার্য্যকারিণী † শক্তির সন্ধান লওয়া যাউক।

* (ক) "বাচং দুহিতরং তন্বীং"—(ভাগবত ৩।১২)। † বঙ্কিমচন্দ্র।

২। জগতে দেবতা ও ঈশ্বর ব্যতীত তৃতীয় কার্য্যকরণী শক্তি—নৈসর্গিক শক্তির আলোচনা।

জগতে যে সমস্ত কার্য্য হইতেছে এবং হইয়াছে, আমাদের শাস্ত্রকারগণ তাহা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। আদিতে সৃষ্টির কারণ একমাত্র হইতে পারে :—সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি করিয়াছেন : ইহার আর কোন কারণ হইতে পারে না। এখন আলোচ্য বিষয় হইতেছে যে প্রথম সৃষ্টির পর হইতে আর কোন নূতন সৃষ্টি হইতেছে কিনা এবং কি করিয়া এই সৃষ্টি চলিতেছে—স্থিতি ও লয় কিরূপে সাধিত হইতেছে।

"সমস্তই তিনি করিতেছেন; যেমন তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তেমন স্থিতি ও লয় তিনিই করিতেছেন, আর কারণান্তর নাই"।

কথাটা বেশ ধার্ম্মিকের মত হইল বটে, কিন্তু অন্য হিসাবে নিতান্ত মূর্খের মত কথা হইল, মানুষের জ্ঞানের স্থান রহিল না। সমস্তই যখন তিনি করিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছা মাত্র যখন সমস্ত কার্য্যের কারণ, তখন আর কারণানুসন্ধানের স্থল রহিল কোথায়? কার্য্য মাত্রেরই সেই একমাত্র কারণ—ঈশ্বরেচ্ছা, তাহা ত জানাই হইল; আর কারণ নাই, তাহার অনুসন্ধানও নাই। শাস্ত্রেও যে একটা জ্ঞানমার্গ আছে তাহার শ্রাদ্ধ করা হইল। আচ্ছা, তাহাই ধরিয়া লওয়া যাউক, সমস্তই তাঁহার ইচ্ছা। যে আদিম বন্য বর্ব্বর, ধনুর্ব্বাণ হস্তে মৃগের অনুসরণ করিতেছে, দেখা যাউক, সেও এই কারণের কত প্রত্যবায় করিতেছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি হয় তবে সে আহার পাইবে; মৃগের অনুসরণ বৃথা। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে সে মৃগ মায়ামৃগ হইয়া যাইবে, তাহার অনুসরণ মৃগতৃষ্ণিকার অনুসরণ হইয়া যাইবে; মূর্খ ব্যাধ এ মহান ধর্ম্ম, এরূপ মহীয়ান কারণের সম্ভ্রম জানে না। যখন তীর যোজনা করিয়া মৃগকে লক্ষ্য করিল পুনরায় তখন এই কারণের অসম্মান করিল। ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হইত, পশ্চাৎ দিকে ছুড়িলেও সেই তীর শব্দভেদী বাণ হইয়া মৃগকে বধ করিত। আর এ মূর্খ বুঝিলনা যে তাহা যদি না হয়, তবে তাহার তীর ভগবান স্বয়ং মাঝখানে পড়িয়া বুক পাতিয়া লইবেন, মৃগের কিছুই হইবে না। আবার যখন পোড়াইয়া খাইতে বসিল তখন দক্ষিণ হস্তের সাহায্য গ্রহণ

করিল; বুঝিলনা যে তাহার ভাগ্যে যদি উদরপূর্ত্তি থাকে, ঈশ্বরেচ্ছাতেই হইবে। ব্যাধ মূর্খত এবম্প্রকার আচরণ করিয়া ধর্ম্মের হানি করিল; আমাদের পূজনীয় স্মৃতিচূড়ামণি অন্ন লইয়া ব্যঞ্জনাভিষিক্ত করিয়া যখন গলাধঃকরণে প্রবৃত্ত হয়েন, আমরা তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতেছি যে তখন তিনি লোকশিক্ষাহেতু ভগবানকে নিবেদন করিয়া দিয়া তাঁহার অকিঞ্চিৎকর দক্ষিণ হস্তের পরিবর্ত্তে ভগবানের শ্রীহস্তের সাহায্যের জন্য যেন কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন। জঠরাগ্নি তখন শাস্ত্র-যুক্তির অপেক্ষা মধুরতর যুক্তি কর্ণের নিকট কীর্ত্তন করিতে থাকিবে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্যাধের লক্ষ্য করিবার প্রবৃত্তি এবং ভোজন সময়ে দক্ষিণ হস্তের সাহায্য গ্রহণ প্রবৃত্তিও ঈশ্বর প্রণোদিত; তাহাও ঈশ্বরের ইচ্ছার বাহির হইতে আইসে নাই। চূড়ামণি মহাশয় এইবার তাঁহার পূর্ব্ব দাখিলি ঈশ্বরেচ্ছামূলক আরজি সংশোধন করিতে ব্যগ্র হইবেন। কিন্তু সহস্র সংশোধনেও গোড়ায় যে গলদ রহিয়াছে তাহা ঘুচিবেনা, তবে এই হইতে পারে যে সংশোধনের পর সংশোধনে অবশেষে আরজিতে আর কোন প্রার্থনাই থাকিবে না; মসিচিহ্নিত কাগজখণ্ড মাত্র থাকিয়া যাইবে।

প্রথমেই বলিবেন যে দৈব আছে বলিয়া পুরুষকার যে নাই তাহা বলা হয় নাই, দৈব আছে পুরুষকারও আছে। অনেক সময় দৈব বা ঈশ্বরের ইচ্ছায় কার্য্য হয়, আবার সময় বিশেষে পুরুষকার দ্বারাও কার্য্য হয়। এখন এই পুরুষকার কি? মানুষের স্বাভাবিক কার্য্যকরণী শক্তি। তাহা হইলেই হইল কি? না, নৈসর্গিক শক্তির অস্তিত্বতা ও কার্য্যকারিতা স্বীকার করা হইল। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় এইভাবে দাড়াইতেছে: জগতে সৃষ্টিস্থিতিলয় কার্য্য তিনটি কর্ত্তা দ্বারা সাধিত হইতেছে: প্রথম।—ঈশ্বর; দ্বিতীয়।—দেবতা; তৃতীয়।—নৈসর্গিক শক্তি। দেবতা অর্থে বুঝিতে হইবে, সৃষ্টিকর্ত্তা যে আদিম ঈশ্বর এবং নৈসর্গিক শক্তি, ইহার মধ্যে শক্তিবিশেষ; অর্থাৎ স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তাও নহেন, নৈসর্গিক শক্তিও নহে; তাহা অপেক্ষা উচ্চতর কোন কর্ত্তা; যথা ভূত প্রেত ইন্দ্র অগ্নি ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি ইত্যাদি।

জগৎপদ্ধতির অভ্যন্তরে এই তিন কর্ত্তা কোথায় কি কার্য্য করিতেছেন তাহার সন্ধান লওয়া যাউক।

৩। জ্ঞানের প্রসার সহকারে কারণরাজ্যে নৈসর্গিক নিয়মের কার্য্যকরণী শক্তির প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতা ও ঈশ্বরের কার্য্যকরণী শক্তি কমিয়া যায়।

সাগরের উপকূলে বসিয়া দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে, জলরাশি যে কত বিভিন্ন রূপে উদ্বেলিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই; কোথাও বা বৃহৎ তরঙ্গ, তরঙ্গের উপর ফেনোচ্ছ্বাস, তরঙ্গের পশ্চাতে বৃহত্তর তরঙ্গ; কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমালা পরস্পর বিজড়িত হইয়া অসীম বিচিত্রতার সৃষ্টি করিয়াছে। কে এই লীলা করিতেছে? সৃষ্টিকর্ত্তা প্রত্যেক ঢেউটিকে গড়িয়া তুলিতেছেন, না বরুণদেব তাহা করিতেছেন? বর্ত্তমান যুগের লোকসাধারণ বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগের প্রতীক্ষা না করিয়াই বলিবে যে, না তাহা নহে, নৈসর্গিক নিয়ন। ঐ নিয়মই এই জলোচ্ছ্বাসের বিচিত্রতার কারণ। কেন এইরূপ মনে করিবে? কারণ, এই যে বিচিত্রতা, এই অসংবদ্ধ উচ্ছ্বাস, যাহা সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার ভিতরেও একটা নিয়ম দেখা যাইতেছে; তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। বায়ুর সহিত এই উচ্ছ্বাস সম্বন্ধ বিশিষ্ট, চন্দ্র সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট, আবার এই উপকূলের স্থানীয় অবয়বের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট; শুধু যে সম্বন্ধ বিশিষ্ট তাহা নহে—অচ্ছেদ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট। এই সম্বন্ধ নিত্য এবং অপরিহার্য্য। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে ইহারাই এই জলচ্ছাসের কারণ। এস্থলে দেখিতে হইবে যে এই সম্বন্ধদ্বারা যে তরঙ্গমালা গঠিত হইতেছে তাহা গণিত সাহায্যে বিশুদ্ধরূপে বুঝিবার উপায় না থাকিলেও, মানুষ এরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে; এই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম এই কার্য্যের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করে; এই নিয়মের বৈলক্ষণ্য হয় না এরূপও মনে করে। কিন্তু সকলে মনে করেনা; মানুষের জ্ঞানের পরিমাণানুসারে বৈলক্ষণ্যের অনুমান হয়। সচরাচর যেরূপ তরঙ্গের আয়তন দেখা যায়, একদিন তাহা অপেক্ষা অতিবৃহৎ পর্ব্বতাকার ঢেউ আসিয়া যখন দেশ বিদেশ

ভাসাইয়া লইয়া যায় তখন আর স্বাভাবিক নিয়ম মাত্র তাহার কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে না—দৈবিক কারণ নির্দ্দেশ করে। মধ্য-সমুদ্রে প্রবল ঝটিকা যখন তরণীকে মরণদোলায় দোলাইতে থাকে, নাবিক তখনও দৈবকে কারণরূপে নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হয়। মানুষের জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে কি হয়? সেই পর্ব্বতাকার তরঙ্গ—বায়ুও যাহার কারণ নহে, চন্দ্র সূর্য্যও যাহার কারণ নহে—তাহার কারণান্তর নির্ণীত হয়। সে কারণ অনৈসর্গিক নহে, হয়ত দূরদেশে ভূকম্প, নিতান্তই নৈসর্গিক কারণ। জ্ঞানের এই উন্নতির ফলে কি হইল? সৃষ্টিকর্ত্তা দেবতাগণসহ সদলবলে একপা হাটিলেন, প্রকৃতিক নিয়ম কারণরাজ্যে একপা অগ্রসর হইল।

সূর্য্য উঠে। চন্দ্র উঠে। রোজ রোজ উঠে আবার রোজ রোজই অস্ত যায়। জ্যোতির্বীজ্ঞানের সূত্রপাতের পূর্ব্বে ইহার কি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়? ইহারা গতিশীল অতএব জড় পদার্থ নহে। তবে কি হইবে?—প্রাণীবিশেষ, দেবতা; মানুষেরই মত তবে রামাশ্যামা নহে। পদের দীর্ঘতা বেশী, পদক্ষেপণের প্রণালীও অন্যরূপ। সর্ব্বদেশের প্রাচীন জাতির মধ্যে এই জ্যোতিষ কি করিয়া ইহাদের দেবত্ব হরণ করিয়াছে তাহা বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মানুষ যখনই দেখিল ইহাদের গতির ব্যতিক্রম হয় না, একভাবেই চিরকাল চলিয়া আসিতেছে তখনই ইহাদের সজীবত্বে সন্দিহান হইল।—ইহারা চলে না কেহ ইহাদের চালায়। নিজেই যদি চলে তবে ইহাদের স্বাধীন ইচ্ছা নাই কেন? আজ বা উঠিল কাল বা শুইয়া রহিল এরূপ করে না কেন? পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ করিয়াছে ধর্ম্ম গ্রন্থে প্রমাণ আছে। *

---

* (ক) সূর্য্যোদয়েঽবশঃ প্রাণৈর্বিয়োক্ষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ভাস্করালোকনাদেব স বিনাশ মবাপ্স্যতি॥
তস্য ভার্য্যা ততঃ ক্রুদ্ধা তং শাপমতিদারুণম্।
প্রোবাচ ব্যথিতা সূর্য্যো নৈবোদয় মুপৈষ্যতি॥
ততঃ সূর্য্যোদয়াভাবাদভবৎ সন্ততা নিশা।
বহূন্যহঃ প্রমাণানি ততো দেবা ভয়ং যযুঃ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১৬ অঃ। ৩০।৩১।৩২।

তখন বেচারাদের প্রাণ ছিল; জ্যোতিষ তখন তাহাদের মস্তকে কুঠারঘাত করে নাই; কিন্তু এখন আর বাঁচিয়া নাই, অস্থি মাত্রে অবশেষ হইয়াছে। নভোমণ্ডলে সচরাচর যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে মানুষ তাহা আর দৈবিক কারণসম্ভূত বলিয়া মনে করে না, নৈসর্গিক কারণই একমাত্র কারণের স্থল অধিকার করিতেছে। কিন্তু এখনও একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। যে ঘটনা যে পরিমাণে বিরল, সে স্থলে সেই পরিমাণে কারণান্তরকল্পনার স্থান রহিয়াছে। চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদি নৈসর্গিক নিয়মাধীন হইবার পরেও, গ্রহণ, ধূমকেতু, উল্কাপাত প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে মানুষ অন্য কারণ দেখিতে লাগিল। এমন কি Copernicus, Kepler প্রভৃতি অনেক স্থলে দৈবিক কারণ কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার আর উপায় নাই; তখন বৈজ্ঞানিক কারণ আবিষ্কৃত হয় নাই। এদিকে কারণানুসন্ধানের প্রবৃত্তি মানুষের বিশেষ প্রবল, কারণ ইহাই তাহার উন্নতির মূলমন্ত্র। প্রকৃত কারণাভাবে কল্পিত কারণ গড়িয়া তুলিতে হইবে। যে জ্যোতিষ্ক সূর্য্যমণ্ডলে কোন দিন দেখা দেয় নাই, অকস্মাৎ বা দৈবাৎ সে কেন দেখা দেয়? কেন ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বলতর, বৃহত্তর, বিভীষিকাময় হইয়া উঠে? কেন অমঙ্গলের বোঝা লইয়া রোষকষায়িত লোচনে ক্রমশ পৃথিবীর দিকে ঝুকিয়া পড়ে? বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দ্দিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনার দৈবত্ব চলিয়া গিয়াছে, আকস্মিকত্বমাত্র রহিয়া গিয়াছে। এস্থলেও দেবতার কার্য্যকরণী শক্তি অন্তর্ধান করিল, রহিয়া গেল কেবল ইহার নৈসর্গিক কারণ। আকাশ হইতেই বিজ্ঞান, দেবতাকে বিচ্যুত করিল।

এখন আকাশ ছাড়িয়া বায়ুমণ্ডলে আসা যাউক। সর্ব্বদা যে বায়ু বহিয়া যাইতেছে, প্রাকৃতিক নিয়ম ভিন্ন তাহার অন্য কারণ আছে একথা আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত চূড়ামণি মহাশয়ও বলিতে সাহস করিবেন না। এই বায়ু যখন প্রচণ্ড ঝটিকারূপে পরিণত হয় তখনই কিন্তু ভিন্নরূপ ব্যবস্থা হইবে। ঝটিকা নিবৃত্তির জন্য স্তব স্তুতির ব্যবস্থাও হইবে। যেন স্বেচ্ছাপরিচালিত কোন জীবের দ্বারা এই কার্য্য হইতেছে, তোষামোদপূর্ণ

বাক্যে যেন সে অন্যমূর্ত্তি ধারণ করিবে বা করিতে পারে। অতএব ব্যবস্থা হইল—

(ক) "বায়ব্যেষেষু নৃপতির্বায়ুং শক্তু ভিরর্চ্চয়েৎ।
আবায়োরিতি পঞ্চর্চো জাপ্যাশ্চপ্রয়তৈর্দ্বিজৈঃ।"

বৃহৎসংহিতা ৪৬ অঃ।

(মর্ম্মানুবাদ)

বায়ুকোণোত্থিত ঝটিকাদিরূপ দৈব বিপদ হইলে শক্তুর দ্বারা বায়ুর পূজা করিয়া 'আবায়ো' ইত্যাদি নিম্নোক্ত পাঁচটি ঋক্‌দ্বারা বায়ুর স্তব করিবে।

(ক) বায়বায়াহি দর্শতেমে সোমা অরঙ্কৃতাঃ।
তেষাং পাহি শ্রুধীহবং।

হে দর্শনীয় বায়ু! আইস, এই সোমরস সমূহ অভিষুত হইয়াছে; ইহা পান কর, আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর।

(ক) বায়উক্‌থেভির্জরন্তে ত্বামচ্ছাজরিতারঃ।
সুতসোমা অহর্বিদঃ।

হে বায়ু! যজ্ঞাভিজ্ঞ স্তোতাগণ সোমরস অভিষুত করিয়া তোমার উদ্দেশ্যে স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া স্তব করিতেছে।

(ক) বায়োতবপ্রপৃঞ্চতীধেনা জিগাতি দাশুষে।
উরূচী সোমপীতয়ে।

হে বায়ু! তোমার সোমগুণপ্রকাশক বাক্য সোমপানার্থ হব্যদাতা যজমানের নিকট আসিতেছে, অনেকের নিকট আসিতেছে।

(ক) ইন্দ্র বায়ূইমেসুতা উপপ্রয়োভিরাগতং।
ইন্দবো বামুশন্তিহি।

হে ইন্দ্র ও বায়ু! এই সোমরস অভিষুত হইয়াছে, অন্ন লইয়া আইস, সোমরস তোমাদিগকে কামনা করিতেছে।

(ক) বায়বিন্দ্রশ্চচেতথঃ সুতানাং বাজিনী বসূ।
তাবায়াতমুপদ্রবৎ।

হে বায়ু ও ইন্দ্র! তোমরা অভিষুত সোমরস জান, তোমরা অন্নযুক্ত হব্যে বাস কর; শীঘ্র নিকটে আইস।

যদি তাহাই হয় তবে তাহাতেও ত গোল। বায়ুর গতিপরিমাপক যন্ত্র স্থানে স্থানে ঘুরিতে দেখা যায়, তাহাতে ঐ গতির পরিমাপ হইয়া লিপিবদ্ধ হয়। এই বায়ুর গতি কখনও এক মাইল, কখনও দশ মাইল, কখনও এগার্ মাইল; এইরূপে ক্রমান্বয়ে একশত মাইল পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়; তাহা হইলেই ভীষণ ঝটিকায় পরিণত হইল। এখন বায়ুর এই যে এক হইতে একশত মাইল গতি, ইহার কোন স্থানে দেবতা হস্তক্ষেপ করিলেন বুঝিতে হইবে? ৯৯ মাইল পর্য্যন্ত গতির কারণ হইল স্বাভাবিক নিয়ম এবং তাহা ছাড়াইলেই দেবতা আবির্ভূত হয়েন, ইহাই কি মনে করিতে হইবে? বলা যাইতে পারে যে, ঐ সমস্তটাই দেবতা। তাহা হইলে দেবতা ও জড়প্রকৃতিকে মিশাইয়া ফেলা হয়। তাহার যে বিশেষ দোষ আছে তাহা পরে বিবেচ্য।

এখন বায়ুমণ্ডল হইতে ভূমণ্ডলে আসা যাউক। এখানে যে সমস্ত বিস্ময়কর ব্যাপার বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা কোথা হইতে আসিল, কে তাহাদের সৃষ্টি করিল, কে তাহাদের স্থিতি লয়ের ব্যবস্থা করিতেছে? প্রথমতঃ ভূকন্দর হইতে দেখিতে আরম্ভ করা যাউক। এখানে বহুতর খনিজ পদার্থ সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার কোনটা হীরকখণ্ড, কোনটা বা অঙ্গার, কোনটা স্বর্ণরৌপ্য, কোনটা বা প্রস্তরখণ্ড মাত্র। কোথা হইতে আসিল? কেনই বা ভূমধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে? ঈশ্বরের মহিমা বৈ আর কি বলা যাইতে পারে? বিজ্ঞান কিন্তু সন্ধান পাইয়াছে, এক্ষণে যাহা অঙ্গারময় ভূমিস্তর পূর্ব্বে তাহা পাদপময় প্রদেশ ছিল; পত্রাদির চিহ্ন খনিমধ্যস্থ পদার্থের উপর অঙ্কিত রহিয়াছে; এমন কি তৎপ্রদেশ-বিহারী জীবেরও প্রতিকৃতি নিবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, এই গুপ্তস্তর এরূপভাবে সৃষ্ট হয় নাই, পূর্ব্বে ইহার অন্য অবস্থা ছিল। ইহার বর্ত্তমান অবস্থা একটা নূতন সৃষ্টি নহে, পূর্ব্বের সৃষ্ট অবস্থার

রূপান্তর মাত্র। এই রূপান্তর সংঘটন করিতে নৈসর্গিক শক্তি অপর্য্যাপ্ত নহে। ভূমধ্য হইতে ভূপৃষ্ঠে আসিলে আমরা আরও বিস্ময়কর পদার্থ সমূহ দেখিতে পাই:—যোজনব্যাপী অভ্রভেদী শৈলমালা, অতলস্পর্শ দিগন্তব্যাপী সাগর, উত্তপ্ত রসহীন মরুভূমী; কে সৃজিল, কোথা হইতে আসিল? এ প্রশ্নের কি উত্তর আছে? ঈশ্বর ভিন্ন এ কৌতূহলের আর তৃপ্তি কোথায়? এ বিরাট ব্যাপার তিনি ভিন্ন আর কে সম্পন্ন করিতে পারে? মনুষ্যখনিত ঘনকৃষ্ণজলরাশি-পরিপূর্ণ বৃহৎ দীর্ঘিকা দেখিয়া তাহার নির্ম্মাতাকে আমরা কতই ধন্যবাদ দিয়া থাকি; কিন্তু এই সমুদ্র যে খনন করিয়াছে তাহার মহত্ব আরও কত বেশী! যে পর্ব্বত গড়িয়াছে, পিরামিড্ অপেক্ষা তাহার গুণপনা কত বেশী! বেশী অনেক, কিন্তু ঈশ্বরের যোগ্য নহে। সগরবংশও একদিন সমুদ্র খুঁড়িয়াছিল। কোটি কোটি মনুষ্য খনিত্র হস্তে লইয়া একটা সমুদ্র কতদিনে খুঁড়িয়া তুলিতে পারে, দৈর্ঘ্য বিস্তার ও গভীরতা পাইলে গণিত তাহা এখনই বলিয়া দিবে। কিন্তু যাঁহার মহিমা আমরা কীর্ত্তন করিতে যাইতেছি তাঁহার শক্তি যে আরও বেশী! এ সমস্ত বিষয় যে তাঁহার পক্ষে নিতান্তই ক্ষুদ্র! এসমস্ত ব্যাপার যতই বড় হউক, সীমাবদ্ধ; তাঁহার মহিমা যে অসীম! সেই অসীম মহিমার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পাইতে হইলে পাঠককে আরও উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, কল্পনাকে আরও মার্জ্জিত করিতে হইবে।

এখন সে কথা থাক। বিজ্ঞান চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছে যে এই সমুদ্রপর্ব্বতাদিও আদিম সৃষ্টি নহে; পূর্ব্বসৃষ্ট অবস্থার রূপান্তর মাত্র। হিমালয় শিখর যে একসময়ে সাগরগর্ভে ছিল, সামুদ্রিক জীবের চিহ্ন মস্তকে ধারণ করিয়া সে সাক্ষ্য দিতেছে; যাহা এখন ক্ষুদ্রক্ষুদ্র দ্বীপ পরিপূর্ণ প্রশান্ত মহাসাগর কালে তাহা বৃহৎ মহাদেশ ছিল। তবে সৃষ্টি হইল কি?—এই প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব্বাবস্থিত মহাদেশ? কি করিয়া বলা যায়? প্রমাণ কোথায়? ঐ মহাদেশের পূর্ব্ব অবস্থা ছিলনা তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণাভাবে ধরিয়া লওয়া যাউক যে ইহারও পূর্ব্বাবস্থা ছিল। তৎপূর্ব্ব অবস্থারও পূর্ব্ব অবস্থা ছিল। এই সমস্ত অবস্থার

পরিবর্ত্তন যদি নৈসর্গিক শক্তির সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের হস্ত সৃষ্টির পৃষ্ঠ হইতে অনেক দূর সরিয়া যায়। কোথায় থাকে, কি আদৌ থাকেনা তাহা পরে দেখা যাইবে।

৪। এ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিজ্ঞান পূর্ণপ্রমাণ না পাইলেও যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছে।

এস্থলে কথা উঠিতেছে, এই যে স্বাভাবিক নিয়ম ইহা কিরূপে এই ভূপৃষ্ঠকে বর্ত্তমান অবস্থায় গড়িয়া তুলিয়াছে, বিজ্ঞান কি তাহা সম্পূর্ণরূপে দেখাইতে পারে? নিঃসঙ্কোচে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, "না"। জগতের ব্যাপার অতি বিচিত্রতাপূর্ণ, মানুষের আয়ুঃ স্বল্প; বিজ্ঞানবিৎ কল্পনা করিয়া থাকেন ভূপৃষ্ঠবিহারী জীবের বয়স দশ কোটি বৎসর হইয়াছে, আর ৪০ কোটি বৎসর পৃথিবী জীবের বসবাসের উপযোগী থাকিবে। এই মাত্র ৫০ কোটি বৎসর বয়সের মধ্যে, সেই অনন্ত কৌশলির অনন্ত কৌশলময় সৃষ্টিরহস্য মানুষ নিঃশেষে বুঝিয়া লইতে পারিবে কি না সন্দেহ। সন্দেহ কেন, দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বলিতে হইবে, "পারিবে না"। কারণ, তাহা হইলে সৃষ্টি কৌশল অনন্ত হইল না, তাহার স্রষ্টার কৌশল অনন্ত হইল না; তিনি নিতান্তই শান্ত, নিতান্তই বুঝিবার বিষয়, নিতান্তই বৈজ্ঞানিক জীব হইয়া পড়িলেন।

মানুষের আয়ু স্বল্প বলিয়াই বোধ হয়. ইহার ভিতরই সমধিক কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইবার প্রবৃত্তি তাহার প্রবল। সূর্য্য রোজ উঠে, কিন্তু কাল উঠিবে কি না কে বলিতে পারে? উঠিতে নাও পারে এরূপ নক্ষত্র-বিপ্লব কল্পনার অতীত নহে; কিন্তু তবুও, নিজ কার্য্য উদ্ধারের জন্য মানুষ সিদ্ধান্ত করিয়া লইল—কালও উঠিবে, এখন কিছুদিন উঠিবে। কাল আবার আহারাদির আবশ্যক হইবে, তাহার উপকরণ আজই সংগ্রহ করিতে হইবে। আমাদের স্বামিজী হয়ত বলিবেন, "তোমরা কি ভ্রান্ত, কি মায়াবদ্ধ। এ যে সমস্তই অনিত্য তাহা জান না? অনিত্যকে নিত্যজ্ঞান করিয়া আবার আহারের উপকরণ সংগ্রহের জন্য লালায়িত হইতেছ? কালি যে পৃথিবী থাকিবে তাহার প্রমাণ কি?" কি করা যাইবে? সংক্ষেপে সিদ্ধান্ত না করিলে যে চলে না। পূর্ণ প্রমাণের জন্য

অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে যে কোন সিদ্ধান্তই করিবার সময় পাওয়া যাইবে না, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না; হয়ত এ ক্ষুদ্র শরীরের ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা বিশ্বস্রষ্টার পূজা করা যাইবে না; সেই নির্ম্মাতার বিশ্বনির্ম্মাণ কার্য্যে সহায়তা করা যাইবে না। যদি বল তাঁহার আবার সহায়তা কি? তাঁহার কি শক্তির অভাব আছে? না, তাহা নহে। এই নির্ম্মাণকার্য্যে সহায়তা করিতেও তিনিই বাধ্য করিতেছেন। এ কার্য্য হইতে পলায়ন করিবার পথরুদ্ধ করাও তাঁহারই ব্যবস্থা; নচেৎ মানুষ এরূপ বুঝিবে কেন? সংক্ষেপে সিদ্ধান্ত করিতে যাইবে কেন? সেই সিদ্ধান্তের উপর বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতে যাইবে কেন? স্বামিজী নিজের উপদেশ নিজেই পদে পদে, প্রকাশ্যে না হউক অপ্রকাশ্যে, লঙ্ঘন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না কেন? স্বীকার করা যাইতেছে যে মানুষের সিদ্ধান্ত নিঃশেষে নিশ্চিত নহে—এরূপ নিশ্চিত নহে যে তদ্বিপরীত ঘটনা সেই মানুষেরই কল্পনার অতীত; এবং তাহা হইবারও আবশ্যক নাই। কার্য্যের লঘুত্ব গুরুত্ব অনুসারে অল্পবিস্তর অনিশ্চিত হইলেও ক্ষতি নাই; বরং পূর্ণ নিশ্চয়তার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলেই ক্ষতি। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে ক্রমোন্মেষবাদ সম্বন্ধে বিজ্ঞান, ভূপৃষ্ঠে ও ভূকন্দরে যে প্রমাণ পাইয়াছে তাহা সিদ্ধান্তের পক্ষে পূর্ণ না হইলেও, যথেষ্ট। আরও দেখা যাইবে যে ইহার প্রতিকূল সিদ্ধান্ত মানুষের মনের উপযোগী নহে। প্রকৃতির সহিত সহবাস দ্বারা এতদিন ধরিয়া মানুষ যে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছে, যে ভাবে মনকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা সেই জ্ঞানের, সেই মনের উপযোগী নহে।

৫। জীবজগতে জীবের উৎপত্তি নৈসর্গিক কারণেই হইতেছে।*

এখন আমরা জড়জগৎ ছাড়িয়া জীবজগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের ব্যাপার দেখিতে চেষ্টা করি। জীবন কোথা হইতে আসিল, ইহা ঈশ্বরের নূতন সৃষ্টি কিনা, স্বাভাবিক নিয়মের উপর হস্তক্ষেপ কিনা তাহা দেখিতে হইবে।

---

* এই স্থান হইতে ৪৫ পাতা পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ Herbert Spencer's Principles of Biology হইতে সংগৃহীত।

বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যা অসংখ্য; ইহাদের পরস্পর পার্থক্যও অনেক। যে সমস্ত প্রাণী বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অতীতের গর্ভে যাহাদের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাদের জাতীয় পরিমাণ কয়েক লক্ষ হইবে। ইহা ভিন্ন উদ্ভিদ আছে। ভূমির নিম্নস্তরে যে জাতীয় জীবের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, তদূর্দ্ধস্তরে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। অতএব প্রমাণ হইতেছে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীব বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে। এই প্রমাণ কিন্তু ঠিক নহে। পূর্ব্বে জড়জগতে আমরা যেরূপ দেখিয়াছি—এক জাতীয় জীব যে অন্য জাতীয় জীবের রূপান্তর মাত্র তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। একই স্তরের জীব যেমন অন্য স্তরে পাওয়া যায় না, তেমন সমস্ত স্তরের জীবের মধ্যেই একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়; ভিন্ন স্তরে যে নূতন জীব পাওয়া যায়, তাহারা তাহার পূর্ব্বস্তরান্তর্গত জীবের অনুরূপ; স্তরগুলির মধ্যে একটা ধারাবাহিকত্ব আছে। পৃথিবীতে যত প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে তাহা এক আদিম উদ্ভিদ ও প্রাণীর রূপান্তর মাত্র, ইহা যদি বিজ্ঞান দেখাইতে পারে; এবং এই উদ্ভিদ ও জীব, জড় হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা যদি দেখাইতে পারে; তবেই বলা যায় ঈশ্বর স্থিতিলয় সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয়, স্বাভাবিক নিয়মই ক্রিয়াশীল। প্রথমোক্ত বিষয় অগ্রে লওয়া যাউক :— উদ্ভিদ ও জীব একমাত্র আদিম আদর্শ (type) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার প্রমাণ ষড়বিধ।

(ক) জাতিবিভাগমূলক প্রমাণ।

উদ্ভিদ ও প্রাণিগণের জাতিবিভাগ হইতে ইহার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যদি আমরা কোন স্থানে দুই ব্যক্তি দেখিতে পাই যাহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য সম্পূর্ণ, আমরা সিদ্ধান্ত করি তাহারা যমজ সন্তান— তাহারা এক পিতামাতা হইতে উৎপন্ন। যদি আমরা অপর দুই ব্যক্তি দেখি যাহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য সম্পূর্ণ না হইলেও ঘনিষ্ঠ, তখন সন্দেহ করি ইহারাও এক পিতামাতার সন্তান। পুনরায়, ইঁহাদের নিকট প্রশ্ন করিয়া যদি জানিতে পারি, উভয়ই এক পদবীধারী তখন এই সন্দেহ দৃঢ় হয়। দ্বিতীয় প্রশ্নের দ্বারা যদি জানিতে পারি, তাহারা একই

গ্রামবাসী, তখন এ সন্দেহ সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে যখন ইহারা পিতামাতার নাম সম্বন্ধে একই উক্তি করে তখন এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়িত হয়। জীবজগতে উপরোক্ত প্রশ্ন সমূহের কিরূপ উত্তর পাওয়া যায় দেখা যাউক।

মানুষে মানুষে বিস্তর বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, কিন্তু এই বৈলক্ষণ্যের ভিতর আপেক্ষিক সাদৃশ্যও দেখা যায়। বাঙ্গালি ও বেহারিতে যে পরিমাণে সাদৃশ্য, বাঙ্গালি ও বাঙ্গালীতে তাহা অপেক্ষা বেশী; বাঙ্গালি ও আফগানিতে বৈলক্ষণ্যের আরও বৃদ্ধি ও সাদৃশ্যের হ্রাস দেখা যায়। আবার যখন বাঙ্গালিতে বাঙ্গালিতে ভাষাগত সাদৃশ্য, আফগাণিতে বাঙ্গালিতে ভাষাগত বৈষম্য দেখা যায়, তখন সন্দেহ করা যাইতে পারে, ইহাদের উৎপত্তিগত সাদৃশ্য ও বৈষম্য আছে। আবার যখন দেখা যায়, ইহাদের অধ্যুসিতপ্রদেশগতসাদৃশ্য আছে তখন এই সন্দেহ সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। আবার যখন ইহাদের মধ্যে প্রচলিত কিম্বদন্তিতে একই জনকের কথা পাওয়া যায়, তখন নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, মনুষ্যের জাতীয়তা অনুসারে উৎপত্তির সাদৃশ্য ও বৈলক্ষণ্য আছে; অর্থাৎ সমগ্র বাঙ্গালী জাতি একই পিতামাতার সন্তান, আফগাণ-জাতি ভিন্ন আর এক পিতামাতার সন্তান। সমগ্র মনুষ্যজাতিই যে এক পিতামাতারসন্তান তৎসম্বন্ধেও কিম্বদন্তি আছে। ইহার সহিত যদি অন্যান্য কারণ একত্রিত করা যায় তাহা হইলে সেরূপ সিদ্ধান্তও অযৌক্তিক হইবে না।

মানুষের ন্যায় পৃথিবীস্থ অন্যান্য জীবকেও জাতিনির্ব্বিশেষে বিভাগ করা যায়, যথা—বানর জাতি, হরিণ জাতি, ব্যাঘ্র জাতি। ইহারাও কি এক এক পিতামাতার সন্তান? তৎসম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে এস্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক। আমেরিকা প্রদেশের বানরের মধ্যে এবং এসিয়াদি প্রদেশের বানরের মধ্যে দন্ত ও নাসিকার গঠনে একটা মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়,* ইহার কারণ কি? আমেরিকাখণ্ডের বানরের এই আকৃতি এসিয়াদি খণ্ডের বহুবিধ বানর

* Darwin's descent of man Part I Chap. VI.

জাতির মধ্যে আদৌ দেখা যায় না কেন? ইহাদ্বারা অনুমান করা যায় না কি যে, ইহাদের মধ্যে জন্মগত বিভিন্নতা আছে? গৃহপালিত পশুপক্ষীর মধ্যে মানুষই অনেক রকম বিভিন্নতা উৎপন্ন করিয়াছে ও করিতেছে; তখন বানর নানা জাতীয় হইলেও ইহা কি অসম্ভব যে তাহারা একই পিতামাতার ঔরসজাত এবং এক জাতীয়? দেশভেদে এই বানর জাতিরও বৈলক্ষ্যণ্য এবং একই প্রদেশের বানর জাতির মধ্যে আপেক্ষিক সাদৃশ্য দেখা যায়। অবশ্য বানরের ভাষাগত সাদৃশ্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে এবং তাহাদের মধ্যে কোন কিম্বদন্তিই প্রচলিত নাই; সুতরাং আমাদের পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর এস্থলে পাওয়া গেল না। যাহা হউক, ধরিয়া লওয়া যাউক যে তাহারাও একই পিতামাতার সন্তান। অন্যান্য যে সমস্ত জীব আছে—সর্পজাতীয়, মৎস্য জাতীয়, শম্বুকজাতীয়, তাহারাও এক এক পিতামাতার সন্তান। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান যে ভূরি ভূরি প্রমাণ আবিষ্কার করিয়াছে তাহা আলোচনার স্থান নাই, আবশ্যকতাও তত নাই। এখন প্রশ্ন হইবে তাহা স্বীকার করিলেই বা কি হইল? আমাদের প্রামাণ্য বিষয় যাহা, অর্থাৎ সমস্ত জীব একই জীব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করা হইল কৈ? বিভিন্ন জাতীয় জীবের এক জাতীয়ত্ব প্রদর্শিত হইল কৈ? এখন তাহারই চেষ্টা করা যাউক।

আমরা অনেক কোটি মনুষ্য জাতি আছি, ইহাদের উদ্ভব দুইরূপে হইতে পারে; প্রথম—ঈশ্বর প্রত্যেককে পৃথক পৃথক সৃষ্টি করিয়াছেন, দ্বিতীয়—তিনি জাতীয় আদিপুরুষ ও স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন; নৈসর্গিক কারণে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইয়া বর্ত্তমান সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। প্রথমোক্ত অনুমানের পক্ষে একটা বিশেষ অন্তঃরায় আছে। ঈশ্বর প্রত্যেককেই যদি পৃথকভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে বংশগত সাদৃশ্য ও বিভিন্নতা হয় কেন, জাতিগত সাদৃশ্য ও বৈলক্ষ্যণ্যই বা হয় কেন? বাঙ্গালির মধ্যেও ব্যক্তিবিশেষের বর্ণ হয়ত সাদা হইতে পারে—এস্থলে তাহা ধরিবার আবশ্যক নাই—তাহার বিচার পরে করা যাইবে। সাধারণত এই সাদৃশ্য ও বৈষম্য হয় কেন, উপস্থিত তাহাই দেখিতে হইবে। অতএব প্রত্যেক মানুষকে পৃথক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন না

বলিয়া, দ্বিতীয়রূপ সৃষ্টির সম্ভাবনাই অনুমান করিতে হইবে। যদি এই দেড়শত কোটি মনুষ্য প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সর্ব্বাংশে অনুরূপ হইত, তাহা হইলে এই সাদৃশ্য, বিশেষ সৃষ্টির ফল (Special creation) না বলিয়া জন্মগত বলিয়াই মনে করিতে হইত। কারণ, যদি পৃথক্ ভাবেই সৃষ্টি হইত, তবে মানুষ বিভিন্ন ভাবে গঠিত হয় না কেন?

"তাঁহার ইচ্ছা"

বলিয়াই তৃপ্ত থাকা যায় কি? কারণানুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি নিরস্ত থাকে কি? যাহার থাকে না তাহারই জন্য বিজ্ঞান। আজ অন্তত ৩০০০ বৎসর হইতে, দর্শন বিজ্ঞানের সূত্রপাত হইতে, ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া কারণানুসন্ধান হইতে মনুষ্য ক্ষান্ত থাকিতে পারে নাই। এই সাদৃশ্য জন্মগত হইলে তাহার কারণ নৈসর্গিক হয়, আর ঈশ্বরেচ্ছা বলিলে অনৈসর্গিক হয়। তবে যে সর্ব্বাঙ্গীন সাদৃশ্য না থাকিয়া বহু বৈষম্য লক্ষিত হয়, তাহার কারণও ঐরূপ : হয় নৈসর্গিক, না হয় অনৈসর্গিক। যদি বলা যায় কারণ অনৈসর্গিক, তাহা হইলে এই যে সাদৃশ্য বৈষম্য, ইহা জাতিগত হয় কেন?

"ঈশ্বরেচ্ছা।"

এখন সবই যদি হইল ঈশ্বরেচ্ছা, তবে দর্শন বিজ্ঞানের স্থান রহিল কোথায়, জ্ঞানের চর্চ্চার বিষয় রহিল কোথায়? এই যে মানুষের জ্ঞানোন্মুখী প্রবৃত্তি ইহাও ত ঈশ্বরেচ্ছা—না ইহা মায়া? তাহা হইলে তোমার ঐ যে প্রবৃত্তি, তাহাই বা মায়াপ্রণোদিত না হইতে পারে কেন? কেন না তুমি ধর্ম্মের দোহাই দিতেছ, সর্ব্বত্রই "ঈশ্বরেচ্ছা" দেখিতেছ; পূর্ব্বে কিন্তু তোমাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, সবই ঈশ্বরেচ্ছা নহে, প্রাকৃতিক নিয়মও কার্য্য করে বটে। এখন আমার এই জ্ঞানমুখী প্রবৃত্তি যদি মায়াপ্রণোদিত হয়, তবে তোমার ঐ অযথা ঈশ্বরমুখী প্রবৃত্তিকে আমি মহা মোহপ্রণোদিত প্রবৃত্তি বলিব। যখন প্রাকৃতিক নিয়মের স্থল আছে, তখন কোথায় ঈশ্বরেচ্ছা এবং কোথায় প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিতে হইবে? যথায় এই প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা কার্য্য হওয়া

অনুমেয়, তথায় ঈশ্বরকে টানিয়া আনা মূর্খতার স্বধর্ম্ম ভিন্ন উৎকৃষ্ট কোন ধর্ম্মভাব বলা যাইতে পারে না।

এখন আমরা পাইলাম যে, বিভিন্ন জাতীয় জীব, সেই জাতীয় একই পিতামাতার ঔরসজাত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বিভিন্ন জাতীয় জীবও যে একমাত্র আদিম জীব হইতে উদ্ভূত, এরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রমাণ এখানে খুব বেশী নাই। মানুষের পরেই বানর জাতি। যমজ সন্তানের আবয়বিক সাদৃশ্য লইয়া যেখানে আমরা আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেখান হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িলেও, সেই সাদৃশ্যের ছায়া এখনও অবলোকন করিতে পারা যায়। যেমন সম্পূর্ণ সাদৃশ্য হইতে আমরা উৎপত্তির একতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম, এস্থলে তাহার সম্পূর্ণতা না থাকিলেও সেই একতারই উপলব্ধি করিতে হইবে; তবে বানর ও মনুষ্যজাতির একত্বসম্বন্ধ বহুপূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। ইহাদের মধ্যেও সাদৃশ্য আছে বলা যায়। সাদৃশ্য দুই প্রকার—সম্পূর্ণ ও আপেক্ষিক। ব্যাঘ্রাদি জাতি অপেক্ষা বানরের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে। আকৃতিগত সাদৃশ্য ত পাওয়া গেল, এখন ভাষাগত সাদৃশ্য আছে কি? উচ্চমঞ্চ হইতে অবিরল উদ্গারিত রাজনৈতিক বক্তৃতার ভাষার সহিত বানরের কিচ্‌মিচের কি সাদৃশ্য থাকিতে পারে? যদি থাকে, তবে তাহা ব্যাঘ্রের গর্জ্জনের সহিত তুলনায়। তবে বক্তৃতারও তর্জ্জন কম নহে। জীব-জগতে জাতিভেদ অনুসারে সাদৃশ্য ও বৈষম্য দেখিয়া অনুমান করা যায়, বিভিন্ন জীবোৎপত্তির কারণ নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক নহে। সন্তানের যে অংশ পিতামাতার অনুরূপ তাহা পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত, ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত নহে বলিতে হইবে; তাহার কর্ত্তা পিতামাতার স্বাভাবিক সন্তানোৎপাদিকাশক্তি মাত্র, অন্য কর্ত্তার অনুমানের আবশ্যকতা নাই। অন্য কর্ত্তা থাকিলেই বা তিনি এই সাদৃশ্য লোপ করেন না কেন? এই সাদৃশ্য ও বৈষম্য, সন্তানের দেহমনের সহিত এরূপ অচ্ছেদ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট কেন?

(খ) ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ উৎপত্তির প্রকরণ গত।

বিভিন্ন জাতীয় জীবজন্তু যে নৈসর্গিক বলে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার

দ্বিতীয় কারণ ইহাদের উৎপত্তির প্রকরণ হইতে পাওয়া যায়। মানুষ হইতে মানুষ হয় কেন? ধান্যের বীজ হইতে ধান্য হয় কেন? স্বাভাবিক নিয়ম ভিন্ন, অন্য কেহ যদি মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তা হয়, তবে মানুষকে গড়িয়া পাঠায় না কেন? আরও দেখিতে হইবে, ইহার সৃষ্টির সহিত যদি স্বাভাবিক নিয়মের সম্বন্ধ না থাকে, তবে মানুষ হইতে মানুষই হয় কেন?—বানর হইতে বানরই বা হয় কেন? বানর হইতে—অন্ততঃ কলিযুগে—মানুষ হয় না কেন? ধান্যের বীজ হইতে ধান্যই হয় কেন? কোটি ধান্যের বীজ হইতে একটাও গোধূম হয় না কেন? একটা অতি সাধারণ ঘটনার মধ্যে কি বৃহৎ রহস্য লুক্কায়িত থাকে তাহা, প্রাণী হইতেই প্রাণী উৎপন্ন হয়, প্রাণীর সংস্পর্শ ব্যতীত প্রাণ্যন্তর জন্মায় না, এই ঘটনার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে। প্রাণী ভিন্ন নূতন প্রাণী জন্মায় না কেন? এক শ্রেণীর প্রাণী হইতে সেই শ্রেণীর প্রাণী ভিন্ন অন্য শ্রেণীর প্রাণী জন্মায় না কেন? তবে কি প্রাণীই প্রাণীর নির্ম্মাতা? অন্য নির্ম্মাতা থাকিলে এই নির্ম্মাণ কার্য্য প্রাণীর ভিতরে এরূপ সীমাবদ্ধ কেন? এমন কি, কর্দ্দম হইতেও সৃষ্টিকর্ত্তা একটিও প্রাণী সৃষ্টি করেন না কেন? যখন তাহা হইতে আদৌ দেখা যায় না, তখন কোন প্রাণী, বিশেষ-সৃষ্টির ফল বলিতে সঙ্কোচ করিতে হয়। নিম্নশ্রেণীর কীটাণু দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটা কীটে পরিণত হয়। এই স্থলে এই নূতন কীটাণুকে ঈশ্বর সৃষ্টি করিলেন না বলিয়া, আদি (Parent) কীটই তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে পারা যায়; আহার্য্যদ্বারা নিজ অঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মের বলে, এই নূতন কীটকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে বলিতে হইবে। যে সমস্ত প্রাণী বিভক্তি দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সংযোগদ্বারা নূতন প্রাণী উৎপাদন করে, তাহাদের অপত্যগঠন-প্রণালী অত্যন্ত জটিল হইলেও, তাহারাও স্বাভাবিক নিয়মের বলেই তাহা করিয়া থাকে মনে করিতে হইবে। স্বসদৃশ ক্ষুদ্র একটি জীব তাহারা নিজ শরীর দ্বারাই গঠন করিয়া তোলে। শরীরের মধ্যে এই যে গঠন কার্য্য সাধিত হয়, ইহার কর্ত্তা কে? ঈশ্বর ভিন্ন, স্বাভাবিক শক্তি কি এই গঠন কার্য্য করিতে অসমর্থ? শক্তিকে উত্তমরূপ না জানিয়া তাহা বলা যাইতে পারে না; এবং তাহা জানিবার পূর্ব্বে

ঈশ্বরকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা মনের উন্নত অবস্থা নহে। আবার ইহার—

(গ) তৃতীয় প্রমাণ ভ্রূণতত্ত্বগত।

তৃতীয় কারণ দেখা যাউক। মানুষ হইতেই যদি মানুষ হইল, তবে সে প্রথমেই মানবরূপী না হইয়া ক্রিমিরূপে জন্মগ্রহণ করে কেন? যখন তাহার এই ক্রিমিরূপ তখন নিম্নজাতীয় পশুর আদিম ক্রিমিরূপের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য বিশিষ্ট। এমন কি প্রাণী মাত্রেরই প্রথমরূপ, ক্রিমিরূপ; এবং ঐ প্রথম অবস্থায় সর্ব্বজাতীয় জীবই বিশেষ সাদৃশ্যবিশিষ্ট। ঐ আদিম অবস্থার প্রাণি যদিও একই রূপ প্রাণী বলা যাইতে পারে না, তথাপি তাহাদের মধ্যে গঠনের পার্থক্য নিতান্ত অল্প। ক্রিমি যখন ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পার্থক্য জন্মাইতে থাকে। এরূপ কেন হয়? যদি তাহাদের জন্ম প্রাকৃতিক নিয়মের বলে না হইয়া থাকে, একশ্রেণীর জীব যদি অন্য শ্রেণীর জীব হইতে উদ্ভূত না হইয়া থাকে, তবে তাহাদের আদিম অবস্থার এই সাদৃশ্য কেন? ইহা কি মনে করা যায় না, সেই যে প্রাথমিক ক্রিমিঅবতার, সেই মাত্র আদিতে বর্ত্তমান ছিল; ক্রমান্বয়ে প্রাকৃতিক নিয়মের বলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যাদিতে পরিণত হইয়াছে। যেমন একজন মানুষ একটি ক্রিমির বৃদ্ধির ফল, সেইরূপ সমগ্র মনুষ্যজাতি আদিম ক্রিমি-সম্প্রদায়বিশেষের বিকাশের ফল। অবশ্য ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই; কোন মানুষই এই ঘটনা সংঘটিত হইতে চক্ষে দেখে নাই; বিজ্ঞান-মন্দিরে যন্ত্র সাহায্যেও ইহা দেখাইবার উপায় নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ নহে, অনুমানও প্রমাণ বটে। এইরূপ অনুমান করিবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে কি না তাহাই দেখিতে হইবে। ব্রহ্মার সমবয়স্ক কোন মানুষের সন্ধান করিতে পারিলে তাহার নিকট হয়ত এ বিষয়ের চাক্ষুস প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। তাহা যতক্ষণ পাওয়া না যায়, ততক্ষণ বিজ্ঞান আমাদের আয়ু অতীতের মধ্যে যতদূর টানিয়া বাড়াইতে পারে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

(ঘ) ইহার চতুর্থ প্রমাণ দেহনির্ম্মাণতত্ত্বগত।

দেহনির্ম্মাণতত্ত্ব (Morphology) হইতে ইহার চতুর্থ প্রমাণ পাওয়া যায়। পতঙ্গশ্রেণীর জীব অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাহাদের গঠনবিচিত্রতাও অসীম। পঙ্গপাল হইতে ভ্রমরের, প্রজাপতি হইতে একটি মধুমক্ষিকার, কতই পার্থক্য! কিন্তু সমগ্র পতঙ্গজাতীয় জীবের শরীরের মধ্যে লুকাইত একটি রহস্য তাহাদের জন্মের পরিচয় দিতেছে; ইহাদের সকলেরই অঙ্গ সপ্তদশ খণ্ডে বিভক্ত। কেন এরূপ হইল? কাহারও ষোড়শ খণ্ডে বিভক্ত হইলেও তাহার জীবনযাত্রার কোন বাধা হইত না। তবে গঠনের এই একত্ব কেন? ইহা কি ইহাদের একই আদিমপতঙ্গ হইতে জন্মের সাক্ষ্য দিতেছে না? মানুষের কঙ্কালমধ্যে মেরুদণ্ড প্রধান কঙ্কাল। ইহা একটা হাড় নহে, তেত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত। এই মেরুদণ্ড মৎস্য ও সরীসৃপেরও আছে; ইহাদের এই মেরুদণ্ডের সমস্ত অংশই নমনশীল হওয়া প্রকান্ত আবশ্যক; দৃঢ় এক খণ্ড অস্থি হইলে ইহারা চলিতে পারে না। মানুষের এই কঙ্কালের শেষাংশ দৃঢ় হওয়াই আবশ্যক; দেহের উপরাংশের সমস্ত ভার এই অংশের উপর পড়িয়াছে। কিন্তু তত্রাচ এই অংশ খণ্ডাকার; তবে এইস্থানে শেষ কয়েক খণ্ড দৃঢ়সংবদ্ধ। কেন এরূপ হইল? এই কয়েক-খণ্ডপরিমিত অংশ একটিমাত্র অস্থি কেন হইল না? এই খণ্ডাকৃতি পুনঃরায় মানুষের জন্মের পরিচয় দিতেছে; এবং মৎস্য সরীসৃপের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট করিতেছে।

(ঙ) ইহার পঞ্চম প্রমাণ অনাবশ্যকীয় প্রত্যঙ্গের (aborted and rudimentary organs) অস্তিত্বগত।

গৃহপালিত পক্ষী উড়িতে পারে না কিন্তু তাহাদের পক্ষ আছে; কেন তাহারা পক্ষ লইয়া জন্মায়? লাঙ্গুলবিহীন যে একশ্রেণীর পালিত কুক্কুর আছে, তাহাদেরও সামান্য একটু লাঙ্গুল থাকিয়া যায়; কেন থাকিয়া যায়? কদলীবৃক্ষ বীজ হইতে জন্মায় না; কদলির ভিতর বীজ জন্মায় কেন? গৃহপালিত বৃষের শৃঙ্গের বিশেষ আবশ্যক নাই; কোন কোন বৃষের শৃঙ্গ ঝুলিয়া থাকে, তাহাদ্বারা যুদ্ধ চলিতেই পারে না; এমন হয় যে কাহারও এই শৃঙ্গ নিজের মস্তকের ভিতর প্রবেশ করিতে থাকে, তখন

তাহা কাটিয়া দিয়া বৃষের প্রাণরক্ষা করিতে হয়। এস্থলে এ শৃঙ্গের দ্বারা যে কোন উপকার হইতেছে না তাহা নহে, প্রাণনাশের উপায় হইয়াছে। এরূপ কেন হয়? ইহাতে কি ইহাদের জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া যাইতেছে না? ইহাদের যখন ভিন্ন অবস্থা ছিল, তখন এই সব প্রত্যঙ্গের আবশ্যকতা ছিল; এখন তাহা না থাকিলেও, অঙ্গে নিবদ্ধ জন্মকোষ্ঠী-স্বরূপ ইহাদিগকে বহন করিতে হইতেছে। অর্থাৎ এইশ্রেণীর জীব পৃথক ভাবে সৃষ্ট হয় নাই, অন্যশ্রেণীর জীব হইতে জন্মিয়াছে।

(চ) ইহার ষষ্ঠ কারণ ভৌগলিক বিভাগ হইতে পাওয়া যায়।

ইহার ষষ্ঠ ও শেষ কারণ: জীবের স্থানীয় বিভাগ। বাঙ্গলার মৃত্তিকা বাতাবি-লেবু উৎপাদনের উপযোগী অবস্থায় আজ অন্ততঃ লক্ষ বৎসর পড়িয়া রহিয়াছে; কৈ, ভগবান ত একটিও বাতাবিবৃক্ষ সৃষ্টি করিলেন না! বিদেশী বণিক যতদিন না ইহার অঙ্কুর ইহার স্বনামখ্যাত প্রদেশ হইতে আনয়ন করিয়া রোপণ করিল, ততদিনত এইবৃক্ষ এখানে আপনা হইতে গজাইল না। তবেই বলিতে হইবে, জীব হইতেই জীবের সৃষ্টি হয়; জীব ভিন্ন জীব উৎপন্ন হয়না।

এই ষড়বিধ কারণ একত্র করিয়া দেখিলে বিভিন্ন জাতীয় জীব যে এক আদিম জীব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। অবশ্য একজীব হইতে অন্যজীব যে করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে ধরা যায় নাই; বিজ্ঞান এখনও তাহার সমগ্র ব্যাপার বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু, পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেই পূর্ণজ্ঞানের জন্য বসিয়া থাকিলে চলে না; বসিয়া থাকিলেও সেই জ্ঞান আপনা হইতে লাভ হইবে না, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। অনুমানের উপযুক্ত কারণ থাকিলে একটা তত্ত্বের অনুমান (theory) করিয়া ক্রমশ সর্ব্বাঙ্গীন প্রমাণ সংকলনের চেষ্টা করিতে হইবে। অনুমানেরও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে; ইহা অবশ্যই মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির অন্যতম উপায়; অন্যথায় কেন ইহার এরূপ বহুল চর্চ্চা? সম্পূর্ণ প্রমাণের জন্য বসিয়া থাকিলে কোন তত্ত্বেরই আবিষ্কার হইতে পারে না। অগ্রে একটা লক্ষ্যস্থল স্থির না হইলে কা'র উদ্দেশ্যে গমনকরা

যাইবে? আনুমানিক তত্ত্বই এই লক্ষস্থল। যেমন কোন একটা অট্টালিকা গড়িয়া তুলিতে হইলে অগ্রে তাহার কল্পনা করিতে হয়; অন্যথায় যাহার যেমন ইচ্ছা চক্ষুবুজিয়া গাঁথিয়া গেলে বিশেষ বাসোপযোগী মন্দির প্রস্তুত হয়না; তেমন মানুষের মন যে একটা তত্ত্ব গড়িয়া তুলিবে, তাহার পূর্ব্বেই সেই তত্ত্বের কল্পনা করিতে হয়; অন্যথায় কিছুই গঠিত হয়না। এই ষড়বিধ যুক্তি অনেকের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হইবে না। এরূপ যে হইতেছে তাহাত দেখা যাইতেছে না; কি করিয়া এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বাস করা যায়? ইহার উত্তরে, আর একটা কল্পনার অবতারণা করা যাউক; অন্য কোন লোক হইতে তদ্দেশীয় একটী জীব এই পৃথিবীতে প্রথম ভ্রমণ করিতে আসিল। এই জীব আমাদেরই ন্যায় জ্ঞানসম্পন্ন কিন্তু তাহার আয়ু অত্যন্ত অল্প। যে কয় মুহূর্ত্ত তাহার আয়ু সে তাহারই মধ্যে মনুষ্যসমাজে ঘুরিয়া ফিরিয়া সিদ্ধান্ত করিল, প্রত্যেক মানুষই যেরূপ আছে সেইরূপেই ভগবান তাহাকে সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছেন; কারণ, তাহার ক্ষুদ্রায়ুর মধ্যে কোন মনুষ্যদেহের কোন পরিবর্ত্তন সে দেখিতে পাইল না; অতএব স্থির করিল, কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। যে শিশু সে শিশু অবস্থায়ই আসিয়াছে, যে বালক সে বালক অবস্থায়ই আসিয়াছে, যে বৃদ্ধ সে সেই অবস্থায়ই আসিয়াছে। এখন সমগ্র জীবের আয়ুর তুলনায়, মানুষের আয়ু এইরূপ ক্ষণস্থায়ী বটে; এই ক্ষণস্থায়ী আয়ুর মধ্যে একজীব রূপান্তরিত হইয়া অন্যজীবে পরিণত হওয়া দৃষ্ট হইল না বলিয়া, তাহা হয় নাই মনে করিলে পূর্ব্বোক্ত সংস্রায়ুষ্মান জীবেরই অনুরূপ সিদ্ধান্ত হইবে।

জড়-জগৎ হইতে জীব-জগতের পরিবর্ত্তনশীলতার একটু বিশেষত্ব আছে। জড়-জগতে এই পরিবর্ত্তন অনেকটা ধারাবাহিক, কিন্তু জীব-জগতে ইহা আপাতবিচ্ছিন্ন। এস্থলে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, তাহার ধারাবাহিকত্বের প্রচ্ছন্নতার জন্যই ক্রমবিকাশ সহজে অনুমিত হয় না। বিজ্ঞানের অনেক উন্নত অবস্থা ভিন্ন ঐ ধারাবাহিকত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। আজ পৃথিবীতে যে ১৫০ শত কোটি মনুষ্য বাস করিতেছে, তাহারা প্রত্যেকেই ১০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে যে ক্রিমিরূপে বিদ্যমান ছিল,

সেইরূপ হইতে যদি অপ্রতিহত, অবিচ্ছিন্ন-ভাবে বর্ত্তমানরূপে পরিণত হইত, তাহা হইলে ক্রমবিকাশবাদ সহজেই বোধগম্য হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই; সেই ক্রিমিজনক হইতে জীবনধারা বহু কোটিবার বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; মৃত্যু আসিয়া বহু কোটিবার খড়্গাঘাতে জীবনপ্রবাহ ছিন্ন করিয়াছে—কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই বিচ্ছেদ সর্ব্বাঙ্গীন নহে, আংশিক মাত্র। যে সামান্য অংশ ছিন্ন হয় নাই, তাহা ক্রিমি হইতে মনুষ্যকে পর্য্যন্ত এক ক্রমবিকাশসূত্রে গ্রথিত রাখিয়াছে। কিরূপে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সাধিত হইয়াছে, জীবনস্রোত কিরূপে অব্যাহত রহিয়াছে, আর একটু ভাল করিয়া দেখা যাউক। জীব হইতে জীবান্তর সৃষ্টির যে প্রথম প্রকরণ, তাহা বিভেদমূলক (fissional) : একটি ক্রিমি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যখন দুইটা ক্রিমিতে পরিণত হইল, তখন জীবনের ধারাবাহিকত্ব রহিয়াই গেল। জীবান্তর সৃষ্টির দ্বিতীয় অবস্থা সংযোগমূলক। এখানে ধারাবাহিকত্ব অনেকাংশে প্রচ্ছন্ন হইয়া গেলেও বিচ্ছিন্ন হয় নাই; কারণ তাহা হইলে পিতাপুত্রে সাদৃশ্য থাকে কেন? জীবে জীবে সাদৃশ্য থাকে কেন? সন্তানে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় কেন? *

এই ধারাবাহিকত্বের প্রমাণ যখনই পাওয়া গিয়াছে, তখনই ক্রম বিকাশবাদ বিশেষ-সৃষ্টিবাদকে স্থানচ্যুত করিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা দ্বারা নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে :—

(১) জগতে আমরা ত্রিবিধ কার্য্য দেখিতে পাই—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়।

* (ক) পতির্ভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়া স্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥

মনু—৯।৮

তস্যাং পুনর্ভবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে।
তজ্জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥
আত্মা বৈ পুত্র নামাসি—শ্রুতিঃ—
ঐ টীকায় কুল্লকধৃত বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ।

(২) এই ত্রিবিধ কার্য্যের ত্রিসংখ্যক কর্ত্তার অনুমান করা যায়—ঈশ্বর, দেবতা ও প্রাকৃতিক নিয়ম।

(৩) মনুষ্যের জ্ঞানের উন্নতিসহকারে প্রথম ও দ্বিতীয় কর্ত্তা ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছেন। অনেক স্থলে যেখানে তাঁহারা কর্ত্তা ছিলেন, এখন আর সেস্থলে তাঁহারা কর্ত্তা নাই, যথা—আকস্মিক বিপদ্‌পাত ইত্যাদিতে। ইঁহারা যতই সরিয়া যাইতেছেন প্রাকৃতিক নিয়ম ততই ইঁহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় কাহার কতটুকু কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে তাহাই নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। ঈশ্বর ও দেবতার কর্ত্তৃত্ব কি একেবারেই নাই? যদি থাকে তবে কোথায়? ইউরোপীয় বিজ্ঞান জড়কে এখনও জীবন দিতে পারে নাই; জড় হইতে অতি নিম্নশ্রেণীর জীবও সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ধর্ম্মযাজকগণ বলেন, এখানেই সৃষ্টিপরিচালনকার্য্যে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়, নচেৎ জড় হইতে জীবন কি করিয়া উদ্ভূত হইল? ঈশ্বর স্বয়ং পৃথিবীর বিবর্ত্তনের কোন এক সময়ে জীবনীশক্তি সংক্রামিত করিয়াছেন, অন্যথায় কোথা হইতে আসিল? এ তত্ত্ব মীমাংসার জন্য আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব, যাহা এতক্ষণ বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিতেছিলাম, তাহা, সেইদিক ছাড়িয়া দিয়া, দর্শন বা আমাদের মনের দিক দিয়া দেখিব।

৬। একত্বপ্রতিপাদিকাবুদ্ধির উৎপত্তি।

আমি কি দিয়া দেখি, চক্ষু দিয়া? কে নিতান্তই আমার, আমার হস্ত? না, তাহা হইতে পারে না; আমার হস্তদ্বয় বিচ্ছিন্ন হইলেও আমার আমিত্ব থাকিয়া যাইবে। এমন কোন অঙ্গের উল্লেখকরা যাইতে পারেনা, যাহার অভাবে অহংজ্ঞানের লোপ হইবে; তবে অঙ্গের বহুল অভাব হইলে, জীবনের সহিত অহংজ্ঞানের লোপহয় বটে। এস্থলে ধরিয়া লওয়া যাউক, অঙ্গের অভাবে যে অহংজ্ঞানের লোপ হইল তাহা বস্তুর লোপ নহে, আধারের লোপ। অঙ্গ অহংজ্ঞানের আধার। জীবনমাত্র কিন্তু অহংজ্ঞান নহে; ইহা জীবনের বিশেষত্ব—'আমার' জীবন। আমার জীবন, এই জ্ঞানই আমার অহংজ্ঞান। কেবল মাত্র জীবনের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, আমার জীবন হইলে তবে আমি জগতের

সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইলাম। এই অহং তবে কোথায় ?—অবশ্যই মনে। মনের সকল অংশই আমি নহি ; আমার মেধা বহুবৃদ্ধি হইলেও আমি, আমি থাকিব ; বুদ্ধির তারতম্য হইলেও আমি থাকিব। তবে মনের কোন্ অংশ আমি ?—আমার পূর্ব্বস্মৃতির অংশ—অর্জ্জিত জ্ঞানের অংশ। এই পূর্ব্বস্মৃতি কিছুই না থাকিলে আর আমি, আমি থাকিলাম না ; আমি অন্যে পরিণত হইয়া গেলাম ; অতএব মনের স্মৃত্যংশই আমি, এই স্মৃত্যংশই নিতান্ত আমার। আমি জন্মিয়াছি একদিন মরিব ; বহুলোক জন্মিয়াছিল এবং মরিয়াছে—কিন্তু সকলের অস্তিত্ব লোপ হয় নাই ; পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে তাহা রক্ষিত হইতেছে। এস্থলে আমার অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান রহিয়াছে আমার সেই স্মৃতি। জগতের সহিত পরিচিত হইয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহা একেবারে বিনষ্ট হইতেছে না, পুত্র-পৌত্রাদিতে সংক্রামিত হইয়া জাতীয়জ্ঞানে পরিণত হইতেছে। আমি যে বহু আয়াস-সহকারে সভাষ্য বেদান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছি, তাহা কিন্তু আমার পুত্র সম্পূর্ণ পাইতেছে না ; আমার অর্জ্জিত জ্ঞানের সকল অংশই জাতীয় জ্ঞানে পরিণত হইতেছে না। ইহার কারণ কি ? প্রকৃতি ব্যক্তিগত জ্ঞানের অতি সামান্য অংশ গ্রহণ করিয়া, আর সমস্ত অংশ বর্জ্জন করিতেছে কেন ? বোধ হয় এই সমস্ত জ্ঞান মনুষ্যের জাতীয়-জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক নহে ; যাহা একান্ত আবশ্যক তাহাই রহিয়া যাইতেছে। এই নিতান্ত আবশ্যকীয় অংশই প্রবৃত্তিরূপে আমরা জন্ম হইতে প্রাপ্ত হই ; এবং আজীবন শ্রম করিয়া ইহাকেই বাড়াইয়া তুলি। যেমন এই অর্জ্জিত জ্ঞান নিতান্তই আমার আমি, তদ্রূপ ইহার সারাংশ—যাহা জাতীয়-জ্ঞানে বা প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়—তাহা নিতান্তই জাতির বিশেষত্ব। জাতি অর্থে এস্থলে সমগ্র মনুষ্যজাতি বুঝিতে হইবে। যেমন এই জ্ঞানের অভাবে আমার অহমত্ব থাকে না, তেমনি এই প্রবৃত্তির অভাবে জাতির জাতীয়ত্ব থাকেনা। প্রকৃতির সহিত সহবাস হইতে জীব যাহা কিছু শিক্ষা করে, এস্থলে তাহাকেই জ্ঞান বলা যাইতেছে ; একের জ্ঞানের উদাহরণ হইতে জাতীয় জ্ঞানতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

আর একটা রহস্য দেখা যাউক। এই যে আমার অর্জ্জিত জ্ঞান,

ইহার সমস্তটাই অহমত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় নহে; কতকগুলি কম আবশ্যক, কতকগুলি বেশী আবশ্যক। জাতীয়জ্ঞান বা প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও তাহাই; কতক বা বিশেষ আবশ্যক, কতক বা সামান্যই আবশ্যক। যাহা বিশেষ আবশ্যক, স্মরণ রাখিতে হইবে যে তাহার বিলোপে জীবের জীবত্ব থাকে না। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তির যেমন ভ্রমজ্ঞান আছে, জাতিরও তেমনি কুপ্রবৃত্তি আছে।

৭। উহার পরিণতি।

মানুষের মনই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ বস্তু, অতএব এই মন হইতেই অনুসন্ধান আরম্ভ করা যাউক। আমি দেখিতে পাইতেছি, আমার মন প্রথম অবস্থায় ক্ষুদ্র ছিল, পরে ক্রমান্বয়ে বৃহৎ হইয়াছে; পূর্ব্বে সহজ, অবিমিশ্র, একভাবাপন্ন ছিল, ক্রমে বয়োবৃদ্ধি-সহকারে বহুভাবাপন্ন হইয়াছে। মনের পরেই, শরীর আমাদের সন্নিহিত পদার্থ। এই শরীরও সেই কথাই বলিতেছে। ইহারও প্রাথমিক অবস্থা সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত; যত উন্নতির পথে উঠে, ততই জটিল ও বিস্তৃতরূপ ধারণ করে; সর্ব্বপ্রথম অবস্থা যে ক্রিমিরূপ, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রূণের ক্রমোন্নতি, শৈশব, বাল্য ও যৌবনের অবস্থা একত্রে দৃষ্টি করিলে, তাহা সম্যক্ পরিলক্ষিত হইবে। তাহার পর, মন ও দেহ ছাড়াইয়া বাহ্য-জগতে গেলেও ঐ তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। আজি যে মহান মহীরুহ, প্রথম অবস্থায় সে ক্ষুদ্র বীজ মাত্র; আজি যে বহুবিচিত্রতা-বিভূষিত, সৌন্দর্য্যসীমানুস্পর্দ্ধী ময়ূর, প্রথম অবস্থায় সে ডিম্ব মাত্র; এই যে বহুকক্ষপরিপূর্ণ বৃহৎ অট্টালিকা, পূর্ব্ব অবস্থায় ইহা ইষ্টক ও চূর্ণ মাত্র। এই বাহ্যজগতের সূক্ষ্মদৃষ্টি—যাহাকে বিজ্ঞান বলে—সেই দৃষ্টিতে ইহাকে দেখিলে, এই তত্ত্ব এত বেশী স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহা মনের উপর বিশেষ প্রাধান্য স্থাপন করে। বাহ্যবস্তুর আভ্যন্তরীণ নির্ম্মাণ-কৌশল-বিজ্ঞাপক যে বিজ্ঞানাংশ, যাহাকে রসায়নশাস্ত্র বলে, তাহাতে দেখা যায় যে, ৮০টা বিভিন্ন পরমাণুদ্বারা পৃথিবী গঠিত হইয়াছে। রসায়নশাস্ত্রের আরও উন্নতি সহকারে ঐ সংখ্যা কমিয়া যাইবে। এই পৃথিবীর গাত্র বহুবর্ণে চিত্রিত। বর্ণই প্রকৃতির বিচিত্রতার প্রধান কারণ। বিজ্ঞান বলিতেছে,

সমস্ত বর্ণই পদার্থবিশেষের স্পন্দন মাত্র। শুদ্ধ তাহা নহে, আলোক, উত্তাপ, শব্দ, এ সমস্তই পদার্থবিশেষের কম্পন মাত্র। বিজ্ঞানবিদ্ পদে পদে দেখিতে পান, বাহ্যবস্তুতে যে বিচিত্রতা দেখা যায়, তাহার অভ্যন্তরে একতা লুকাইত রহিয়াছে; তাহার গঠনের ভিতরে সমতা রহিয়াছে; আকৃতির ভিতরে সমতা, শক্তিসমূহের ভিতরে সমতা রহিয়াছে। এইরূপ সন্দর্শনের ফল ইহাই হয় যে, যাহার বিজ্ঞানে কথঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, সে বস্তু-মাত্রই আদিতে সমগুণবিশিষ্ট (homogeneous) ছিল এবং উন্নতিসহকারে বিচিত্রতা (heterogeneous) সম্পন্ন হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হয়। সে কল্পনা করিতে বাধ্য হয়, সৃষ্টি আদিতে সমগুণবিশিষ্ট ছিল, উন্নতিসহকারে বহুবিচিত্রতাপূর্ণ রূপ ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে। রসায়ন শাস্ত্রের বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থায় যে ৮০টা বিভিন্ন পরমাণু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ভবিষ্যৎ-অনুসন্ধানের ফলে, এখন যাহাদিগকে বিশ্লেষ করা যাইতেছে না, ভবিষ্যতে আরও উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদির সাহায্যে তাহা করা যাইবে, এইরূপ বিশ্বাসেই তৃপ্তি জন্মে। এখন কথা হইতেছে, বৈজ্ঞানিকের তৃপ্তিতে স্বভাবের কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইল? তাহার তৃপ্তির জন্য স্বভাব কার্য্য করিতেছে, না নিজের তৃপ্তির জন্য কার্য্য করিতেছে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, বৈজ্ঞানিকের এবম্প্রকার মনের অবস্থা কুড়াইয়া পাওয়া যায় নাই বা প্রকৃতি ছাড়া অন্য কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই; ইহা স্বভাবের সহিত বিশেষ সহবাসেরই ফল; ইহা স্বভাবেরই কার্য্য। বিজ্ঞান যদি সত্য হয় তবে মানুষের মনের এই অবস্থাও সত্য।

"বিজ্ঞান যে সত্য তাহার প্রমাণ কি?"

মানুষের মনে জড়জগত সম্বন্ধে সত্য বলিয়া যে সমস্ত ধারণা জন্মিয়াছে তাহাই বিজ্ঞান। যাহা কাল-সহকারে অপ্রমাণ হইয়া যাইতে পারে, বিজ্ঞানের এরূপ কোন সাময়িক তত্ত্বের কথা বলিতেছি না; যাহা কালেরও আয়ুস্পর্দ্ধী সেই সমস্ত মূলসূত্রের কথা বলিতেছি। বস্তুমাত্রেরই প্রথম অবস্থা সমগুণবিশিষ্ট এবং উন্নতি সহকারে বিচিত্রতা সম্পন্ন হয়, বিজ্ঞানের মূলসূত্রসমূহের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়া আমাদের মনোভাব গঠিত

হইয়াছে; ঐ মূলসূত্রসমূহ মিথ্যা না হইলে এই মনোভাব মিথ্যা হইতে পারে না।

"বিজ্ঞানের মূলসূত্র এরূপ হইতে পারে না; পূর্ব্বোক্ত ক্রমবিকাশের অবস্থা সর্ব্বত্র দেখা যায় না। যে মনুষ্য দেহ পচিয়া গলিয়া পঞ্চভূতে মিশিতেছে, তাহার কি বিচিত্রতা বৃদ্ধি হইতেছে? এই পর্য্যসিতঅবস্থা ত এই মানবদেহের পরবর্ত্তী অবস্থা।"

ইহার উত্তরে বলা যায়, দেহ পচিবার আগে গঠিত হওয়া আবশ্যক, অন্যথায় পচিবে কি? ক্রমবিকাশবাদে একথা বলে না যে, প্রত্যেক বস্তুই কালসহকারে উন্নত হইতেছে। বস্তুর ধ্বংস আছে। উন্নতির অবস্থার কথাই বলা হইতেছে, ধ্বংসের কথা বলা হয় নাই। যাহা হউক, উন্নতির অবস্থায় বিচিত্র তার বৃদ্ধি হয়, বিচিত্রতাবৃদ্ধির নামান্তরই উন্নত অবস্থা, এ কথা স্মরণ রাখিলেই সব গোল মিটিয়া যায়।

বিচিত্রতার মধ্যস্থলে একত্ব সন্দর্শনের নামই জ্ঞান। বিচিত্রতার ভিতরে বিচিত্রতাই দেখিলে তাহা জ্ঞান হইল না, দৃষ্টিমাত্র হইল। কারণ, দেখিলাম মাত্র, দেখিয়া জানিলাম কি? তবে বিচিত্রতার ভিতরে আরও বিচিত্রতা দর্শন করিলে তাহা জ্ঞান হইতে পারে কি? দেখা গিয়াছে আমাদের শরীর, মন ও বাহ্যবস্তু, অন্যরূপ সাক্ষ্য দিতেছে; সুতরাং বিচিত্রতার অভ্যন্তরে একতা সন্দর্শনের নামই জ্ঞান। এই জ্ঞানসহায়ে ভ্রমণের অভিমুখই জ্ঞানমার্গ; এই পথ ক্রমবিকাশবাদে পৌঁছিয়াছে। বিজ্ঞানজগতে এই একত্বের নিদর্শন এতই দেখা যাইতেছে যে, কোন দ্রব্য পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত বিচিত্র ছিল পরে সমভাবাপন্ন হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত আদৌ সম্ভবপর নহে। সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে মানুষের মন স্বতই একত্বের দিকে ধাবিত হয়। এখন এই অবস্থায় মন হইয়া সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করা যাউক।

৮। উহার চরমোন্নতি—বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিবাদ।

মনের এই অবস্থা যদি আদৌ সত্য হয় তবে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে জগৎ আদিতে, যতদূর কল্পনা করা যায়, ততদূর সমভাবাপন্ন (homogeneous) ছিল; এমন কি কল্পনার অতীতরূপ একভাবাপন্ন

ছিল। একত্ব দ্বিবিধ: সামষ্টিক (quantitative) এবং গুণাত্মিক (qualitative)। একসংখ্যায় সামষ্টিক একত্বের চরম; শূন্য এক অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে, ইহাতে সংখ্যার অভাব বুঝায়; ক্ষুদ্রত্ব বুঝায় না; অভাব ক্ষুদ্রত্ব নহে। আর গুণাত্মিক একত্বের চরম হইতেছে, যখন বস্তু সম্পূর্ণ সমগুণবিশিষ্ট হয়। এখন, এই যে আদিম সৃষ্ট পদার্থ, তাহা এক এবং সমগুণবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিতে হইবে। এখানে একটি বিশেষ রহস্য আছে, এই পদার্থে গুণাত্মিক এবং সামষ্টিক একত্বের একীকরণসাধন আবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ, তাহা না হইলে, তাহা উভয়রূপ একত্বের বিষয় হয় না। মনে করা যাউক যে, এই আদিম পদার্থ জলযান বায়ুর একটি পরমাণু মাত্র; তাহা হইলে আমাদিগকে আরও মনে করিতে হইবে যে, এই পরমাণুটি আর বিভাজ্য নহে। আমরা এরূপ কোন পদার্থের কল্পনাই করিতে পারি না। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতভেদ দ্রষ্টব্য। ইহার যদি আয়তন থাকে তবে অবশ্যই বিভাগ করা যাইতে পারে; আর যদি আয়তন না থাকে তবে তাহার সত্ত্বাই কল্পনা করা যায় না; কারণ আয়তন-শূন্য কোন পদার্থের কল্পনা করা অসম্ভব। অবশ্য এ স্থলে আধ্যাত্মিক পদার্থের কথা হইতেছে না। সেই আদিম পদার্থ আধ্যাত্মিক কিনা, তাহা পরে দেখা যাইবে। যদি এই পদার্থের আয়তন না থাকে তবে ইহা পদার্থ নহে, সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র হইয়া পড়ে। তাহাই শূন্যবাদ ইত্যাদি। কতকটা এইরূপ মনের পরিচয় সর্ব্ব ধর্ম্মগ্রন্থের ভিতরই পাওয়া যায়। বৌদ্ধের শূন্যবাদ এই সাঙ্কেতিক চিহ্নমাত্র। অতএব জড়ের প্রথম অবস্থা, জ্ঞান ও কল্পনা উভয়েরই বহির্ভূত; তাহার জ্ঞান হইতে পারে না, এমন কি কল্পনাও হইতে পারে না। কাজেই প্রথমাবস্থা ছাড়িয়া দিয়া, বিজ্ঞানকে তাহার পরবর্ত্তী অবস্থা হইতে সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রাথমিক অবস্থায় যে কল্পনার অতীত পদার্থ, তাহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্রজগত কি করিয়া উদ্ভূত হইল, তাহা কল্পনা করা যায় না। অতএব আমরা, আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা বশত, সামষ্টিক একত্বের কল্পনা ত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র গুণাত্মিক একত্বের কল্পনা

করিতে বাধ্য হইতেছি। বলা যাউক যে আদিম সৃষ্ট পদার্থ সংখ্যায় এক ছিল না, বহু ছিল; কিন্তু প্রত্যেক পদার্থই একমাত্র গুণবিশিষ্ট ছিল। এই গুণ কি হইতে পারে? ইহা বর্ণ হইতে পারে না, উত্তাপ হইতে পারে না, ইহা আলোক হইতে পারে না; কারণ, এই সমস্ত গুণ ত পদার্থ বিশেষের স্পন্দন মাত্র! এই সমস্ত না থাকিলেও পদার্থের অস্তিত্বের কল্পনা করা যাইতে পারে। এমন কি গুণ আছে, যাহা ব্যতীত পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না?—তাহা হইতেছে বিস্তৃতি। পদার্থ হইলেই তাহার বিস্তার থাকা চাই; বিস্তার না থাকিলে তাহা পদার্থ নহে। আধ্যাত্মিক পদার্থের কথা হইতেছে না, বৈজ্ঞানিক পদার্থের কথা হইতেছে। এই গুণ না থাকিলে পদার্থকে আমরা জানিতে পারি না। ত্বাচপ্রত্যক্ষই সকল প্রত্যক্ষের মূল; বিস্তার না থাকিলে ত্বাচপ্রত্যক্ষ জন্মায় না; আমাদের মন বা আত্মা বা চেতনার সহিত পদার্থের সংযোগ হয় না। আমাদের কল্পনার অতীত কোন অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই; তাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। আমাদের মনের যে অবস্থার সাহায্যে এই কল্পনা করিতেছি তাহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে; একত্বের দিকে মন যে স্বতঃই ধাবিত হয় এবং ধাবিত হইতে বাধ্য হয়, তজ্জনিত প্রবৃত্তির সাহায্যে এই কল্পনা করা যাইতেছে; ইহাই একত্বপ্রতিপাদিকাবুদ্ধি। ইহার সাহায্যে জগতের আদিম অবস্থা এইরূপ দেখা যাইতেছে: বহু পরমাণু দিঙ্‌মণ্ডলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, ইহারা নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল, কেবলমাত্র সৎ—নিশ্চল, কেন না বিস্তৃতিমাত্র-গুণবিশিষ্ট; গতির পক্ষে যে উপাদান আবশ্যক তাহা নাই। এখন আমরা চক্ষের সমক্ষে যে জগৎ বিস্তারিত দেখিতেছি, তাহা কোথা হইতে আসিল, তাহার সহিত এই কাল্পনিক নিস্তব্ধ জগতের সম্বন্ধ কি, তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব। এই পরমাণুকে দ্বিতীয় গুণবিশিষ্ট না করিলে এই পরিবর্ত্তনশীল জগতকে পাওয়া যায় না। এই দ্বিতীয় গুণ কি হইতে পারে? ইহা আলোক হইতে পারে না, উত্তাপ হইতে পারে না; কারণ আলোক, উত্তাপ, পদার্থ বিশেষের স্পন্দন মাত্র। যাহাতে

স্পন্দন জন্মায়, গতি জন্মায়, ইহা অবশ্য তাহাই হইবে : ইহা গতিশক্তি (Dynamic impulse) : যে শক্তিতে পূর্ব্বের কথিত স্থিতিশীল পরমাণুরাশিকে গতিশীল করিতেছে। ইহাকে বিশুদ্ধ শক্তি বলা যাইতে পারে।

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে এখন আমরা পাইলাম জড় এবং শক্তি। কেহ কেহ এতদুভয়ের মধ্যেও একত্ব সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ; কিন্তু কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলা যায় না। না হইলেও এই চেষ্টা একত্বপ্রতিপাদিকাবুদ্ধির উত্তম দৃষ্টান্ত। কি জন্য কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ দেখা যাউক। জড় ও শক্তির কল্পনার মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে ; প্রথমটির বিস্তৃতি আছে, দ্বিতীয়টির নাই। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বিস্তৃতিবিহীন জড়ের কল্পনা হয় না; আবার ইহাও দেখিতে হইবে যে, বিস্তৃতিসমন্বিত শক্তিরও কল্পনা হয় না ; কারণ বিস্তৃতি থাকিলেই তাহা পদার্থ হইল, বিস্তৃতি থাকিলেই তাহার গুরুত্ব থাকে। এখন আকর্ষণশক্তির গুরুত্ব, আলোকের গুরুত্ব বা উত্তাপের গুরুত্ব কোথাও পাওয়া যায় না। এক battery'র বিদ্যুৎশূন্য অবস্থায় যে গুরুত্ব থাকে, বিদ্যুৎপূর্ণ অবস্থায়ও তাহাই থাকে ; অথচ আকর্ষণীশক্তি, আলোক, উত্তাপ, বিদ্যুৎ, ইহারা সকলেই শক্তিবিশেষ ; অতএব শক্তির বিস্তৃতি বা গুরুত্ব থাকিতে পারে না। যদি তাহাই না থাকে, তবে শক্তি হইতে জড়ের উৎপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, যাহার আদৌ বিস্তৃতি ও গুরুত্ব নাই, তাহার অনন্তসংখ্যকসমবায়েরও বিস্তৃতি ও গুরুত্ব হইবে না। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জড়ের সহযোগে ভিন্ন, শক্তির স্বাধীন বিকাশ আমরা জগতে দেখিতে পাই না। শক্তি হইতে জড় যখন হইতে পারে না, তখন জড় হইতে শক্তির উৎপত্তি হইতে পারে কিনা দেখা যাউক। আমরা জড়ে শক্তিসমাবেশের বিভিন্নতা দেখিতে পাই। মনে করা যাউক ক, খ, গ, তিনটি শক্তিসম্পন্ন পরমাণু রহিয়াছে। ইহাদের শক্তি প্রত্যেকের সঙ্গে অচ্ছেদ্যসম্বন্ধবদ্ধ নহে ; যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পরমাণুত্রয় চিরন্তন একইরূপ শক্তিবিশিষ্ট হইবে, বিচিত্রতার স্থান থাকিবে না; বহুবিচিত্রতাবিশিষ্ট জগতের উদ্ভব হইবে না। এই

শক্তি 'ক'য়ে যে পরিমাণে আছে তাহা কমিয়া গিয়া 'খ'য়ে বর্ত্তাইতে দেখা যায়। এমনও মনে করা যাইতে পারে, 'ক' হইতে ক্রমশ 'খ'য়ে যাইতে যাইতে, 'ক' হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া 'খ'য়ে সমস্ত শক্তি বর্ত্তায়; তাহা হইলে শক্তির স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করা হইল।

জড় ও শক্তিকে আমরা পাইলাম। আরও একটা বিষয়ের আবশ্যক—জড়ে কি ভাবে শক্তি সঞ্চারিত হইল। সেই একত্ব-প্রতিপাদিকাবুদ্ধি বলিবে—একই ভাবে; অর্থাৎ সমভাবে এবং একই দিকে। তাহা হইলে আবার বিচিত্রতার উদ্ভব হয় না, জগত যেমন ছিল তেমনই থাকিয়া যায়; কাজেই বলিতে হইবে, বহুদিক্ হইতে বিভিন্ন-মুখগামী শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহাদের সমবায়ফল চক্রাকার (Resultant is rotatory)। এই তিন বিষয় স্বীকার করিয়া লইলে আর চতুর্থ কোন বিষয় স্বীকার না করিয়াও সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ব্যাপার কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। অবশ্য বিজ্ঞান এই তিন বিষয় হইতে সমস্ত সৃষ্টির ধারাবাহিক ইতিহাস বাহির করিতে পারে নাই, কোন কালে পারিবেও না। সেই আদিম পরমাণুকে 'ক' বলা যাউক। সেই আদিম শক্তি এই 'ক'য়ের উপর বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্নভাবে পতিত হইয়া বিভিন্নরূপ সমষ্টি, দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু ইত্যাদি সৃষ্টি করিতে লাগিল, যথা—

কক	ক ক	কক ক	কক ক	ক কক	ককক	ক ক ক	ইত্যাদি।

ইহার প্রথমটিকে অম্লযান, দ্বিতীয়টিকে জলযান ইত্যাদি বলা যাউক। অবশ্য ইহারা অম্লযান ইত্যাদি, বর্ত্তমান রাসায়নিক সমষ্টির (molecule) কোনটা না হইয়া, বহু আদিম রাসায়নিক সমষ্টি হইবে। তাহার সহিত আর বর্ত্তমান আকারের কোন অণুর সহিত হয়ত আদৌ সাদৃশ্য নাই; বর্ত্তমানে যে সমস্ত সমষ্টি দেখা যায়, তাহারা সেই আদিম রাসায়নিক সমষ্টি-সমূহ হইতে হয়ত অনেক উন্নত (highly evolved)। স্মরণ রাখিতে হইবে, বর্ত্তমান সময়ের এক একটা অণু (molecule) দুই, তিন, বা দশ পরমাণুর সমষ্টি নহে, অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি। এক একটা অণু, এক একটা ক্ষুদ্র জগৎ। জড়জগতের গঠনপ্রণালী একরূপ পাওয়া গেল; এখন

জিজ্ঞাস্ত এই, সেই আদিম-শক্তি হইতে অনুভবনীয় বিভিন্ন প্রকারের শক্তি সমূহের উৎপত্তির কল্পনা করিতে পারা যায় কি? শব্দ, উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, সবই সেই আদিম-শক্তির বিভিন্ন রূপ কি করিয়া হইতে পারে? ইতিপূর্ব্বে পরমাণুর বিভিন্নরূপ সমাবেশ যেরূপ কল্পনা করা গিয়াছে, শক্তির বিভিন্নরূপ সমাবেশ কি করিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে? দুইরূপে হইতে পারে। শক্তিস্রোতের প্রবলতার তারতম্যে ও বিভিন্নদিক হইতে চালিত হইয়া বিভিন্নমুখী স্রোতের সংঘর্ষণফলের তারতম্যে। অণুর অন্তর্নিহিত তেজ, বিভিন্ন দিক হইতে চালিত বিভিন্ন পদার্থের তেজরাশির সহিত সংঘর্ষিত হইয়া যে বিভিন্ন প্রকারের জটিল মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, তাহাকেই আমরা আলোকাদিরূপে অনুভব করি। রসায়ন যেমন পূর্ব্বোক্ত জড়ের গঠনের কতকটা রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, শক্তি-বিজ্ঞান (physics) ও শক্তি সম্বন্ধে ঐরূপ প্রমাণ দিতেছে। শব্দ, উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ সমস্তই পদার্থবিশেষের স্পন্দনমাত্র।

ভাষা অনেক সময়ে আমাদের জ্ঞানের অস্ফুট অংশ প্রকাশ করিয়া থাকে। দেখা যাউক ভাষা হইতে সেই আদিমশক্তির কি প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা বিদ্যুতের শক্তি বলিয়া থাকি, আলোকের, উত্তাপের শক্তি বলিয়া থাকি; পক্ষান্তরে আকর্ষণীশক্তির আলোক, শব্দের আলোক বলিতে পারি না। ইহাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, যে শক্তি বস্তুকে গতিশীল করে তাহাই আলোক, বিদ্যুৎ, উত্তাপ ইত্যাদি শক্তি সমূহের উপাদান; তাহাই মৌলিক শক্তি; আলোক ইত্যাদি ইহার স্থল অধিকার করিতে পারে না। এখন জীবনীশক্তিও এই শক্তির রূপান্তর মাত্র কল্পনা করিলে কল্পনার চরমসীমায় উপনীত হওয়া যায়। ইহাই লইল বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিবাদ।

৯। এই সৃষ্টি বাদের আবশ্যকতা। অন্যথায় স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সম্যক্ একত্ব স্থাপিত হয় না—সৃষ্টিবাদ জ্ঞানাধিগম্য হয় না।

অনেকেই বলিবেন; এইরূপ কল্পনা করিয়া কি হইবে? এরূপ সামান্য প্রমাণের ভিত্তির উপর এইরূপ বৃহৎ কাল্পনিক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া কি ফললাভ হইবে। বাস্তবিকই মানুষের প্রবৃত্তি

যদি একত্বের দিকে যাইবেই, তবে ঈশ্বরে সেই একত্ব সংস্থাপন করা হয় না কেন? যাঁহা হইতে উৎপত্তি স্থিতিলয় সাধিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, এই প্রবৃত্তি আমাদিগকে তাঁহারই পদ প্রান্তে লইয়া গেলেই ত ভাল হয়! বেদান্ত ত তাহাই! ঋষি মনীষিগণ এ প্রবৃত্তিসহায়ে ত সেইখানেই পৌঁছিয়াছেন! যেখানে মনের শান্তি, হৃদয়ের তৃপ্তি, বাসনার সার্থকতা, সেই ভগবদ্পাদপদ্মের দিকে না যাইয়া অন্যদিকে যাই কেন? কারণ আছে; ভগবদিচ্ছা অন্যরূপ বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে; বেদান্তোক্ত পথ তাঁহার চরণের দিকে গিয়াছে কি না, তাহা সন্দেহ করিবার কারণ আছে; ভিন্নপথানুসন্ধিৎসু মানবমন যে পথান্তরে যাইতে চাহে, তাহাও তাঁহারই লীলামাত্র মনে করিবার কারণ আছে।

প্রথম কারণ—ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ একত্বসম্পাদনমূলক। একত্ব-প্রতিপাদিকা বুদ্ধির চরম তৃপ্তি কিসে হয়?—যখন সৃষ্টি এবং স্রষ্টা উভয়ের ভিতর সম্যক্ একত্ব স্থাপিত হয়; সৃষ্টির ভিতর একত্ব, স্রষ্টার ভিতর একত্ব এবং উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধের ভিতর একত্ব। সৃষ্টির একত্ব সৃষ্টির অভ্যন্তরেই স্থাপিত করিতে হইবে, তাহার জন্য স্রষ্টাকে টানিয়া আনিলে আর তাহা করা হইল না; সৃষ্টির ভিতরে একত্ব সংস্থাপনের অভাব রহিয়া গেল। অগ্রে সৃষ্টির ভিতরে যথাসম্ভব একত্ব সংস্থাপন করিয়া পশ্চাৎ স্রষ্টায় পৌঁছিতে হইবে। কার্য্যকারণসম্বন্ধ সৃষ্টির মধ্যেই সংস্থাপন না করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে টানিয়া আনিলে, বহুলকর্ত্তৃত্ব দোষ হইয়া পড়ে। অশিক্ষিত অবস্থায় মানুষ সর্ব্বদাই তাহা করে; শিক্ষার বিস্তারের সহিত এই দোষ ক্রমেই তিরোহিত হইতেছে। ইহা সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিতে হইলে, সৃষ্টির সমস্ত কার্য্যের কারণ তাহারই মধ্যে রহিয়াছে মনে করিতে হইবে; তাহার কতক ব্যক্ত, কতক বা এখনও অব্যক্ত। যেখানে অব্যক্ত সেখানে ঈশ্বরকে টানিয়া আনিয়া কোনই ফল নাই; ইহাতে কার্য্যকারণসম্বন্ধে অজ্ঞতা মাত্র প্রকাশিত হয়, ঐ সম্বন্ধ স্থাপন করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উদাহরণ স্তূপীকৃত না করিয়া, ভূকম্পগ্রহণাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, নৈসর্গিক ঘটনার সহিত অনৈসর্গিক কর্ত্তার কার্য্যকারণসম্বন্ধ স্থাপন যেরূপ পণ্ড হইয়াছে, তাহার উল্লেখ

করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। বাস্তবিকই এরূপ চেষ্টা ন্যায়বিরুদ্ধ। যখনই নৈসর্গিক কোন ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা হইতেছে, তখনই নৈসর্গিক কারণই মন চাহিতেছে; অনৈসর্গিক কারণ নির্দ্দেশ করা, মনকে প্রতারণা করা মাত্র। স্রষ্টার এই সৃষ্টি স্বাবলম্বিত (self-contained) মনে না করিলে মনের তৃপ্তি হইতে পারে না, এই হইল সৃষ্টপদার্থের একত্ব সম্বন্ধে কথা; এই একত্বের যে পরিমাণে অপলাপ করা যাইবে তৎপ্রতিপাদিকাবুদ্ধির ততই তৃপ্তির অভাব থাকিয়া যাইবে। এখন ধর্ম্মবুদ্ধির একত্ব কাহাকে বলে?—সৃষ্টি একই সময়ে স্রষ্টার একই উদ্যমের বলে হইয়াছে, বিভিন্ন সময়ে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা হয় নাই; তাহা হইলে আর একত্ব থাকে না। স্রষ্টা ও সৃষ্টির একত্ব সম্বন্ধে আর বিশেষ বলা নিষ্প্রয়োজন। একত্বপ্রতিপাদিকাবুদ্ধির যদি কোন মূল্য থাকে, তবে ঈশ্বর আদিকারণ মাত্র। এইরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কল্পনা না করিলে আর একটি মহৎ অনিষ্ট সংঘটন হয় এবং হইয়া আসিতেছে: বিজ্ঞানবুদ্ধি ও ধর্ম্মবুদ্ধির মধ্যে সমন্বয় সংস্থাপিত হয় না, বিরোধ উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয় কারণ—স্রষ্টাতে অসম্পূর্ণতা আরোপজনিত। ভগবান সৃষ্টি করিলেন, সংসার কিছুদিন বেশ চলিতে লাগিল। কালসহকারে কিন্তু দুষ্কৃত, অধার্ম্মিকের উৎপাৎ বাড়িয়া উঠিল; আর চলে না এরূপ হইয়া পড়িল। দুষ্কৃত শব্দের অর্থের অযথেষ্ট ব্যাপ্তিযোগ করিয়া অণু, পরমাণু ত্রসরেণুর মধ্যেও তাহাদের অস্তিত্বের কল্পনা করা যাউক। তখন কি হইল?—ভগবানকে পুনঃ পুনঃ সম্ভূত হইতে হইল। ইহাই কি ভগবান? ইহাই কি তাঁহার মাহাত্ম্য? ইহাই তদ্দর্শন? এই বিপত্তি তাহা হইলে কে ঘটায়?—সে যে ভগবানের ভগবান। আর এক বিপত্তি। প্রথম সৃষ্টি তাহা হইলে নিতান্তই অসম্পূর্ণ, অস্বাবলম্বিত রকমের হইয়াছিল, নচেৎ তাহাতে পুনঃ পুনঃ হস্তক্ষেপের আবশ্যক হইবে কেন? জগৎকে একটা বৃহৎ যন্ত্র বলিয়া মনে করা যাউক। দেখা যাইতেছে, ইহার নির্ম্মাতা বিশেষ কৌশলী নহেন; এ যন্ত্র প্রায়ই বিগড়াইয়া যায়। কোন্ যন্ত্র উত্তম? যে বিগড়ায় না, যাহা আপনা হইতে চলে, যাহাতে সর্ব্বদা হস্তক্ষেপ

করিতে হয় না। কোন্ যন্ত্র আদর্শস্থানীয়? যাহাতে একবারই হস্তক্ষেপ করিতে হয়, যাহা একবার চালাইয়া দিলেই চলিয়া যায়, দ্বিতীয়বার কুঞ্জিকা সংযোগ করিতে হয় না। এখন ভগবান কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কারিকর যে, তাঁহার যন্ত্র চলিতে চলিতে থামিয়া যায়?

"তিনি প্রথম শ্রেণীর কারিকর বটে; শক্তি থাকিতেও তিনি যে অসম্পূর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা তাঁহার লীলাখেলা, বিভূতি, ইচ্ছা ইত্যাদি।"

কে বলিল তাঁহার সৃষ্টি অসম্পূর্ণ? তাহা না বলিয়া, তোমার এই সৃষ্টির জ্ঞান অসম্পূর্ণ কিনা তাহার সন্ধান করিয়াছ কি? ঐ জ্ঞান যখন আরও অসম্পূর্ণ ছিল তখন সৃষ্টির অস্বাবলম্বনত্ব ত আরও ছিল; পদে পদে তাহা চালাইয়া লইতে হইত। জ্ঞানের বৃদ্ধিসহকারে ঐ অসম্পূর্ণতা ত ক্রমেই কমিতেছে। এখানে শিথাবিলম্বি পূর্ব্বসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া, অসম্পূর্ণতা ভগবানে আরোপ না করিয়া, নিজের বুদ্ধির দোষ বলিলে কি বিশেষ কুকার্য্য হয়? লীলাখেলা না বলিয়া আর একশ্রেণীর লোক বলিবেন—

"ঈশ্বরেচ্ছা; কেন এরূপ হয় তাহা অজ্ঞেয়"।

বাস্তবিক বলিতে গেলে সংসারে অনেক বিষয়ই অজ্ঞেয় আছে, অনেক বিষয় হয় ত অজ্ঞেয়ই থাকিয়া যাইবে, কিন্তু কার্য্যকারণ সম্বন্ধ লইয়া কথা হইতেছে; যাহা পূর্ব্বে অজ্ঞেয় ছিল তাহা জ্ঞেয় হইয়া আসিতেছে, অনেক স্থলে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞেয় না হইলেও আংশিক ভাবে জ্ঞেয় হইয়াছে। সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, যে স্থলে জ্ঞান সম্ভব সে স্থলে অজ্ঞেয়বাদ লইয়া বসিয়া থাকা, মনের উচ্চ অবস্থা নহে, কুসংস্কারের অবস্থা মাত্র। ভয় কি? জ্ঞানের সীমান্ত প্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে গেলে ভগবান রুষ্ট হইবেন বলিয়া সন্দেহ হয় কি? সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ (explore) না করিলে জ্ঞানের রাজ্য বাড়িবে কেন?

ইহার তৃতীয় কারণ—সৃষ্টিতত্ত্বমূলক, অর্থাৎ এরূপ মনে না করিলে সৃষ্টিতত্ত্ব বোধগম্য হয় না। স্রষ্টার কল্পনা করিতে হইলে তৎসহিত সৃষ্টির কল্পনা করিতে হয়। আরও একটা কল্পনা করিতে হয়—সৃষ্টির প্রারম্ভ। সৃষ্টি অনাদি নহে, কোন্ সময়ে উদগত হইয়াছে; কোন্ সময়ে সৃষ্টি ছিল

না, কেবল স্রষ্টামাত্র বিদ্যমান ছিলেন। যদি বলা যায় সৃষ্টি অনাদি, অনাদিকালেই স্রষ্টা সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহা হইলে বলামাত্র হইল, শব্দ প্রয়োগ হইল, কিন্তু ঐ শব্দের অনুরূপ কোন মনের অবস্থা গঠিত হইল না। অনাদি কাল কি তাহাই মন গ্রহণ করিতে পারে না, আবার অনাদি কালে সৃষ্টি হইল ইহার কি অর্থ হয়? সৃষ্টি যদি অনাদি হয়, স্রষ্টাও যদি তাহাই হয়েন; তবে ত উভয়ে তুল্যায়ুবিশিষ্ট, সমসাময়িক পদার্থ হইলেন। স্রষ্টা, সৃষ্টি, বলিলেই পৌর্ব্বাপর্য্য বুঝায়; তাহা অপলাপ করিতে গেলে মনকে প্রতারণা করা ভিন্ন আর কিছুই হয় না। প্রথমে স্রষ্টামাত্র বিদ্যমান ছিলেন, পরে সৃষ্টি করিলেন, ইহাই একমাত্র জ্ঞানাদিগম্য সৃষ্টিতত্ত্ব; তত্ত্বান্তর সৃষ্টি করিলে তাহার কোনরূপ অর্থ হয় না।

দার্শনিকগণ অনেকস্থলে বিভিন্নশব্দের যে একত্র সমাবেশ করেন, তাহাতে শব্দ সমাবেশই হয়, অর্থ সমাবেশ হয় না। ভাষা হইতে বিভিন্ন শব্দ সংগ্রহ করিয়া যত সহজে একত্রে প্রয়োগ করা যায়, তত সহজে তাহার অর্থ হয় না। যাহাদের চিন্তাশক্তি বিশেষরূপ মার্জ্জিত নহে, তাহারা দুর্জ্জেয়, বিরলপ্রচলিত, শব্দসমষ্টি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে; অর্থ করিতে চেষ্টা করে না, সাধ্যেও কুলায় না। ভাষা মনের ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র, ইহার স্বাধীনতা নাই। যে ভাষার অনুরূপ মনোভাব নাই, তাহা ভাষা নহে, শব্দ মাত্র, যথা—মেঘ গর্জ্জন, বায়ুর হুঙ্কার। ভেকের গর্জ্জন কিন্তু ভাষা; অতএব বলা যাইতে পারে, অর্থহীন শব্দসমাবেশ যে করে এবং যে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া সন্তুষ্ট থাকে, তাহারা ভেকের কিঞ্চিন্নিম্নস্তরবর্ত্তী জীব।

সৃষ্টি অনাদি নহে, আদিতে কেবলমাত্র ঈশ্বর বর্ত্তমান ছিলেন। এই সৃষ্টিতত্ত্ব গঠিত করিতে, দেশকাল নির্ব্বিশেষে, কি দার্শনিক, কি ধর্ম্মযাজক, কি পুরাণকার, সকলে প্রথমেই এক বিষম গোলে পড়িয়াছেন।—ঈক্ষণ কোথা হইতে আসিল? সৃষ্টিকর্ত্তা এতদিন সৃষ্টি না করিয়া যদি থাকিতে পারিয়াছিলেন, এখন পারিলেন না কেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর এ পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারেন নাই এবং কোন কালেই দিতে পারিবেন না। ঈশ্বরকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রথমে ব্রতী করাইতেই এই গোল, এখন পুনঃ পুনঃ যদি

সৃষ্টিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, তাহা হইলে হস্তক্ষেপ কার্য্যের সমানুপাতিকে এই গোল বাড়িয়া উঠিবে। একবারই কেন সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তাহারই কারণ খুঁজিয়া পাই না, আবার পুনঃ পুনঃ এ কারণ কোথায় পাইব?

"ঈক্ষণের হেতু, প্রথমসৃষ্টিকার্য্যের সময় থাক আর নাই থাক, পরবর্ত্তী সময়ে রহিয়াছে। সাধুকে পরিত্রাণ, ধর্ম্মসংস্থাপন।"

এই শ্রেণীর আপত্তির প্রতিষেধ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। ইহাদের নিজ হইতে ভাবিবার, নিজ হইতে কোন আপত্তি মীমাংসা করিবার ক্ষমতা নাই; সংস্কার বশত, আপত্তি মনের ভিতরে জাগিয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ সেই আপত্তিদ্বারা পূর্ব্বসংস্কারের পরিপুষ্টিসাধন করিয়া বিশেষ চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করে; ইহাদের এক আপত্তির খণ্ডন করিতে না করিতে শতশত আপত্তি জাগিয়া উঠে, কারণ জ্ঞান ইহাদের লক্ষ্য নহে, সংস্কার পরিপোষণই লক্ষ্য; জ্ঞানে ইহাদের চিত্তের তৃপ্তি হয় না, পূর্ব্বসংস্কারের পঙ্ক মধ্যে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত থাকাতেই ইহাদের চরমতৃপ্তি। উপরুক্ত প্রবৃত্তিগুলি মনুষ্যের পক্ষে কার্য্যে প্রবর্ত্তক বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষেও যে তদ্রূপ তাহার প্রমাণ কোথায় পাওয়া গেল? ঈশ্বরে আদৌ প্রবৃত্তির আরোপ কি করিয়া হইতে পারে? প্রবৃত্তি, ঈক্ষণ ইত্যাদি বলিলে কি বুঝায় তাহা কি ইহারা ভাবিয়া দেখিয়াছে? সংক্ষেপে বলিতে গেলে আত্মার (self) উপর বাহ্যজগতের ক্রিয়ানিপতিত না হইলে প্রবৃত্ত্যাদি উদ্ভূত হয় না। এখন ঈশ্বরে বাহ্যজগৎ ক্রিয়মান হইতে পারে না, কারণ আত্মা এবং বাহ্যজগৎ যেমন পরস্পর স্বাধীন ভাবে অবস্থিত, ঈশ্বর হইতে জগতের সেরূপ স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব নাই; যদি থাকে, তবে জগৎ, ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বাধীন না হইয়া, স্বয়ং কর্ত্তাস্বরূপ হয়। তাহা হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব লোপ হয়; জগৎ যদি স্বয়ং কর্ত্তা হইতে পারে, তবে স্বয়ম্ভুই বা হইতে পারিবে না কেন? জগৎ যদি ঈশ্বরে ঈক্ষণের কারণ না হয়, তবে ঈশ্বরই ঈশ্বরে ঈক্ষণের কারণ বলিলে যে সাংঘাতিক দোষ হয়, তাহা নৈয়ায়িক মাত্রেই অবগত আছেন, তাহার আর বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না।

বহুসৃষ্টিবাদের (Plurality of creative action) আর একটা কুফল দেখা যাউক। এই যে মনুষ্যজাতির অধ্যুসিত পৃথিবী, ঈশ্বর ইহাতে একবার মাত্র হস্তক্ষেপ করিলেই কি বিপত্তি উপস্থিত হয়, দেখা যাউক। এই ভূমণ্ডল ছাড়াও অন্যান্য মণ্ডল রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা কত? চর্ম্মচক্ষেই সহস্র সহস্র দেখা যায়, দূরবীক্ষণ সাহায্যে লক্ষ লক্ষ দেখা যায়; ইহাদের সংখ্যার কি সীমা আছে? আবার লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র, পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণ বৃহৎ। ইহার একটাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে সকলটাতেই এক আধ বার হস্তক্ষেপ করিতে হয়। যদি ইহারা অনন্তসংখ্যক হয়, তাহা হইলে কি হইল?—না, ভগবানকে অহঃরহঃ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সৃষ্টিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে, তাঁহার নিশ্বাস ফেলিবারও সময় নাই। পৃথিবীকে না ধরিয়া সৌরজগতেও যদি একবার হস্তক্ষেপ ধরা যায়, তাহা হইলেও এই বিপত্তির উদ্ভব হয়; কারণ, সৌরজগতও অসংখ্য। জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সংখ্যা নির্দ্দেশ মানুষের মনের গঠনের উপযোগী নহে, ইহা অসংখ্য বা অচিন্তনীয় সংখ্যক, ইহাই অনুকূল কল্পনা। একত্বপ্রতিপাদিকবুদ্ধিতত্ত্ব সংস্থাপন করিতে যে পরিমাণ প্রমাণ যোজনা করা গিয়াছে, অসংখ্যাত্মিকা বুদ্ধি সম্বন্ধেও তাহা করা যাইতে পারে; এ স্থলে তাহা হইতে ক্ষান্ত থাকা গেল। এখন ফলে এই দাঁড়াইল যে, বহুলসৃষ্টিবাদের কল্পনা করিলে সৃষ্টিকর্ত্তার ঈক্ষণমূলক যে অন্তরায়, তাহা অসংখ্যগুণ বৃদ্ধি করা হয়। এই জন্যই বর্ত্তমানে মানুষের মন এই বাদ গ্রহণ করিতে বিরত হইয়াছে। যে সময় মানুষের জ্ঞান পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া বেশীদূর যাইতে পারে নাই, জগতের বহুবিস্তার ভাল করিয়া কল্পনা করিতে পারে নাই, বহুলসৃষ্টিবাদ তৎকালের উপযোগী ছিল; বর্ত্তমানে তাহা নিতান্তই অসঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে।

"ঈশ্বরের কার্য্য বাড়িলই বা তাহাতে ক্ষতি কি? এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কার্য্য মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য হইলেও ঈশ্বরের নিকট ক্রীড়ামাত্র।"

তাহা নিশ্চয়। তবে গোল হইতেছে: ঈশ্বর দ্বারা ঈশ্বরদর্শন করিতে

পারি না, মনের দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে হয়। বহুলসৃষ্টিবাদে ঈশ্বরের কার্য্য বাড়িল বলিয়া ভীত হইতেছি না, মনের কার্য্য যে অসঙ্গতরূপ বাড়িয়া যায়!

"যে সৃষ্টিতত্ত্বের অবতারণা করিলে, তাহা ত প্রথম হইতেই পদে পদে অজ্ঞেয়। বাজে কল্পনা না করিয়া তাহা স্বীকার করিয়া নিরস্ত থাকিলে ভাল হয় না কি?"

সৃষ্টির আদি অবস্থা, সৃষ্ট পদার্থের স্বরূপ অবস্থা (noumena) অবশ্যই অজ্ঞেয়; কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী অবস্থা অজ্ঞেয় বলা যায় না; বহুল পরিমাণে জ্ঞেয়। সেই আদিম অবস্থার অজ্ঞেয়ত্ব টানিয়া আনিয়া পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তনের অবস্থাতে আরোপ করা যুক্তি সঙ্গত নহে; তাহা আংশিক অজ্ঞাত হইতে পারে, অজ্ঞেয় নহে। এই পরিবর্ত্তনের অবস্থা জানিবার চেষ্টাই ক্রমবিকাশবাদ। জ্ঞানের রাজ্য বৃদ্ধি করিবার প্রবৃত্তিই স্বাভাবিক, তাহাকে অযথা সীমাবদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট থাকা স্বাভাবিক নহে।

১০। জগতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নূতন পদার্থ সৃষ্টি, নূতন শক্তির সৃষ্টি বা পদার্থ ও শক্তির নৈসর্গিক সমাবেশ ভিন্ন নূতনতর সমাবেশ, দৃষ্ট হয় না।

এখন আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দ্বারা, জগতে ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করিতেছেন কি না তাহা সূক্ষ্মভাবে দেখিতে চেষ্টা করিব। আমরা দেখিয়াছি জগতে দ্বিবিধ সত্ত্বা আছে—পদার্থ এবং শক্তি, এতদ্ভিন্ন পদার্থে শক্তির বিভিন্নরূপ সমাবেশ আছে। প্রথমে দেখা যাউক পদার্থ বা শক্তির নূতন সৃষ্টি বা ধ্বংস হইয়াছে কি না, পরে ইহাদের নৈসর্গিক সমাবেশ ভিন্ন অনৈসর্গিক সমাবেশ হইয়াছে কি না দেখিতে হইবে।

প্রথমে জ্যোতিষিক দৃষ্টিতে দেখা যাউক। আমাদের এই পৃথিবী ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে বিজ্ঞান কিছুদিন হইতে ওজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ওজনে গুরুত্বের তারতম্য পাওয়া যায় নাই; তাহা হইলে বলিতে হইবে, যতদিন হইতে এই পরিমাণ কার্য্য চলিতেছে ততদিন মধ্যে নূতন সৃষ্ট পদার্থ ইহার কোনটাতে সংযুক্ত হয় নাই। ভগবান নূতন পদার্থ সৃষ্টি করিয়া কোন জ্যোতিষ্কের উপর বর্ষণ করিবেন, বৈজ্ঞানিকের মন এরূপ কল্পনাই করিতে পারে না;

যদি কোন জ্যোতিষ্কের গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়, তবে অতিরিক্ত পদার্থ অন্য জ্যোতিষ্ক হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে এইরূপই অনুমান করিতে বাধ্য হয়। বিজ্ঞান কিরূপে মানুষের মনে একত্বপ্রতিপাদিকাবুদ্ধি ও ক্রমবিকাশ-বাদের সৃজন করিয়াছে, এই উদাহরণ হইতে তাহা বেশ দেখা যাইতেছে। অবশ্য এই পরিমাণকার্য্য এত অল্প দিন ধরিয়া হইতেছে যে, ইহার বলে কোন যে নূতনসৃষ্ট পদার্থ বর্ষিত হয় নাই, এরূপ প্রমাণ হইতেছে না; কিন্তু হইয়াছে যে, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? অপর পক্ষে বরং কিছু প্রমাণ আছে, কিন্তু এই পক্ষে আদৌ প্রমাণাভাব। তবে যে শ্রেণীবিশেষের মনে নূতন সৃষ্টির কথা উদয় হয়, তাহা পূর্ব্বসংস্কার-বশত; পূর্ব্বসংস্কার প্রমাণ নহে। আর একটা বিষয় বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষিত মানুষের মন, নূতন পদার্থ বর্ষণ হইতে পারে এরূপ কল্পনার উপযোগী নহে; ক্রমবিকাশবাদের ইহাই বিশেষ প্রমাণ। কেন উপযোগী নহে, তাহা কতকটা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, আর কতকটা পরে দেখান যাইবে। আমরা দেখিয়াছি, জ্যোতিষ্কমণ্ডলে কোন নূতন পদার্থ সৃষ্ট হয় নাই। কোন পদার্থের ধ্বংস সাধনও হয় নাই। এরূপ তত্ত্ব অবধারণ করিবার আরও এক কারণ আছে: পূর্ব্বে অনন্তমুখী প্রবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে; তাহাতে বলিতেছে, এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সীমা থাকা কল্পনা করা যায় না; যদি তাহারা সংখ্যায় অসীম হয়, তবে অসীম পদার্থ ত পূর্ব্বেই সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে, পুনরায় নূতন পদার্থের স্থান বা আবশ্যকতা কোথায়?—থাকিলে আর পদার্থ অসীম হয় না; নূতনসৃষ্ট পদার্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

এখন জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে নামিয়া আসিয়া, ভূমণ্ডলে কোন নূতন পদার্থ সৃষ্ট বা ধ্বংস হইতেছে কি না দেখা যাউক। ধ্বংসের বিষয়ই অগ্রে আলোচ্য। অগ্ন্যুরিস্থপাত্রমধ্যেরক্ষিত জলরাশি ধ্বংস হয় না, চিতাগ্নিভস্মীভূত শবদেহ ধ্বংস হয় না, প্রজ্জলিত বিস্ফোরকস্তূপ ধ্বংস হয় না; তবে ধ্বংস কোথায়? অপর পক্ষে, ক্ষুদ্র বীজ হইতে যে বৃহৎ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, সে তাহার উপাদান, পৃথিবী এবং বায়ু হইতেই সংগ্রহ করিয়াছে। যে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী বৃহৎ স্রোতস্বতীতে পরিণত হইয়াছে, সে যেমন বহু নদনদী হইতে

নিজের কলেবর বিস্তার করিয়াছে, ক্ষুদ্র শিশুও তদ্রূপ নৈসর্গিক উপাদানের দ্বারাই নিজের শরীরের বৃদ্ধিসাধন করিয়াছে; নূতন সৃষ্টি কোথায়?

শক্তি যে নূতন করিয়া সৃষ্টি হইতেছে না এবং জড় ও শক্তির স্বাভাবিক সমাবেশ ভিন্ন কোন নূতনতর সমাবেশ হইতেছে না, ইহাই বিজ্ঞান পদে পদে সপ্রমাণ করিতেছে। বস্তুবিশেষে তেজ সঞ্চার করিতে হইলে বস্ত্বন্তর হইতে তাহা গ্রহণ করিতে হয়, স্বতঃ উদ্ভূত হয় না; আবার যাহা সঞ্চারিত হয় তাহার পরিমাণ, পূর্ব্ব পদার্থ হইতে যাহা ক্ষয় হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ অনুরূপ—কদাচ ব্যতিক্রম হয় না।

শ্রেণীবিশেষ নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে ব্যতিক্রম দেখিয়া থাকেন:— স্বয়ং ঈশ্বর, ভূত প্রেত ব্রহ্মা বিষ্ণু, অদৃষ্ট, কাল বা সময়, যোগবল, মনি মন্ত্র ঔষধি। ইহাদের বিষয় ক্রমশ বিচার করা যাইবে; বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের এই যে প্রমাণ, ইহা কিরূপে একত্বপ্রতিপাদিকাবুদ্ধি ও ক্রমবিকাশবাদের উৎপত্তি করিয়াছে, তাহা বেশ দেখা যাইতেছে। পদার্থ কোথাও ধ্বংস হইতেছে না, পদার্থ পদার্থান্তর হইতেই আসিতেছে, শক্তি শক্তি হইতেই সঞ্চারিত হইতেছে, এই তত্ত্ব বিজ্ঞান যতদিন বিশদভাবে না দেখাইতে পারিয়াছে ততদিন ক্রমবিকাশবাদ উত্থিত হয় নাই, হইতেও পারে না; নদনদী পর্ব্বতসমুদ্র কি করিয়া স্বাভাবিক নিয়মের বলে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বিজ্ঞান যতদিন দেখাইতে না পারিয়াছে ততদিন ক্রমবিকাশবাদ উত্থিত হয় নাই, হইতেও পারে না। কিন্তু যখন তাহা পারিয়াছে, তখনই এই তত্ত্ব, একই সময়ে বিভিন্নদেশে বিভিন্ন লোকের মনে, স্বতঃই উদয় হইয়াছে। যে স্বাভাবিক নিয়মবলে জগতের সমস্ত কার্য্য সাধিত হইতেছে, এই তত্ত্ব সেই স্বাভাবিক নিয়মেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। এখন, মানুষ বিজ্ঞানের ক্ষীণোন্নত অবস্থায় যে সমস্ত অস্বাভাবিক নিয়ন্তার কল্পনা করিয়াছে, একে একে তাহাদের বিচার করা যাউক। প্রথমেই ঈশ্বর। আমরা দেখিয়াছি জগৎ পরিরক্ষণকার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেছেন না; এখন তাঁহার হস্তক্ষেপকল্পনা আদৌ যুক্তিযুক্ত কিনা, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু বলা যাইতেছে।

১১। অজ্ঞেয়বাদ।

ঈশ্বর—জগতের আদিকারণ, সম্বন্ধে নানা ধর্ম্মে নানারূপ জল্পনা কল্পনা দেখা যায়; ধর্ম্মপুস্তক ব্যতীতও, যাহা প্রকৃষ্ট ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া গৃহীত হয় নাই, যথা—ভারতবর্ষে দর্শনাদি, পাশ্চাত্য প্রদেশে Philosophy—তাহাতেও নানারূপ প্রয়াস দেখা যায়। ধর্ম্মপুস্তকের ঈশ্বর প্রায়ই স্বাকার, হস্তপদাদির বাহুল্য থাকিলেও মনুষ্যেরই অনুরূপ; কখনও বা চতুর্হস্ত, কখনও বা চতুষ্পদ, কখনও বা পাঞ্চমৌণ্ডিক। আকৃতি সম্বন্ধে এই প্রকার, প্রকৃতি সম্বন্ধেও নানা প্রকার। বৈদিক ইন্দ্র বা গ্রীক জিউস শারীরিক বলে মানুষ অপেক্ষা খুব বলবান হইলেও মানুষেরই অনুরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন, বরং দেখা যায় তাঁহারা বিশেষ চরিত্রবান ছিলেন না। *

ধর্ম্মপুস্তকস্থ এই সমস্ত বহুলাঙ্গ ঈশ্বর সম্প্রদায়কে প্রণাম করিয়া, এখন দর্শনাদির দিক দিয়া তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করা যাউক। তাঁহার স্বরূপ কি? —তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যায়?—ইহা লইয়া মানুষ অনেক ভাবিয়াছে; ভাবিয়া কুল পাইয়াছে কিনা দেখা যাউক। উপনিষদকার প্রথমেই গাহিলেন "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং।" তাঁহাকে পাইতে চাও, আদৌ তাঁহাকে জানা যাইতে পারে কিনা তাহাই সন্দেহ। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদী ঐ সুরে সুর মিলাইয়া বলিলেন, "তাঁহাকে ত জানা যায়ই নাই, কখনও জানা যাইতে পারে না; তিনি কখনও জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না।" কথা শুনিয়া পাঠকের মনে নিতান্তই ক্ষোভ হইবে; সেই একমাত্র সচ্চিদানন্দকে, সেই—

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং

* (ক) "কস্তে মাতরং বিধবামচকৃচ্ছয়ুং কস্ত্বামজিঘাংসচ্চরন্তং।
কস্তে দেবো অধিমর্ডীক আসীদ্যৎ প্রাক্ষিণাঃ পিতরং পাদগৃহ্য"।
৪র্থ ১৮ সূ ১২ ঋক্॥

(অনুবাদ) হে ইন্দ্র? তুমি ভিন্ন কে আপন মাতাকে বিধবা করিয়াছে।.........
তুমি তোমার পিতার পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া পিতাকে বধ করিয়াছ।

তাঁহাকে পাইব না? যে যাহা বলুক, অজ্ঞেয়বাদীর মুখে ছাই পড়ুক, একথা বিশ্বাস কিছুতেই করিব না। অজ্ঞেয়বাদের সূত্রপাত ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়—

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব॥
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্তসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥

ঋক্‌বেদ ১০ম মণ্ডল ১২৯ সুক্ত।

কেই বা জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে যে হইল তাহা কেইবা জানে?

এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও জানিতে না পারেন।

একটি উপমা দ্বারা অজ্ঞেয়বাদীর যুক্তি স্পষ্টীকৃত করা যাউক। তোমার গন্তব্যস্থল কোথায়? ধরিয়া লও কাশী; ট্রাঙ্করোড় বহিয়া হাটিয়া তথায় উপনীত হইতে হইবে। প্রথমদিনের পাদবিক্ষেপের ফলে ফরাসডাঙ্গায় পৌছান গেল, দ্বিতীয় দিনে, ধর, বর্দ্ধমান পৌছান গেল; সময়শীরে কাশীতে উপনীত হইবার বাধা দেখা যায় না। ধর, আমাদের গন্তব্যস্থল আরও দূরবর্ত্তী,—প্রয়াগ, দিল্লী, লাহোর; ঐ ট্রাঙ্করোড় মুসলমান রাজত্বের সময় তেহারান অবধি বিস্তৃত ছিল, সেইখানেই যাইতে চাই। যতই দূরবর্ত্তী হউক, গন্তব্যস্থলে উপনীত হইবার দুইটিমাত্র উপাদানের আবশ্যক, সময় এবং চেষ্টা; অতএব প্রমাণ হইতেছে, সময় এবং চেষ্টাদ্বারা সর্ব্বস্থানেই পৌছান যাইতে পারে। পারে, কেবল একস্থানে নহে; যে স্থানের দূরত্ব তেহারান অপেক্ষা বেশী, তাতার অপেক্ষাও বেশী, চন্দ্রসূর্য্য-অপেক্ষা বেশী, অস্ফুট-নক্ষত্রনীহারিকা-মণ্ডল অপেক্ষাও বেশী, যে স্থানের দূরত্বের শেষ নাই, যাহা অসীম দূরে অনন্তের পারে; ঐ স্থানে মানুষের পদ কোন কালেই পৌছিতে পারে না—অবশ্য কালের অবসানে পৌছিতে

পারিবে, তৎপূর্ব্বে নহে। এইত গেল হস্তপদাদির কথা, এখন মনের দৌড় কতদূর দেখা যাউক। তাহার সৃষ্টি হইতে মানুষ জ্ঞানের আলোচনা করিতেছে, কতদিন হইতে কে বলিতে পারে? খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে—জ্ঞানমার্গের সেই স্থলকে ফরাসডাঙ্গা বলা যাউক; বিংশতি-শতাব্দীতে হয়ত কাশীতেই পৌছিয়াছে, কাল সহকারে হিল্লি দিল্লী পার হইয়া আরও অগ্রসর হইবার বাধা নাই। এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষ যে অদ্ভুত উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা দূরদৃষ্টিতে দেখিলে বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইতে হয়; ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখিলে এই উন্নতির প্রসার কল্পনাকেও পরাজয় করে; এই জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের কোন ঈপ্সিত বস্তুই পাইতে বাকি থাকিবে না, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। আর লক্ষ বৎসর পরে, আমরা সকলেই হয়ত এক একটা ইন্দ্রে পরিণত হইব, দশসহস্র মত্তহস্তীর বল ধারণ করিব—তবে হস্তী তখন বাঁচিয়া থাকিলে হয়—মেঘ-বৈদ্যুতির উপর হুকুম চালাইব, পুষ্পক-রথে যথেচ্ছা বিচরণ করিব; আমাদের বাসস্থান হয়ত অমরাবতীকে উপহাস করিবে; যাঁহারা আমাদের শীর্ষস্থানীয়া—স্ত্রীজাতি, তাঁহারা হয়ত অপ্সরাগণকেও রূপে, গুণে, পোষাকপরিচ্ছদে বা তাহার স্বল্পতায় পরাজয় করিবেন। ধর্ম্মপুস্তকবর্ণিত কোন কল্পনাই হয়ত অপূর্ণ থাকিবে না; কিন্তু পাইব না কাহাকে? যিনি ঐ কল্পনার অতীত।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহু র্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

তিনি যে সর্ব্বাংশে কল্পনার অতীত তাহার প্রমাণ হইতেছে যে, অন্যথায় তিনি অনন্তরূপী হইতে পারে না; তাঁহাকে শান্ত হইতে হয়। আমরা শান্ত, তাঁহাকে আমাদেরই সপিণ্ড, সগোত্র বা সমানোদক ঐরূপ কিছু হইতে হয়।

"তিনি অনন্তরূপী হউন, আংশিকরূপে শান্ত হইতে কি পারেন না?"

অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এইখানেই তাঁহার শক্তির সীমা, তিনি কেবল ঐ টুকুই হইতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে ঈশ্বরের আসন হইতে নামিয়া আসিতে হয়। জোর করিয়া ধরিয়া যদি আমরা তাঁহার কোন অঙ্গসংযোজনা করিয়া দিই, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়া পড়ে, তাহা কাষ্ঠময় বিকলাঙ্গ মাত্র হইয়া পড়ে।

একটা উপমামাত্র দেওয়া হইল, কাজের কথা এখনও বলা হয় নাই। হস্তপদাদিরূপ স্থূলঅঙ্গের গতির ন্যায়, মনের বা জ্ঞানের গতির সীমা কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে? জ্ঞানের অসীম উন্নতি হইতে পারে না কেন? কারণ আছে। হস্তপদাদি যেমন নিগড়বদ্ধ বা নিয়মবদ্ধ, মনও তদ্রূপ নিয়মবদ্ধ; মন সীমাবদ্ধ—নিয়মই তাহার সীমা; সে সীমা সে অতিক্রম করিতে পারে না; যে সীমাবদ্ধ সে অসীমে যাইতে পারে না; পক্ষী কখনো বায়ুমণ্ডলকে অতিক্রম করিয়া উড়িতে পারে না। কেহ কেহ বলিবেন—

"যোগের দ্বারা জ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়, যোগবলে ঈশ্বরে পৌঁছাইতে পারা যায় নাকি?"

কি করিয়া যাইবে? অন্ততঃ জ্ঞানযোগের দ্বারা নহে। পুনরায় সেই পথপর্য্যটনের উপমা গ্রহণ করা যাউক: হাটিয়া না গিয়া বাষ্পীয়যানে আরোহণ করিয়া গেলে কাশীলাভ সত্বই হইতে পারে, কিন্তু যে স্থান অসীমের প্রান্তে, তাহার দূরত্ব কমে না, সেখানে পৌছিতে সময়ের সংক্ষেপ হয় না, সেই কালাতীত সময়েরই আবশ্যক হয়। যোগে মনের শক্তি বৃদ্ধিমাত্র করিতে পারিলেও পারিতে পারে, মনকে অন্য কোন উৎকৃষ্ট পদার্থে পরিণত করিতে পারে, এরূপ কথা কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়?

চার্ব্বাকের সহিত অজ্ঞেয়বাদের পার্থক্য আছে। প্রত্যক্ষীভূত নহে বলিয়া চার্ব্বাক ঈশ্বর, আত্মা, ইত্যাদির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন, কিন্তু অজ্ঞেয়বাদে অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইতেছে না, কেবল জ্ঞেয়ত্ব অস্বীকার করা হইতেছে। যদি বলা যায় —

"অজ্ঞেয় বলিলেও জ্ঞান বুঝায়, জ্ঞেয় নহে এ জ্ঞানও জ্ঞান; অতএব অজ্ঞেয় কথার কোন অর্থ নাই।"

ইহা যদি জ্ঞেয়ত্ব স্বীকার বলা যায়, তাহা হইলে ইঁহারা জ্ঞেয়, তবে ঐ পরিমাণেই জ্ঞেয় ; ইঁহাদের আর কিছু জ্ঞেয় নহে, জ্ঞেয় হইবার অন্য কোন উপাদান ইঁহাদের নাই। ইহাপেক্ষা জ্ঞেয় হইতে গেলে তাহা জ্ঞানের দ্বার হয় না ঈশ্বরানুগ্রহ আবশ্যক ; যাহার তাহা লাভ হইয়াছে তাহার আর কিছুরই আবশ্যকতা নাই, যাহার লাভ না হইয়াছে বা হইবার পক্ষে সন্দেহ রহিয়াছে, তাহারই অন্যবিধ চেষ্টার আবশ্যক।

"ঈশ্বরানুগ্রহ না হইলেও গুরুর উপদেশে হইতে পারে।"

গুরুর উপদেশে জ্ঞান লাভ হয় না, বিশ্বাস লাভ হয়। যাহাদের ঈশ্বরানুগ্রহে অতিরিক্ত জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাহাদের সেই জ্ঞান আবার তাহাদেরই নিজস্ব, তাহা অপরে হস্তান্তরিত করা যায় না, বিশ্বাসমাত্র হস্তান্তরিত হইতে পারে—জ্ঞান, বিশ্বাস নহে। অতিরিক্ত বা দিব্যজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের প্রভেদ এই যে, সাধারণ জ্ঞান প্রকৃতির সহিত পরিচয় দ্বারা লাভ করা যায়, দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে আরও কিছু আবশ্যক হয়।

ঈশ্বর সম্বন্ধে কল্পনা করিবার যে ব্যাঘাত আছে, তাহা বিশেষভাবে বলা যাইতেছে : আমাদের, যে দেবদেবী, ঈশ্বরের কল্পনা; তাহা কি ? আমাদের, কালী বা বিষ্ণু, কৈলাস বা গোলোকের কল্পনা করিতে হয়, ভক্তি করিতে হয়, উপাসনাও করিতে হয়। মন সে কল্পনার উপাদান কোথা হইতে সংগ্রহ করে ? কুম্ভকার বা চিত্রকার এই উপাদান সরবরাহ করে, পুরাণাদিকথিত বর্ণনাও কতকটা সাহায্য করে, তাহা অন্যরূপ—এই মূর্ত্তির নূতন উপাদান দিতে পারে না, জগতে যে সমস্ত স্বাভাবিক উপাদান পাওয়া যায়, তাহার একটার সহিত আর একটার সংযোগ করিয়া নূতনতর একটা সমাবেশের পক্ষে সাহায্য করে। কুম্ভকার যে কালীমূর্ত্তি গঠন করিয়াছে, ঠিক সেই ভাবে না ভাবিয়া তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিন্নরূপ সমাবেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু, জগৎ ভিন্ন মূর্ত্তি কল্পনার উপাদান অন্যত্র পাওয়া যায় না। ইহা বলা বাহুল্য হইলেও সময় বিশেষে অনেকে তাহা ভুলিয়া যান। এখন জগতে ঈশ্বরের মূর্ত্তির উপাদান কোথায় পাওয়া যাইবে ? জ্ঞানের উন্নতিসহকারে মানুষ কাজেই কল্পনা করিল—ঈশ্বর নিরাকার, অর্থাৎ আকাররূপ যে গুণ (attribute)

তাহা তাঁহাতে আরোপ করা যায় না। বিষ্ণুর সাকিন? বৈকুণ্ঠ। সে রাজ্য কল্পনা করিবার উপাদানও এই জড়জগত হইতে লইতে হইবে, অন্যত্র পাওয়া যাইবে না। তথাকার মৃত্তিকার গুণাংশ হীরক হইতে লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার বেশী আর করিবার সাধ্য নাই। এখন এইরূপ বাসস্থান ঈশ্বরের উপযোগী হয় না, কারণ, ঈশ্বর কল্পনার শীর্ষস্থানীয়; তাহা না হইলে তিনি ঈশ্বর হয়েন্ না, কল্পনার উচ্চতম শিখরেই তাঁহাকে বাস করিতে হইবে, নামিবার সাধ্য নাই। হায়, সর্ব্বনিয়ন্তার কি দুর্দ্দশা! তিনি নিতান্তই মানুষের মনের ক্রীড়াপুত্তলি। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে, জ্ঞানজ ঈশ্বরেরই এই অবস্থা, অন্যের নহে। মানুষের মনে তিনি যখন স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন তখন তাঁহারই স্বাধীনতা; কিন্তু সে কাহার অদৃষ্টে ঘটে? যাহার ঘটে তাহার আর জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই, জ্ঞানের দ্বারা তাহা ঘটেও না। স্মরণ রাখিতে হইবে, শ্রবণ মনন নীদিধ্যাসন, যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম, সম দম উপরতি তিতীক্ষা, জ্ঞান নহে, ইহা কিছু জানা নহে, জানিবার পক্ষে অভ্যাস মাত্র; সে কথা এখন থাক। হীরকখচিত বৈকুণ্ঠ খুব স্পৃহনীয় বাসস্থান হইলেও, ঈশ্বরকে তথায় বসাইয়া সন্তুষ্ট থাকা যায় না। মানুষ এক সময় সন্তুষ্ট ছিল; সেই পৌরাণিক যুগে—এখন এ জ্ঞানমাত্রসম্বল কলিযুগে আর তাহা থাকিবার সাধ্য নাই। কেন নাই?—বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্থানের কল্পনা কি হইতে পারে? হইতে পারে না, তবে আর একটা কল্পনা হইতে পারে: স্থানের আবশ্যক সৃষ্ট পদার্থেরই হয়, স্রষ্টার আবার স্থানের আবশ্যকতা কি? তিনি এই আবশ্যকতার অতীত। মানুষ যখনই এই কল্পনা করিতে পারিল, তখনই দেখিল ইহা উচ্চতর কল্পনা: ভগবান স্থানচ্যুত হইলেন। এরূপ না হইলে কল্পনা বলিবে কেন? কল্পনা বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া যায়, বাসস্থানকে অতিক্রম করিয়া যায়, জগত্‌কে অতিক্রম করিয়া যায়। যাহা বাস্তব তাহা কল্পিত নহে, যাহা কল্পিত তাহা বাস্তব নহে। ভগবানের শক্তির পরিমাণ কি? যদি বলা যায়, তিনি দশ সহস্রমত্তহস্তীর বল ধারণ করেন, তাহাতে আফ্রিকাবাসী জাতিবিশেষ বিস্ময়াবিষ্ট হইবে,

কিন্তু সভ্যজাতির পক্ষে যথেষ্ট হইবে না; চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি যে বেগে ধাবিত হইতেছে, তাহা একত্রিত করিলেও তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। যদিও ইহা অপেক্ষা অধিকতর শক্তির কল্পনা হইতে পারে না, তত্রাচ এখনও কল্পনার স্থান রহিয়াছে। সে কোথায়? কোথায় গিয়া কল্পনা চরিতার্থ হইবে? শক্তির আধিক্যে নহে, তাহা সৃষ্ট পদার্থের পক্ষেই গৌরবের বিষয়, স্রষ্টার পক্ষে নহে; তিনি শক্তিরূপ গুণের অতীত; শক্তি তাঁহার পক্ষে লাঘবজনক; এইখানেই কল্পনার চরিতার্থতা হইল এবং যে ভগবান পূর্ব্বে অঙ্গহীন অবস্থায় ভিটাছাড়া হইয়াছিলেন এইবার তিনি নির্গুণ হইতে চলিলেন। ঈশ্বরে গুণের আরোপ না করিয়া গুণাতীতত্ত্বের আরোপ করিলেই কল্পনার সমধিক প্রসার হয়; অতএব তাঁহাকে গুণাতীত হইতেই হইবে।

আবার দেখিতে হইবে, তাঁহাকে অবাঙ্‌মনসগোচর না করিলে, জগতে অশুভের অস্তিত্বের হেতু নির্ণয় করা যায় না। জগতে এত দুঃখ কষ্ট কেন? যীশুকে ক্রুশে নিবদ্ধ হইতে হয় কেন? যোয়ান অব আর্ক কে জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ হইতে হয় কেন? কোটি নিরপরাধী হিন্দুরমণীকে এই অসহনীয় চরম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া জীবন উৎসর্গ করিতে হইল কেন? লম্বকদ্বীপে এখনও হিন্দুরাজত্ব আছে, সহমরণ প্রথা প্রচলিত আছে বা সম্প্রতিও ছিল। যদিও অগ্নিতে দগ্ধ হইবার ন্যায় শারীরিক যন্ত্রণা আর হইতে পারে না, তথাপি তথাকার আর এক রকম সহমরণ প্রথা নূতনতর বলিয়া পাঠকের মনে নূতন ভাব উদ্রেক করিবে। স্বামীর মৃত্যু হইলে যে স্ত্রী-সম্প্রদায় সহমরণেচ্ছা প্রকাশ করে, তাহারা কয়েক দিন বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হয়। নিম্নশ্রেণীর সমাজে সম্মান প্রদর্শন করিবার প্রকৃষ্ট উপায়, উত্তম খাদ্যবস্ত্রাদি সরবরাহ। তাহারা তাহাই করে। উত্তম বেশভূষা পরিধান করিয়া বিধবা শবদেহের সহিত যাত্রা করিয়া দাহস্থলে উপনিত হইয়া স্বামীর সহগমনেচ্ছা প্রকাশ করে এবং নিজের বামবক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। তখন তাহার কোন নিকট আত্মীয়—ভ্রাতা থাকিলে সেই—ছুরিকাদ্বারা তাহার বক্ষ বিদ্ধ করে। সাধারণতঃ সে সামান্য অস্ত্রাঘাত করিতেই সমর্থ হয়; তখন এই সমস্ত

দেশাচার-প্রতিপালক ধর্ম্মরক্ষক নরপিশাচগণ পুনঃপুনঃ অস্ত্রাঘাতে তাহাকে বধ করে।

বর্ব্বর জাতির মধ্যে নরবলিপ্রথা বহুবিস্তৃত। অনেক জাতির মধ্যে, নরবলি প্রদান না করিলে শস্য পর্য্যন্ত জন্মায় না, এরূপ বিশ্বাস বিশেষ প্রবল। দ্বাদশ হইতে ষোড়শবর্ষীয় বালক এই বলিদানের শ্রেষ্ঠ পাত্র। বধকালীন এই বালক যন্ত্রণায় যত অশ্রুবর্ষণ করিবে, বসুমতী ততই শস্যশালিনী হইবেন ; অতএব ইহারা বালককে রজ্জুসংবদ্ধ করিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গের অস্থি চূর্ণ করিতে থাকে। মানুষ হইয়া মানুষের উপর এই অত্যাচার! কে ইহার ব্যবস্থাপক ?—মানুষ ? তবে ত মানুষই ঈশ্বর। যদি স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক থাকেন, তবে তাঁহার প্রকৃতি নিতান্তই স্বতন্ত্র। প্রাণী অন্য প্রাণীকে ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। প্রতিমুহূর্ত্তে কত প্রাণী এইরূপে ভক্ষিত হইতেছে! ভগবান কি উদ্দেশ্যে এই নৃশংসতাস্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন? তাঁহার কি দয়া মায়া নাই? থাকিলে, এইরূপ ঘটনা কেন হয় তাহা কল্পনার অতীত। কিন্তু একটা বিষয় কল্পনার অতীত নয়, বরং অতিশয় উপযোগী—তাঁহার দয়া মায়া নাই। তবে কি তিনি নির্দ্দয়, নৃশংস ? তিনি প্রবৃত্তির অতীত, তিনি কল্পনার অতীত।

ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বি কর্ত্তাবিশেষের অস্তিত্ব আছে কিনা, স্পষ্টত কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিরুদ্বেগে উত্তর করিবেন, "না ; তাহা কি কখনও হইতে পারে? তিনি সর্ব্বশক্তিমান। নিতান্ত মূঢ় ভিন্ন এরূপ প্রশ্নই কেহ করিতে পারে না।" কিন্তু সংস্কার কোথায় যাইবে? অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য অবস্থায় বহু পুরুষ ধরিয়া বহু ঈশ্বরে—অনেক অবস্থায় পরস্পর যুদ্ধমান বিরোধী ঈশ্বর-সম্প্রদায়ে - যে বিশ্বাস সংস্থাপিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা মন হইতে সহজে অন্তর্হিত হয় না। যাহারা বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া মনকে গঠিত না করিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে পরস্পরবিবদমান একাধিকঈশ্বরাস্তিত্বপরিচায়ক ভাব লুকায়িত রহিয়াছে এবং সাধারণ কথোপকথনে, আচারব্যবহারে প্রকাশমান হইতেছে। ঈশ্বরকে সর্ব্বদাই ডাকাডাকি, স্তবস্তুতি করিবার প্রয়োজন

পড়িয়া রহিয়াছে; এমন কি দিগ্‌ধ্বংসকারি আগ্নেয়াস্ত্র—যাহা মুহূর্ত্তে সহস্র লোকের প্রাণবিনাশ করিতে পারে—ঈশ্বরের নামে মন্ত্রপূতঃ করিয়া তাহার সংহার কার্য্যের সহায়তা করিতে তাঁহাকে আহ্বান করা হইতেছে। বিপক্ষ পক্ষ আবার প্রথম পক্ষের প্রতি তদ্বৎ আচরণ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে। এখন তিনি কোন পক্ষে যান?

"ধর্ম্মের পক্ষে"।

তবেই হইল, তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ভিন্ন ধর্ম্ম, অর্থাৎ তাঁহার ঈপ্সিত কর্ম্ম, সংঘটিত হইবে না, কর্ম্মান্তর সংঘটিত হইয়া যাইবে। এই কর্ম্মান্তরের কর্ত্তা তিনি হইতে পারেন না, তাহা হইলে তাঁহাকে ডাকাডাকির প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না; তবেই ইহার কর্ত্তা স্বতন্ত্র।

অসহায়া পতিব্রতা রমণীর সতীত্ব রক্ষার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া কোন ফল হইতে পারে না, যুপনিবদ্ধ প্রতিঅস্থিগ্রন্থিভগ্নপ্রায় ছাগশিশুর ক্রন্দন তাঁহার কর্ণে পৌঁছায় না, আহারব্যবস্থাবিরহিত কোটি কোটি প্রাণীর মৃত্যু যন্ত্রণা তাঁহাকে মোহিত করে না; তবে আর কি বলিব? তিনি নিতান্তই ত্রিগুণাতীত, অর্থাৎ, নিতান্তই অজ্ঞেয়। অনেক কৃতবিদ্য লোককে, ঈশ্বরকে ঘটনা বিশেষের কর্ত্তাস্বরূপ নির্ণয় করিতে দেখা যায়। মীরণের মস্তকে বিনামেঘে বজ্রাঘাত (!) হইলে, ঐতিহাসিকবিশেষ ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন। এইরূপ অনেক স্থলেই অনেক ঐতিহাসিক, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের কার্য্য অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। আফিসের সাহেব দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলে তাহাতে ঈশ্বরের হস্ত অবলোকন করিয়া কালীঘাট অভিমুখে ধাবমান হইতে হয়, আবার সবুটপদাঘাতে প্লীহা ফাটাইলেও সেই হস্ত! যদি বলা যায় সকলই সেই একই হস্তের কার্য্য, তাহার উত্তর পুনঃ পুনঃ দেওয়া হইতেছে:—তবে আর ডাকাডাকি কেন? সংসারে যে এত অত্যাচার, অবিচার, দুঃখশোক, বৈসদৃশ্য, অসম্পূর্ণতা, অজ্ঞেয়বাদ ভিন্ন ইহার মিমাংসা হয় না। "তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন আর কোন মীমাংসা নাই" বলিলেও স্থূল (crude) অজ্ঞেয়বাদই হয়।

"তিনি ইচ্ছা করিলে কি সগুণ হইতে পারেন না ?"

না ; তিনি ইচ্ছাতীত। তিনি ইচ্ছাময় এরূপ কল্পনা উচ্চ কল্পনা নহে, ইচ্ছানিচ্ছা পার্থিব জীবেরই গুণ, তিনি তাহার অতীত ; অর্থাৎ সেই গুণ বা কোন গুণই থাকা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ : ইহাই কল্পনার চরম।

বড়ই গোল বাধিল। যাঁহার রূপ নাই গুণ নাই, তাঁহার কল্পনাই বা কি করিয়া হইতে পারে ? অবশ্য ইহা নির্ম্মাতৃক কল্পনা নহে, বিয়োজক (destructive) কল্পনা ; ইহার স্থান রহিয়াছে। আমরা জ্ঞান লাভ করি দ্বিবিধ উপায়ে—লিখিয়া ও পুঁছিয়া। যে জ্ঞান ভিত্তিহীন, তাহা পুঁছিয়াই ফেলিতে হইবে। যখনই মন সগুণত্বের ধারণা করিয়াছে তখনই সঙ্গে সঙ্গে নির্গুণত্বেরও ধারণা হইয়াছে, অন্যথায় এতদুভয়ের কোন ধারণাই হইতে পারে না ; বিষয় বিশেষের ধারণা, বিষয়ান্তরের ধারণা ব্যতীত হইতে পারে না। যাহা হউক, না হয় কল্পনাই হইল, কিন্তু এরূপ শূন্যকল্পনা করিয়া, কি করিয়া চিত্তের তৃপ্তি হইতে পারে ? হয়ত তাহা হইতে পারে না বলিয়াই প্রাচীন আর্য্যদার্শনিকগণ—যাঁহারা ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যগ্রতায় পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জাতিকে অনেক পশ্চাতে রাখিয়াছিলেন—তাঁহারা উপায় চিন্তার ত্রুটি করেন নাই, যোগাদিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখন জ্ঞানপথাবলম্বীর ইহাতে কি হইবে ? যোগাদি, জ্ঞানের মুখ্য উপায় নহে, গৌণ উপায় মাত্র। ধরা যাউক এই সমস্ত অভ্যাসের দ্বারা জ্ঞান যথেষ্ট বৃদ্ধি হইল ; তাহা হইলেই বা কি হইবে ?

"তাহা হইলে কি ঈশ্বরের স্বরূপ দেখা যাইবে না ?"

কি করিয়া যাইবে ? স্বাভাবিক যে জ্ঞান আছে তাহার সাহায্যে কল্পনা করিয়া যাঁহাকে নির্গুণ করা হইয়াছে, অতিরিক্ত জ্ঞানের দ্বারা কি কল্পনার অবনতি হইবে ? কল্পনা যে স্থলে উঠিয়াছিল তাহা হইতে কি নামিয়া আসিবে ? তাহা হইতে পারে না। গুণাতীতের কল্পনা হইয়া গিয়াছে, আর সগুণের কল্পনা হইতে পারে না ; তবে গুণাতীতগুণবিশিষ্ট ইহার অতিরিক্ত কোন কল্পনা—যাহা বর্ত্তমানে মনুষ্যের মনের অতীত—

তাহা হইলেও হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর আর আকার প্রাপ্ত হইবেন না বা গুণবিশিষ্টও হইবেন না।

"না, তাহা নহে। জ্ঞানের উন্নতিসহকারে সগুণের কল্পনাই উচ্চতর কল্পনা হইবে।"

কি করিয়া হইবে? বর্ত্তমানে যোগবিরহিতের পক্ষে তাহা অসম্ভব-কল্পনা মাত্র।

"যোগিরা সগুণ ঈশ্বর দেখিয়া থাকেন; অতএব সগুণ ঈশ্বরের কল্পনাই উচ্চতর। ইহা যে উচ্চতর কল্পনা, তাহা বর্ত্তমানে আমাদের মনের ক্ষুদ্রতার জন্য বুঝিতে পারিতেছি না, যোগারূঢ় হইলেই বুঝিতে পারিব।"

যাঁহারা এরূপ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহাদের নিরস্ত করিবার পক্ষে বলিবার আর কিছুই নাই; তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, বিশ্বাস জ্ঞান নহে, বিশ্বাস মাত্র; তাহা লইয়া যিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন তিনি অবশ্যই জ্ঞানাতীত। যোগ সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় যথাস্থানে বলা যাইবে; উপস্থিত সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা যাহা উপলব্ধি হয়, তাহাই বলা যাইতেছে। শেষ কথা এই যে, ঈশ্বরের কল্পনা করিতে হইলে কল্পনার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে হইবে। তথা হইতে দেখিলে এইরূপ দেখা যায় যে, সৃষ্ট পদার্থে যে সমস্ত রূপ গুণ আছে স্রষ্টার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে, সৃষ্টি ছাড়াইয়া কোন রূপগুণের কল্পনা হইতে পারে না; অতএব তিনি নিরাকার ও নির্গুণ।—শুধু তাহাই নহে তিনি আরও মহৎ – তিনি রূপগুণাতীত।

এই স্থানে গীতোক্ত ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে দুএকটা কথা বলা যাউক। ভগবান যখন বিশ্বরূপ ধারণ করিলেন তখন চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদি সমস্তই তাঁহাতে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ইহার অর্থ এই যে, সমস্ত জগতই তাঁহার দেহ বটে কিন্তু জগৎ লইয়াই তাঁহার দেহের সমাপ্তি হয় নাই, তাঁহার দেহ আরও রহিয়াছে, তাঁহার আকার সম্বন্ধে কল্পনা করিবার স্থান রহিয়াছে। ইহা উচ্চ অঙ্গের কল্পনা হইলেও সর্ব্বোচ্চ নহে; সৃষ্টি সম্বন্ধেও আমরা এরূপ অনন্ত বিস্তৃতির কল্পনা করিতে পারি। স্রষ্টাকে কিন্তু তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে।

"ইহা অবয়বের কথা নহে, শক্তির কথা।"

তাহাতেও ঐ গোল উপস্থিত হয়; সৃষ্টিকেই অনন্তশক্তিশালিনী বলিয়া কল্পনা করিবার কোন বাধা নাই। সৃষ্ট পদার্থের শক্তির পরিচয় আমরা সামান্যই জানি; আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র অভাবজনিত চেষ্টার দ্বারা যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ জানিয়াছি, তাহাই জানি; আর কিছু জানিবার সাধ্য নাই; কিন্তু তাই বলিয়া আরও শক্তি আছে, এরূপ কল্পনা করিবার বাধা নাই; জ্ঞানের অনুন্নত অবস্থায় সৃষ্টিতে তাড়িতের সর্ব্বত্র বস্থিতি, চক্ষু ছাড়াইয়া আলোকের বিস্তৃতি, radio-activity ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায় নাই, এখন যাইতেছে; জ্ঞানের বিশেষ উন্নতিতে আরও কত অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহা বর্ত্তমানে কল্পনার অতীত; গ্রহণোপযোগী ইন্দ্রিয়ের অভাবে কত শক্তির পরিচয় পাইতেছি না, তাহা চিন্তার অতীত। অতএব সৃষ্টিকেই অনন্তশক্তিশালিনী বলা যাইতে পারে। কিন্তু স্রষ্টাকে আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে; তাহা হইলেই তিনি রূপগুণশক্তিসামর্থ, এ সমস্ত বিষয়ের অতীত, ইহা ভিন্ন আর কিছু কল্পনা করিবার স্থান রহিল না। এইরূপ যে ঈশ্বর, তিনি এই তুচ্ছ জগতের কার্য্য করিতে কেন আসিবেন?

সৃষ্টিপ্রহেলিকা কিরূপ অজ্ঞেয় আরও দেখা যাউক। এক বস্তু বস্বন্তর হইতে উৎপন্ন হয়। আমরা দেখিতে পাই: বীজ হইতে বৃক্ষ, মেঘ হইতে বৃষ্টি, মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি; অতএব মনের মধ্যে প্রশ্ন উদিত হইল, এই জগৎ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? জগৎ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে বলিলে উত্তর হয় না; কারণ প্রশ্ন দ্বারাই অন্য জন্মকারণের অবস্থিতির সম্ভাবনা কল্পিত হইতেছে। তাহা আর কে হইতে পারে? —ঈশ্বর। ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন তখন আমরা তথায় উপস্থিত ছিলাম না, সেই কার্য্য চক্ষু বা কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় নাই। তবে ইহা কল্পনা। এই কল্পনার উপাদান কোথা হইতে সংগ্রহ করিলাম?—কুম্ভকারের নিকট হইতে। কুম্ভকারের সৃষ্টি ও ভগবানের সৃষ্টিকার্য্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। কুম্ভকার উপাদান সৃষ্টি করে না, তাহার রূপান্তরমাত্র সংঘটিত করে। সে ঘটের সৃষ্টিকর্ত্তা মৃত্তিকার নহে।

মৃত্তিকার সহিত ঘটের সৃষ্টিকর্ত্তার সন্ধান আবশ্যক হইলে কুম্ভকারে কুলায় না, অন্য স্রষ্টার আবশ্যক হয়। কুম্ভকার সেই স্রষ্টার আংশিক সহায়তায় সেই ঘটের সৃষ্টি করিল। এখন দেখিতে হইবে যে, ঈশ্বরের পক্ষে সে সুবিধা নাই; তিনি কাহারও সহায়তার অপেক্ষা করিতে পারেন না, একাই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। ভগবান কি নিজের দেহ হইতে এই সৃষ্টি করিয়াছেন? ইহা কি তাঁহার দেহের প্রসার মাত্র? তবে ত এই জগৎ তাঁহার দেহমাত্র—এই জগৎও যাহা তিনিও তাহা। পৃথক জন্মকারণ পাওয়া গেল না। কাজেই বলিতে হইতেছে—

"তাঁহার দেহ নহে, জড়পদার্থ।"

এই পদার্থ তিনি কোথায় পাইলেন? ইহা যদি তাঁহার নিজের দেহ না হয়, তবে ইহা অন্য কাহারও দেহ বা সৃষ্ট পদার্থ; অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিয়া নিজের কার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। এই জগৎ তাঁহার দেহ না হইলে, সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা করিলেও সৃষ্টিপ্রহেলিকা উদ্ঘাটিত হয় না, নিবিড় রহস্য থাকিয়াই যায়। তাঁহার দেহ বলিলে ঈশ্বরবাদ অস্বীকার করা হয়, সৃষ্টি স্বতবিদ্যমান বলা হয়। অনেক স্থলে জগতের কার্য্যসমূহের কারণ না পাইয়া আমরা যে ঈশ্বরকে কারণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করি, তাহার আবশ্যকতা নাই পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। জগতের মধ্যেই যে সমস্ত ঘটনার কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, আমাদের জ্ঞানের অপ্রচুরতাবশত দেখিতে পাইতেছি না, বিজ্ঞান পদে পদে অদৃষ্টপূর্ব্ব কারণ আবিষ্কার করিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে। আর একটা কথা; জীবাত্মা পরমাত্মার কল্পনা করিলেই অদ্বৈতবাদ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। দ্বৈতবাদ মূর্খের উক্তি। জীবাত্মা যদি পরমাত্মার অংশ না হইল, তবে তাহা কাহার অংশ? পরমাত্মা ব্যতীত চরমাত্মার?—না অতি-সু-উৎপন্ন-মাত্মার? সৃষ্টি কে করিয়াছে, ইহা করিবার আবশ্যকতা আছে কি না, তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়, কোন কালেই জ্ঞেয় হইবে না। জ্ঞানের দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহার একমাত্র উপায় আছে—Herbert Spencer প্রমুখ পণ্ডিতগণ যে অজ্ঞেয় রহস্যের কথা বলিয়াছেন তাহাই একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু অজ্ঞেয় বলিয়া তিনি আবার

যে অনন্ত, স্বাবলম্বিত (absolute) ইত্যাদি বলিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। এস্থলে তাঁহার ভুল হইয়াছে; এরূপ বলিলে আংশিক জ্ঞেয় হইয়া পড়েন—তিনি তাহাও হইতে পারেন না। যদি বলা যায়, বিজ্ঞান যতই কারণ আবিষ্কার করুক, শেষ কারণ অনাবিস্কৃত রহিয়া যাইবে, সে স্থলে ঈশ্বরকে বসাইতেই হইবে; তাহা নিশ্চয়। তাহা হইলেই তিনি জ্ঞানের বহির্ভূত রহস্যমাত্র হইলেন। যাহা জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত তাহা বিজ্ঞান; আর বিজ্ঞান কোন কালেই যাহার পরিচয় পাইবে না, তাহাই সেই অজ্ঞেয় রহস্য।

জ্ঞানের উপায় দ্বিবিধ:—স্পর্শমূলক—ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা যাহা লব্ধ হয়; ও সম্বন্ধমূলক—স্পর্শদ্বারা লব্ধ জ্ঞানের মানসিক সমাবেশদ্বারা যাহা পাওয়া যায়। প্রথমটি দ্বিতীয়টির অপেক্ষা করে। ইহা ভিন্ন জ্ঞান লাভের তৃতীয় উপায় নাই। তৃতীয়রূপ জ্ঞানের যে ব্যাখ্যা দার্শনিকগণ করিয়াছেন, যাহাকে মনের স্বধর্ম্মজ জ্ঞান বলা যাইতে পারে, যথা—কাল, দেশ বা আকাশের জ্ঞান; তাহা স্বতন্ত্র জ্ঞান নহে, প্রথম ও দ্বিতীয়বিধ জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। এখন যিনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন, তাঁহার আর কি জ্ঞান হইতে পারে? এইমাত্র জ্ঞান হইতে পারে যে, তিনি তাহার অতীত। ইহাও একটা জ্ঞান বটে, কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, এ জ্ঞানের ঐখানেই পরিসমাপ্তি—আর বৃদ্ধি করা যায় না। এই উভয়বিধ জ্ঞান একাধিক উপাদান ভিন্ন উৎপন্ন হয় না: স্পর্শমূলক জ্ঞান জন্মিবার জন্য অহং এবং বাহ্যবস্তু উভয়ের আবশ্যক; সম্বন্ধমূলক জ্ঞান জন্মিবার জন্য একাধিক স্পর্শমূলক জ্ঞান আবশ্যক; অন্যথায় সংযোগ হয় না। এ স্থলে পাশ্চাত্য অদ্বৈতবাদ হইতে দ্বৈতবাদ শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানরাজ্যে অদ্বৈতবাদ আদৌ প্রতিপাদ্য নহে, তাহা কেহ করিতেও পারেন নাই। এখন ঈশ্বরের সম্বন্ধমূলক জ্ঞান কি হইতে পারে? তাঁহার যখন দ্বিতীয় নাই তখন কাহার সহিত তাঁহার তুলনা করা যায়? একমাত্র তুলনার বস্তু সৃষ্টি। তুলনা করিয়া কি পাইলাম? পাইলাম এইমাত্র যে তিনি সৃষ্ট পদার্থ নহেন। এখন সৃষ্ট পদার্থের কোন রূপগুণ তাঁহাতে আরোপ করিলেই তিনি আংশিকরূপে সৃষ্ট পদার্থ হইয়া পড়েন; তাহা হইলেই আর স্রষ্টা থাকেন না। যেমন অতি বৃহৎ

সংখ্যাকেও শূন্য দ্বারা গুণ করিলে সে শূন্য হইয়া যায়, তদ্রূপ সৃষ্ট পদার্থ দ্বারা ঈশ্বরকে গুণযুক্ত করিলে তিনিও শূন্যতা প্রাপ্ত হয়েন।

"তবে আদৌ তিনি সৃষ্টি করিলেন কেন?"

কে বলিতেছে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন? সৃষ্টির আদি এবং অন্ত অজ্ঞেয়, মধ্য হইতে কতকটা জ্ঞেয়—ইহাই অজ্ঞেয়বাদ। জগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কতদূর দেখিতে পাই? যতদূর চক্ষু যায়; কতদূর শুনিতে পাই? যতদূর কর্ণ পৌঁছায়; কতদূর ভাবিতে পাই? যতদূর মন যায়। ইহার কেহই শেষ সীমায় পৌঁছায় না—ইহাই অজ্ঞেয়বাদ।

এখন, সৃষ্টির সহিত এরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তিনি বারংবার ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে যাইবেন কেন? অতএব বলিতে হইবে, জগতে নূতন সৃষ্টি হইতেছে না; যে পরিবর্ত্তন মাত্র হইতেছে, স্বাভাবিক নিয়মমাত্র তাহার কারণ, ঈশ্বর কারণান্তর নহেন। আর কোন কারণ আছে কিনা দেখা যাউক।

১২। দেবতা, অদৃষ্ট, কাল, মন্ত্রাদি, কার্য্যকরী শক্তি কিনা?

এখন দেখা যাউক ঈশ্বরের অধস্তন দেবতামণ্ডলী জগতে কার্য্য করেন কি না। পৌরাণিক যুগের পরে, বর্ত্তমান থিয়সফিষ্টগণ দৈবগটিত কার্য্যের অনেক ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন—আত্মাকেও একটা দেবতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাউক। এই ইতিহাস যদি সত্য হয়, তবে দেবতাদিগের কার্য্যকুশলতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ করিবার উপায় থাকে না। দেবতাদর্শন মহল্লোকের হইয়া থাকে, যথা—মুনি, ঋষি, প্রাচীন খৃষ্টিয়ান ঋষিগণ (Saint); স্বর্গীয় কুমারী যোয়ানের দেবতা দর্শন হইয়াছিল। আমাদের ঋষিরা মিথ্যাবাদী হইলেও ইউরোপীয় ঋষিরা আর তাহা হইতে পারেন না, এমন কি তথাকার কেহই মিথ্যাকথা বলিতে জানে না, এটা আমাদেরই নিতান্ত নিজস্ব সম্পত্তি। সে যাহা হউক, ইঁহারা মিথ্যাকথা বলিয়াছেন, এরূপ মনে করা বাতুলতা মাত্র; অতএব মনে করিতে হইবে, ইহার ভিতর কোন সত্য লুক্কায়িত আছে। সাধারণ লোকের ভাগ্যে দেবতাদর্শন ঘটে না, তবে ঘটে এক সময়ে, অসাধারণ অবস্থায়; হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত এবং বিকৃতমস্তিষ্কের ভাগ্যে ঘটিয়া

থাকে। মহল্লোক ও এই দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে কি কোন সাদৃশ্য আছে? একটু সাদৃশ্য আছে—ইঁহারা ভাবোন্মাদে উন্মত্ত। স্বদেশপ্রেম যখন যোয়ান-অব-আর্ককে বিশেষভাবে অধিকার করিল, তখন তাঁহার এই প্রবৃত্তিস্রোত এরূপ বেগবান হইল যে, অন্যান্য স্রোত সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া গেল; বাহ্যিক পদার্থ অনেক সময় তাঁহার শিরায় কোন স্রোত প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইল না। এরূপ অবস্থায় মানুষের মন, মনেতেই অবস্থান করে; বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব এক প্রকার ভুলিয়া যায়; বিষয় বিশেষ অন্তঃকরণের ভিতর দেখিয়াছে কি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিয়াছে, তাহা স্থির করিতে পারে না; এ ভাবেও দেবতা দর্শন হয়। যাহাহউক, এসমস্ত মনীষিগণ, যাঁহারা অনেক বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা জগতের মহত্তর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের অসম্মান করিতে আমি আদৌ প্রস্তুত নহি; এইমাত্র বলিতে চাহি, যাঁহারা এই উচ্চ শ্রেণীর জীব নহেন, তাঁহারা কিঞ্চিৎ সতর্ক হইয়া দেবতা-দর্শন করিবেন। মহল্লোকের পক্ষে যাহা দর্শন, তাঁহাদের পক্ষে হয়ত তাহা অধ্যাস; যাহা মহিমা, তাঁহাদের পক্ষে হয়ত রোগ।

সভ্যতার আদিম অবস্থায় এই দেবতাগণের কল্পনা কিরূপে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই বর্ণিত হইয়াছে। অসভ্য কোল, ভিল, সাঁওতাল, ভীতিবিধায়ক স্থানমাত্রেই দেবতাদর্শন করিয়া থাকে; বৃহৎ বটবৃক্ষ যেখানে অন্ধকারকে ঘনীভূত করিয়া রাখে; জনশূন্য দূরবিস্তৃত প্রান্তর, যেখানে মৃতদেহ পরিত্যক্ত হয়; দুরারোহ অজ্ঞাত গিরিশেখর, কল্পনা যেখানে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে; প্রবল জলাবর্ত্ত, যেখানে বহু তরণি বিপ্লুত হয়; প্রতিধ্বনি যেখানে পথিককে উপহাস করিয়া উঠে, এমন কি নিজের দেহের ছায়া, যাহা সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়; তাহাতেও দেবতা দর্শন করে। প্রাচীন আর্য্যগণ, গ্রীস, রোম, স্কণ্ডিনেভিয়া হইতে পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত, যেখানে বাসস্থান বিস্তার করিয়া বাগ্দেবীর আরাধনা করিয়াছেন, সেইখানেই নদনদীনির্ঝরিণী, বীথিকুঞ্জবৃক্ষবাটিকা হইতে আসমুদ্রপর্ব্বত, চন্দ্রসূর্য্যাদিগ্রহমণ্ডল, দেবদেবীতে ছাইয়া ফেলিয়াছেন। এখন তাঁহারা কোথায়? কালেভদ্রে দুই একজন এখানে সেখানে ভাগ্যবান্

ব্যক্তিকে দেখা দিয়া সরিয়া পড়েন। জড়জগত মধ্যে এই প্রাণসন্দর্শনের নামই কবিত্ব ইহা আর কিছুই নহে। কবিকে সর্ব্বত্র দেবতাদর্শন করিতে হইবে, Pantheist হইতেই হইবে; না হইলে কবিত্ব হয় না। কবিত্ব, ধর্ম্মের সহিত যুক্ত হইলে, দেবতত্ব (mythology) হয়; তাহা না হইলে, কেবল হৃদয়গ্রাহী কল্পনা হয়। ইহা কিন্তু কল্পনামাত্র; ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে বলিয়া জ্ঞান করিতে পারা যায় না; ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ভিন্ন মন যে ক্রিয়া করে তাহাকেই কল্পনা বলা যায়, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষিত না হইলে তাহা জ্ঞান হয় না। সে যাহা হউক, দেবতাদের অস্তিত্ব লইয়া আমাদের ততটা আবশ্যক নাই, জড়জগতে তাঁহাদের কার্য্যকরণী শক্তি সন্দর্শন করাই বিশেষ আবশ্যক। জড়জগতে কোন কার্য্য করিলে অবশ্যই তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে হইবে। এইরূপ দৈবঘটিত কার্য্য অনেকে করিয়া থাকেন, আরও অনেকে দেখিয়া থাকেন; ইঁহারা যখন দেখিয়াছেন বা করিয়াছেন এরূপ বলিতেছেন, তখন তাহার উপর আর তর্ক চলে না; তবে নৈসর্গিক নিয়মের সহিত এই দেখার সম্বন্ধ কি, তাহা দেখান যাইতে পারে। এই দেবতারা অবশ্য স্রষ্টা নহেন, সৃষ্ট পদার্থ। এখন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সৃষ্ট পদার্থের সহিত ইঁহাদের সম্বন্ধ কি? যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৃষ্ট পদার্থ নহেন, তখন ইঁহাদের সাধারণ রূপ নাই; থাকিলে সকলেই দেখিতে পাইত, ভাগ্যবানের চক্ষুর বিষয় মাত্র হইতে পারিতেন না; গুণ নাই—জড়জগতে কার্য্যকরণী শক্তিকে গুণ বলে; তাঁহাদের কার্য্য যখন সকলে দেখিতে পায় না, তখন সাধারণ কার্য্যকরণী শক্তি নাই; প্রবৃত্তি নাই: তাহা হইলেই তাঁহারা আর কার্য্য করিতে পারেন না; প্রবৃত্তি না থাকিলে কার্য্য করা যায় না, আবশ্যকও হয় না।

"ইঁহাদের রূপগুণ অসাধারণ।"

ভাল; রূপগুণ হইল অসাধারণ, প্রবৃত্তিটা সাধারণ রকমের হইল কেন? তাহা সাধারণ রকমের না হইলে, ইঁহারা জড়জগতে কার্য্য করিতে আসিতে পারেন না।

"কেন কার্য্য করেন তাহা অজ্ঞাত। যখন কার্য্য করিতে দেখিতেছি তখন কার্য্য করেন না কি করিয়া বলিব? মুমূর্ষু ব্যক্তি যখন স্বস্ত্যয়ন দ্বারা

বাঁচিয়া উঠিতেছে, কুম্ভকসহকারে দেহ উর্দ্ধে উঠিতেছে, প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া অক্ষত পদে হাটিয়া যাইতেছে, আমার মনের কথা অপর একজন বলিয়া দিতেছে, যে দ্রব্য কোথায় আছে জানে না দেখে নাই, তাহার সন্ধান বলিয়া দিতেছে, বিশেষতঃ যখন চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করিলেই দেবতা দেখা দিতেছেন, তখন তাঁহাদের কার্য্যকরণী শক্তি নাই কিরূপে বলা যাইতে পারে?"

আমি সরলভাবে স্বীকার করিতেছি, ইহার উত্তর নাই। সাধারণ জ্ঞানে যাহা বলা যাইতে পারে তাহা বলিয়াছি, আর দুই একটি কথামাত্র বলিতে চাহি। যাঁহাদের অসাধারণ জ্ঞান জন্মে নাই, তাঁহারা কেবলমাত্র বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দৈবের অনুসরণ করিলে, পরে অনুতাপ করিতে হইতে পারে। করণীয় কার্য্য সম্বন্ধে পরিচ্ছেদান্তরে বিশেষ বলা যাইবে।

চক্ষু বুজিলেই যে দেবতা বা মৃত ব্যক্তির আত্মা দেখা যায় তাহার স্বরূপ কি? কোন প্রকারের স্বাভাবিক রূপ না হইলে, চক্ষু দ্বারাই হউক আর মনের দ্বারাই হউক, দেখা যাইতে পারে না। স্বাভাবিক রূপগুণবর্জ্জিত যে দেবতা, তাহা মনের দ্বারা ভাবিতেও পারা যায় না। তবে স্বাভাবিক রূপগুণ বাদ দিয়া আমরা মনের ভিতরে যে মূর্ত্তি গড়িয়া তুলি, একটু অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা দেখিলে দেখা যাইবে, তাহা আদৌ মূর্ত্তি নহে, ভ্রান্তি মাত্র; মূর্ত্তি-গঠনের কোন উপযুক্ত উপদান না থাকিলে মনও তাহা গঠন করিতে পারে না; আকাশ-কুসুম কখনও ফোটে না।

"জগতের যাহা উত্তমাংশ তাহাই উপাদান।"

উত্তমাধম আপেক্ষিক শব্দমাত্র। স্বভাবের পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই তাহার উত্তম, যাহা প্রয়োজনীয় নহে তাহা অধম; ইহা ভিন্ন উত্তমাধম পৃথক করিবার অন্য পরিমাপক নাই। যে স্বর্ণখণ্ডের স্বভাব, আমাদের স্বভাব বা অভাবের যে পরিমাণে অনুযায়ী, তাহা সেই পরিমাণে উত্তম স্বর্ণ; ধাত্বন্তর আরও অনুযায়ী হইলে তাহা আরও উত্তম। লোক বিশেষের যে ভাব বা কর্ম্ম, আমার স্বভাব বা প্রবৃত্তির যে পরিমাণে অনুযায়ী, তাহা আমার নিকট সেই পরিমাণে উত্তম। দেবতাগণ যখন সাধারণ জড় ও শক্তিদ্বারা গঠিত নহেন, তখন জড়জগতের উত্তম অধমের সহিত

তাঁহাদের কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না; এখানে যাহা উত্তম তাহা হয়ত আদৌ তাঁহাদের স্বভাবের উপযোগী নহে। তাঁহাদের এরূপ ভাবে গঠিত করা, আমাদের স্বভাব অভাবের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কি? বাস্তবিক পক্ষেও, ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়মধ্যস্থ এই উপযোগিতাই দেবমূর্ত্তির নির্ম্মাতা; এই হৃদয়াসন ছাড়িয়া উঠিলে, হৃদয়মন্দিরের বাহিরে গেলে, তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর।

"ইঁহারা শক্তিমাত্ররূপী।"

কিরূপ শক্তি? যদি সাধারণ শক্তি হয়েন, তবে জড় হইবারই বা বাধা কি? বিশুদ্ধ নৈসর্গিক শক্তি হইলেই বা বিশেষ কি গৌরবের বিষয় হইল? যে সমস্ত নৈসর্গিক শক্তি লইয়া আমাদিগকে সংসার করিতে হইবে, তাহার সহিতই পরিচয় আমাদের আবশ্যক; তাহা ভিন্ন শতসহস্র অদ্ভুত শক্তি থাকুক না? যদি আমাদের কোন প্রয়োজনে না লাগে, তবে তাহাদের জ্ঞানলাভ সম্ভব হইলেও, সেই জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে তাহার জ্ঞান হইতেই পারে না, বরং অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আমরা বিদ্যমান যে শক্তিসমূহের যথাকথঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তাহা নিতান্তই প্রাণের দায়ে—জীবনরক্ষার্থ; ক্রমবিকাশ বাদে ইহা দেখা যায়। বহু চেষ্টার ফলে, বিশেষ প্রয়োজনীয়তার মূলে, ঐ কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান জন্মিয়াছে। যাহা অপ্রয়োজনীয় তাহার জন্য চেষ্টা হইতে পারে না, চেষ্টার অভাবে তাহার কোন জ্ঞানও হইতে পারে না। তবে ইঁহারা কি আলোক, বিদ্যুৎ ইত্যাদি? তাহা হইলে নিতান্তই খে'ল হইয়া পড়েন না কি? আলোক, বিদ্যুতের দুরবস্থার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর তাহা হইলেই বা ইঁহাদের সহিত বিশেষ প্রণয়ের আবশ্যকতা কি? আলোক, বিদ্যুৎ, আমাদের যেরূপ আয়ত্তাধীন হইয়াছে এবং হইবার সম্ভাবনা আছে, ইঁহারা কি ততদূর হইবেন? নৈসর্গিক শক্তির উপাসনা ত্যাগ করিয়া ইহাদের উপাসনায় কি বিশেষ ফললাভ হইবে?

"ইঁহারা চিন্ময়।"

অর্থাৎ নৈসর্গিক পদার্থের রূপগুণ বিহীন। তাহা হইলে নৈসর্গিক

প্রবৃত্তি বিহীন হইলে সামঞ্জস্য হয়; নৈসর্গিক প্রবৃত্তি বিহীন হইলে জড়-জগতে কার্য্য করিতে পারেন না। উপসংহারে বক্তব্য : জগত্‌পরিচালন পক্ষে প্রয়োজনীয় শক্তিবিশেষ না হইলে ইঁহাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধই নাই; ভূলোক ছাড়াইয়া যখন যাওয়া যাইবে তখন ইঁহাদের খোঁজ লওয়া যাইবে; আর, তাহার পূর্ব্বে খোঁজ লইবার সামর্থও জন্মিবে না।

সম্মোহনবিদ্যা, যাঁহারা দেবতাদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের একটি প্রধান অস্ত্র। ইহার বৈজ্ঞানিক অংশ আমি অবগত নহি, সাধারণ জ্ঞানে যাহা বুঝা যায় তাহা বলিতেছি। সম্মোহ মনুষ্যজাতির মধ্যেই আবদ্ধ নহে, পশুর মধ্যেও দেখা যায়। অন্ধকার রজনীতে নির্জ্জন পথমধ্যে অকস্মাৎ ভীষণদংষ্ট্রাসমন্বিত ব্যাঘ্রের সম্মুখে পড়িলে অনেকের কি ভাব হয়? যদিও সে স্থলে পলায়ন দ্বারা আত্মরক্ষাই একমাত্র যুক্তিযুক্ত কর্ত্তব্য, তত্রাচ ভীতি আমাদিগকে নিশ্চল করিয়া ফেলে; ইহাই সম্মোহ। মার্জ্জারের সম্মুখ হইতে মূষিক যেমন পলায়ন করিতে পারে না, কাঁচপোকার নিকট হইতে আরসোলা যেমন পলায়ন করিতে পারে না, আমাদেরও সেই অবস্থা হয়; ইহাই সম্মোহ। ভয় ইহার মূলকারণ; তজ্জনিত চিত্তবিকৃতি এই ভাবের মূল বিষয়। অতএব ইহা দ্বারা যে দেবতাদর্শন হয়, তাহার মূল্য বড় বেশী নহে।

অদৃষ্ট।

কুসুমাঞ্জলিতে বা ঐরূপ কোন গ্রন্থে আছে : এক রাজকন্যার স্বয়ম্বর সভায় দেশবিদেশ হইতে রাজপুত্রগণ সমবেত হইয়াছেন; তাহার মধ্যে দুই রাজকুমার যমজসন্তান—একই রূপবিশিষ্ট। ইহাও জানা গেল, তাহারা উভয়ই তুল্যগুণাদিবিশিষ্ট, তাহারাই আবার সভামধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রূপগুণ-সম্পন্ন; অতএব তাহাদেরই মাল্যপ্রদান করা কন্যার অভীপ্সিত হইল। এখন একজনকেই মাল্যপ্রদান করিতে হইবে, দুইজনকে পতিত্বে বরণ করা যায় না। এ স্থলে রাজকন্যা একজনকে ত্যাগ করিয়া অপর জনকে যে মাল্যপ্রদান করিল, ইহার কারণ কি? অদৃষ্টই কারণ বলিতে হইবে; তাহা বলিলেই অদৃষ্টের কার্য্যকারিণী শক্তি আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

এস্থলে, একের যে স্ত্রীরত্ন লাভ হইল, অপরের হইল না, ইহার আর কি কারণ থাকিতে পারে? রূপগুণাদি কারণ নহে, তাহা উভয়েতেই সমভাবে বর্ত্তমান। আমাদের শাস্ত্র রত্নভাণ্ডারবিশেষ, না পাওয়া যায় এমন কথাই নাই। শাস্ত্রে আছে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অগ্রে কনিষ্ঠের বিবাহ নিষিদ্ধ; যমজসন্তান একই সময়ে প্রসূত হয় না; একটি অগ্রে, অন্যটি হয়ত তাহার অব্যবহিত পরে ভূমিষ্ঠ হয়। হইলেই একজন জ্যেষ্ঠ হইল এবং বিবাহাদিতে অগ্রগণ্য অধিকার বিশিষ্ট হইল। কন্যা জ্যেষ্ঠকে ফেলিয়া কনিষ্ঠকে আদৌ মাল্য দিতে পারে না; এই জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠসম্বন্ধ গোপন রাখিয়া রাজপুত্রদ্বয়ও সভাতে বসিতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তবে বৌদ্ধ নাস্তিক তর্ক করিবে যে, অদৃষ্ট এই ঘটনার কারণ নহে, অগ্রে জন্মই কারণ। শাস্ত্র-সাগরে ডুব দিয়া আর একটি রত্ন আহরণ করা যাউক। ব্যবস্থা আছে যে, জ্যেষ্ঠের এই অগ্রগণ্যঅধিকার প্রথমবিবাহস্থলেই বর্ত্তায়; দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ হইতে অসংখ্য সংখ্যক বিবাহের যে বিধি আছে, সে স্থলে বর্ত্তায় না; অতএব বৌদ্ধ নাস্তিককে নিরস্ত করিয়া অদৃষ্টদেবীর বেদি প্রতিষ্ঠা করিবার উত্তম সুযোগ রহিয়াছে। ধরিয়া লওয়া যাউক, যমজ রাজপুত্র-দ্বয় উভয়ই পূর্ব্বে বিবাহিত; সে স্থলে অদৃষ্ট ভিন্ন আর কি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? বৈজ্ঞানিক বলিবে—

"না, ইহার নৈসর্গিক কারণ আছে। হয়ত যে অগ্রে কন্যার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাকেই মাল্য দিবে। এস্থলে অদৃষ্ট কারণ নহে, দৃষ্টি আকর্ষণের প্রাথমিকত্বই কারণ।"

মনে করা যাউক, উভয়ে প্রায় একই সময়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, অথবা একের উপর দৃষ্টি পতিত হইয়া অন্যের উপর যাইতে যে ক্ষণিক সময় লাগিয়াছিল, তাহাতে কন্যার মনোভাবের কোন বৈলক্ষণ্য জন্মে নাই; তাহা না জন্মিলে একজনকে ফেলিয়া অপরকে মনোনীত করিবার কারণ জন্মায় না।

"তাহা হইলে কন্যা হইতে যে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী ছিল তাহাকেই মাল্য দিবে এবং দিতে বাধ্য; অদৃষ্ট কারণ নহে, আপেক্ষিক নিকটত্বই কারণ।"

পুনঃরায় মনে করা যাউক, এরূপ অবস্থা ছিল না; উভয়েই তুল্য-দূরবর্ত্তী ছিল, কিম্বা যদিও একের অপেক্ষা অন্যের দূরত্ব সামান্য বেশী থাকে, তাহা কার্য্যকরী হয় নাই; সেই সামান্য প্রভেদে, কন্যার অঙ্গ-সঞ্চালনের কোন পার্থক্য জন্মায় নাই; সান্নিধ্যবশত কেহ নির্ব্বাচিত হয় নাই।

"এরূপ তুল্যাবস্থাবিশিষ্ট ঘটনা ঘটিতেই পারে না বা এত বিরল, যে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। এই উদাহরণ দ্বারা কোন তত্ত্ব সংস্থাপিত হইতে পারে না।"

ইহা এক শ্রেণীর ঘটনামাত্র, জগতে কোটি কোটি শ্রেণীর ঘটনা রহিয়াছে। এই সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে, উদ্ধৃত তুল্যাবস্থাবিশিষ্ট ঘটনা একবারও ঘটিতে পারে না, এরূপ কি করিয়া বলা যায়? অন্যান্য ঘটনাবলী হইতেও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বাহুল্য মাত্র। কোন শ্রেণীর ঘটনাবলীর মধ্যে একবারও এরূপ ঘটনা ঘটিলে অদৃষ্ট-বাদ স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষরূপ তুল্যাবস্থার আবশ্যকতাও নাই। উল্লিখিত উদাহরণে রাজপুত্রদ্বয় তুল্যরূপগুণবিশিষ্ট হইলেই আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে যথেষ্ট হয়; এমন কি যমজ সন্তান হইবারও আবশ্যক নাই। রাজকন্যার মন একের পরিবর্ত্তে অন্যের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়, রাজপুত্রদ্বয়ের অবস্থার মধ্যে এরূপ প্রভেদ না থাকিলেই, অদৃষ্ট সম্বন্ধে বিচার পক্ষে যথেষ্ট।

"যদি তাহাই হয়, তবে আদৌ কার্য্য হইবে না, কন্যা কাহাকেও মাল্যদান করিবে না। কন্যা সভামধ্যে যে স্থলে দণ্ডায়মান ছিল, বৈজ্ঞানিক কারণ ব্যতীত তথা হইতে পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারে না।"

পারে। স্বয়ম্বর সভায় একজনকে মাল্য দিতেই হইবে, অন্যথায় নিন্দার পাত্রী হইতে হইবে; কন্যার এই মনোভাবই তাহাকে চালিত করিবে।

"চালিত করিবে, কিন্তু উভয় পাত্রের মধ্যস্থলে যাইয়া কন্যাকে স্পন্দহীন হইতে হইবে। আর যদি তাহা না হয়, তবে এতক্ষণে ইহার নৈসর্গিক কারণ পাওয়া গিয়াছে: কন্যা যে চলিবে, উভয় পদ একত্র

বিক্ষেপদ্বারা চলিতে পারে না; এক পদের পরিবর্ত্তে অন্যপদ যে কারণে প্রথম প্রক্ষিপ্ত হইবে, সেই কারণেই একের পরিবর্ত্তে অন্যের গলায় মালা পড়িবে। যদি স্ত্রীঅভ্যাসবশত বাম পদ অগ্রে প্রক্ষেপ করিয়া থাকে, তবে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইয়া উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া যে দিকে ফিরা তাহার পক্ষে অধিকতর অভ্যস্ত, সে সেইদিকে ফিরিয়াই মাল্য প্রদান করিবে; অন্যথায় সে মাল্য প্রদান করিবে না, নিশ্চল হইবে।"

বৈজ্ঞানিকেরই জয় হইল; অদৃষ্টদেবীর আসন প্রতিষ্ঠিত হইল না। এই ফিরিবার অভ্যাসজনিত সামান্য কারণ যে স্ত্রীরত্নলাভরূপ বৃহৎ কার্য্যের উৎপাদক, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না; কেন পারি না তাহার কারণ দর্শান যাইতেছে:

কেহ অন্যমনস্ক হইয়া পথপর্য্যটন করিতে করিতে, এক পথ ছাড়িয়া অন্য পথ ধরিয়া যাইতে লাগিল। এরূপ পথান্তরে সে ইচ্ছা করিয়া যায় নাই বা যাইবার কোন উদ্দেশ্য ছিল না; সে অন্য মনেই এরূপ করিয়াছে। এস্থলে আমরা কি বলি? এই যে পথান্তরে গমন করিল, তাহার কারণ যে তাহার অদৃষ্ট, সাধারণ অবস্থায় তাহা বলি না; তাহার এই পথে যাইবার যে কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহার প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করি না; তবে যাইয়া যদি তাহার বিশেষ মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল সংঘটন হয়, তবেই বলি ইহা ভাগ্যেরই কার্য্য; তাহার নিজের চেষ্টা বা ইচ্ছা দ্বারা, সে সেপথে যাইতেছিল না, অদৃষ্ট তাহাকে তথায় লইয়া গিয়া এরূপ ঘটাইল। এ প্রসঙ্গে আর একটি গল্পের উল্লেখ করা যাউক: দুর্গা একদিন শিবকে বলিতেছেন, "দেব! তোমার সংসারে এত দৈন্য, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। দেখ, কত শত লোক এত নির্ধন যে একমুঠা অন্নের দ্বারা উদরজ্বালা নিবৃত্তি করিতেও অক্ষম। প্রভো! আপনাকে ইহার প্রতীকার করিতেই হইবে, সকলকেই ধনবান করিতে হইবে।" শিব কহিলেন, "সতি! সংসারে অদৃষ্টবল প্রবল; যাহার অদৃষ্টে যাহা নাই তাহা সে কিছুতেই পাইতে পারে না; অদৃষ্টের ফল কদাচ অন্যথা হয় না।" দুর্গা কহিলেন, "না দেব, তাহা আমি মানি না। ঐ যে দরিদ্র ব্যক্তি রাস্তা দিয়া

চলিয়া যাইতেছে, উহার দুঃখে আমার প্রাণ বড়ই কাতর হইয়াছে; উহাকে আমি এই স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলি প্রদান করিব।” এই বলিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। পথিক এতক্ষণ চক্ষু চাহিয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে পথাতিবাহন করিতেছিল; এখন মনে করিল, এতক্ষণ ত চোখ চাহিয়া চলিলাম, চক্ষু বুজিয়া চলিতে কিরূপ আরাম একবার দেখা যাউক না কেন? স্বর্ণের থলি তাহার সম্মুখেই পড়িয়াছিল, সে ডিঙ্গাইয়া চলিয়া গেল! ইহাকেই বলি অদৃষ্ট। কেহ ধনবানের গৃহে জন্মায়, কেহ বা দরিদ্রের সন্তান, ইহাকেই বলি অদৃষ্ট।—অর্থাৎ এই সমস্ত ঘঠনার নৈসর্গিক কারণ, যাহা স্পষ্টত পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার উপর আর একটা কারণ সংযোজনা করিতে প্রবৃত্ত হই। চক্ষু চাহিল না বলিয়া পথিক রত্ন পাইল না, ইহাই না পাইবার কারণ। চক্ষু বুজিবার প্রবৃত্তির কারণ কি? তাহা কি অদৃষ্ট কর্ত্তৃক ঘটিত হইয়াছে? অদৃষ্ট কি তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিয়াছিল? চক্ষু না চাহিবার অবশ্যই নৈসর্গিক কারণ ছিল, অন্যথায় সে চক্ষু বুজিত না। ইতিপূর্ব্বে স্বয়ম্বর প্রসঙ্গে অনেক সূক্ষ্ম কারণের অনুসন্ধান করা গিয়াছে, পুনরায় তাহা নিষ্প্রয়োজন। নিজ হইতে যিনি কারণানুসন্ধানে অনিচ্ছুক এবং অনভ্যস্ত, তাঁহাকে পদে পদে কারণ দেখাইয়া দিলেও কোন ফল নাই; সহস্রবার দেখাইয়া দিলেও একাধিক সহস্রবারে অদৃষ্টদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার হৃদয়মন্দির আলোকিত করিতে ছাড়িবেন না। এস্থলে বলা আবশ্যক, সমস্ত স্থলে নৈসর্গিক কারণ নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও যখন আমরা দেখিতেছি, অধিকাংশ কার্য্যই নৈসর্গিক কারণে সম্পন্ন হইতেছে এবং পূর্ব্বে যে স্থলে অনুসন্ধানে সেই কারণ পাওয়া যায় নাই, জ্ঞানের প্রসারে তথায় পাওয়া যাইতেছে; তখন বর্ত্তমানে যে স্থলে ঐ কারণ পাওয়া যাইতেছে না, ভবিষ্যতে জ্ঞানের আরও বিস্তৃতিতে সে স্থলেও ঐ শ্রেণীরই কারণ পাওয়া যাইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক; ভিন্ন শ্রেণীর, অর্থাৎ অনৈসর্গিক কারণ টানিয়া আনিবার কোন আবশ্যকতাই নাই; আনিলেও তাহাতে আমাদের জ্ঞানের কিছুমাত্র সাহায্য হয় না। যে অদৃষ্ট, সে ত অজ্ঞেয়। যথায় ভবিষ্যৎজ্ঞেয় কারণ, অর্থাৎ

নৈসর্গিক কারণ থাকিবার সম্ভব, তথায়, কোন কালেই যাহা জ্ঞেয় হইতে পারে না, তাহাকে স্থাপন কেন করিব ?

আমার স্বাভাবিক কার্য্যকরণী শক্তি দ্বারা কতক কার্য্য সম্পন্ন হয়, অবশিষ্ট কার্য্য, আমি ব্যতীত জগতের অন্যান্য কার্য্যকরী শক্তিদ্বারা সম্পন্ন হয়; তাহারাই তাহার কারণ। তাহাদের কার্য্যের ফল কখনও আমার পক্ষে শুভজনক, কখনও তদ্বিপরীত; অদৃষ্টের কার্য্যকরী শক্তি কোথায়? কেহ ধনবানের গৃহে জন্মিয়াছে; ইহা যেমন সেই ব্যক্তির কার্য্যকরী শক্তিদ্বারা সংঘটন হয় নাই, তেমন তাহার অতিরিক্ত যে নৈসর্গিক শক্তি সমূহ কার্য্য করিতেছে, তাহারাই ইহা করিয়াছে; অদৃষ্টদেবী করেন নাই বা তাহাদের লঙ্ঘন করিয়া কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। যখনই আমার নিজের চেষ্টা ব্যতীত, প্রকৃতি আমার বিশেষ মঙ্গলামঙ্গল সাধনের কারণ হয়, তখনই অদৃষ্টরূপ দ্বিতীয় কারণ আমরা টানিয়া আনি। আবার যখন প্রকৃতির কার্য্যাবলীর মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া কারণের সন্ধান পাই না, তখনও অদৃষ্টকে টানিয়া আনি। একটা আধারের ভিতর দশ লক্ষ লটারি টিকেট রহিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম টিকেটখানি একব্যক্তির নামের সহিত উঠিল; তখনই সে দরিদ্র হইতে ধনবানে পরিণত হইল। টিকেটখানি ঐরূপভাবে উঠিবার স্বাভাবিক কারণ পড়িয়াই রহিয়াছে—টিকেটের আধার যখন ঘূর্ণিত হইতেছিল, তখন এইখানি, অতি স্বাভাবিক নিয়মের বলে তাহার অধিকৃত স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, কোন দেবতাই তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এইরূপ স্থান লইয়াছিল বলিয়াই একজন দরিদ্র ধনবান হইল; কিন্তু কি সামান্য স্বাভাবিক কারণে একটা জীবনে কি বিশাল পরিবর্ত্তন ঘটিল! এই ঘূর্ণমান আধারের মধ্যে সামান্য স্বাভাবিক নিয়মে টিকেট যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, সেই সামান্য কারণই কি এই বৃহৎ ঘটনার পক্ষে যথেষ্ট? ইহার কি কারণান্তর নাই?—মানুষ তাহা সহজে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে না, কারণান্তর আছে বলিয়া মনে করে; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে আমাদের প্রবৃত্তি আছে, প্রকৃতির প্রবৃত্তি নাই। যথোপযুক্ত কারণ ব্যতীত অবশ্যই কোন কার্য্য হয় না। তবে এস্থলে

এ সামান্য কারণে এরূপ বৃহৎ কার্য্য সংঘটিত হইল কেন? কারণ যেমন সামান্য কার্য্য তদ্রূপ সামান্যই হইয়াছে, একখানি টিকেটের সহিত আর একখানি টিকেট উঠিয়াছে। তবে এ সামান্য কারণের দ্বারা সংঘটিত কার্য্য যে এত বৃহৎ দেখায়, তাহার কারণ এই যে, আমাদের প্রবৃত্তির ভিতর প্রতিফলিত হইয়াই এরূপ বৃহৎ দেখায়; আর কিছুই নহে। এই জন্যই লোকে অদৃষ্টের কল্পনা করে। এই কল্পনার মূলে একটা বিশ্বাস অছে, তাহা এই: প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ, রাজা বা বিচারকের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষ, এই জগতে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, রাজা বা বিচারকের সহিত সেই কর্ত্তার আদৌ সাদৃশ্য নাই; তিনি কাহারও সুখে সুখী হয়েন না, দুঃখেও দুঃখিত হয়েন না, দরিদ্র ও ধনবান তাঁহার নিকট একই; তাঁহার বিচারও নাই অবিচারও নাই, তাঁহার দয়াও নাই, নিষ্ঠুরতাও নাই; জগতের এই সমস্ত ব্যাপার আমাদিগকে যে ভাবে মুগ্ধ করে, তাঁহাকে সে ভাবে বা কোন ভাবেই মুগ্ধ করে না।

কাল কার্য্যকরী শক্তি নহে।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, "কালের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা," "কালের কি অসীম ক্ষমতা," "কালসহকারে সমস্তই ঘটিয়া থাকে;" যেন কাল কোন কার্য্যকরী শক্তি। যে যোজনব্যাপি দুর্গপ্রাচীর আজ নির্জ্জন, ভগ্ন অবস্থায় বিলুণ্ঠিত থাকিয়া কোন অতীত সাম্রাজ্যের পরিচয় ঘোষণা করিতেছে, যে উন্নত জয়স্তম্ভ আজ বিধ্বস্ত অবস্থাতেও অতীত গৌরবের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা কালের অসীম ক্ষমতার কথা চিন্তা করিতে করিতে বিভোর হইয়া যাই। কি ছিল আর কি হইয়াছে, আবার কি হইবে; কে বলিতে পারে! কালের মাহাত্ম্য কে বুঝিতে পারে! এই মহৎ চিন্তাস্রোত আজ এক বৈজ্ঞানিক বামনের অঙ্গে প্রহত হইয়া প্রত্যাহত হইল। সে দেখাইল, ঐ যে দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাচীর, শত্রুচালিত যন্ত্র উহার ধ্বংস করিয়াছে, ঝটিকাবৃষ্টিবজ্রাঘাত উহার ধ্বংস করিয়াছে; সে দেখাইল সামান্য কীটাণু, উদ্ভিদ, এই ধ্বংস কার্য্যে

সাহায্য করিয়াছে; কিন্তু সেই মহিষবাহন দণ্ডধরের দণ্ড ইহার একখানি ক্ষুদ্র প্রস্তরও স্থানচ্যুত করিতে পারে না; কাল, কারণ কার্য্যে পরিণত হইবার আনুসঙ্গিক অবস্থা মাত্র; ইহার স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব নাই।

মণি মন্ত্র ঔষধির

কার্য্যকরী শক্তিতে অনেকে অযথা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। বন্য-জাতির মধ্যে এ বিশ্বাস বিশেষ প্রচলিত দেখা যায়; যেখানে বিজ্ঞানের জ্ঞান যে পরিমাণে বিরল, সেখানে এ বিশ্বাস সেই পরিমাণে প্রবল। ইহার মধ্যে মন্ত্রেরই প্রাধান্য; মন্ত্র কি?---মনুষ্যমুখোচ্চারিত শব্দ বিশেষ। মনুষ্যের শব্দ উচ্চারণ করিবার কারণ কি দেখা যাউক। নিজের মনের ভাব অন্যকে জানাইয়া দেওয়ার আবশ্যকতা ইহার কারণ। এই উদ্দেশ্যের সফলতার জন্যই শব্দশাস্ত্রের সৃষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি। তবেই ইহার কার্য্যকরী শক্তি হইতেছে—ভাববিনিময়। জড়জগতের উপর ইহা কি করিয়া কার্য্যকরী হইতে পারে, তাহা আদৌ অনুমেয় নহে। তবে লোকের এরূপ বিশ্বাসের কারণ সহজেই অনুমেয়। পূর্ব্বে জড়জগতের অষ্টেপৃষ্ঠেললাটে দেবতাগণ বিরাজ করিতেন; কোথাও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কোথাও বা বটবৃক্ষাধিষ্ঠিত সামান্য ব্রহ্মদৈত্য। ইহাদের প্রকৃতি অনেকটা মানুষেরই অনুরূপ; ভয় দেখাইলে ভয় পায়, তোষামদ করিলে তুষ্ট হয়; নিতান্ত পক্ষে একান্ত আত্মসমর্পণ করিয়া কাঁদাকাটি করিলে কিঞ্চিৎ দয়া করিলেও করিতে পারে।*

কিন্তু হায়! সেই কাল, যাহার কোন ক্ষমতা নাই, দেবতাগণের মাথা সেই খাইয়াছে—তন্ত্র মন্ত্র শুনিবে কে? জড়ের কি কাণ আছে না দয়া-মায়া আছে? বলা যাউক, আছে; ঝড়ের চৈতন্য আছে, মেঘের আছে, ব্যাধির যে কীটাণু তাহারও আছে; কিন্তু তবুও কিঞ্চিৎ গোল রহিয়া যাইতেছে। তাহাদের চৈতন্য কি আমাদের ন্যায়? তাহাদের হৃদয়

---

* (ক) "ভূতপ্রেত পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্রভূতলে।"
প্রসন্নাঃ পরিতুষ্টাস্তে প্রতিগৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্॥

—দেবীপুরাণ ভূতার্পণ প্রকরণ।

কি আমাদেরই ন্যায়? তাহারা আমাদের ভাষা বুঝিবে? বুঝিলে কিন্তু ইহারা অদ্বিতীয় ভাষাবিৎ বটে। ইহারা বর্ত্তমানে যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত আছে তাহা সমস্ত জানে, অতীতকালে যে সমস্ত লুপ্ত ভাষায় মন্ত্র-পঠিত হইত, তাহাতেও বিশেষ পারদর্শী; তবে আজকাল বোধ হয় সংস্কৃত ভুলিয়া গিয়াছে, নচেৎ কাণের মাথা খাইয়াছে।

অবশিষ্ট রহিল যোগ। ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যাঁহারা অযথা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, শতযুক্তিতেও তাহা দূর করা যাইবে না। সে সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা স্থানান্তরে বলা যাইবে।

এই অংশের উপসংহারে, ক্রমবিকাশবাদ সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা একত্র করিয়া দেখিলে, পৌনঃপনিক সৃষ্টিবাদের স্থলে এই তত্ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। এই তত্ত্বে এতক্ষণ আমরা জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর উৎপত্তি আলোচনা করিয়াছি; এখন মানুষ্যের মনোজগতের ক্রমবিকাশ আলোচনা করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কি চাই?

(প্রবৃত্তির ক্রমবিকাশ)

১। প্রবৃত্তি সর্ব্বময়।

মানুষ কি চায়? চায় অনেক রকম; তবে এমন একটা বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহার ঈক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদের অভাব—খাইতে চায়। সত্যত্রেতাদি স্বর্ণযুগে মতভেদ থাকিতে পারিত, ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি আহার অপেক্ষা বায়ুপানকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকিতে পারিতেন, কিন্তু এ ছার কলিযুগে বায়ুর রাসায়নিক উপযোগিতা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক গোলযোগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পক্ষে আমাদের প্রশ্নকে সংশোধিত আকারে উপস্থিত করা যাউক—আমরা কি চাই? এ সংস্কৃত প্রশ্নের একবাক্যে উত্তর যাহা হইবে তাহা ঐ—খাইতে চাই। আচ্ছা খাইলাম, চর্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয়াদিতে উদরকে আকণ্ঠা বোঝাই করিলাম; আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হইল কি?—মনের ক্ষুধা মিটিল কি? —ঈক্ষণের সমাধি হইল কি? হইল না। দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইল—ঘুমাইতে চাই। প্রথম আকাঙ্ক্ষাকে যে পরিমাণে নিবৃত্ত করা হইয়াছে, এই দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষার সেই পরিমাণ প্রাবল্য উপস্থিত হইবে। না হয় ইহারও নিবৃত্তি করা গেল, কুম্ভকর্ণকে লাঞ্ছিত করিয়া চক্ষুরুন্মিলন করা গেল; আকাঙ্ক্ষার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না। তৎক্ষণাৎ, হাই তুলিতে না তুলিতে, আবার আকাঙ্ক্ষার স্রোত আসিয়া ভাসাইয়া লইয়া চলিল। লৌকিক একটা তৃতীয় রকম আকাঙ্ক্ষা আছে—এ স্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক- ধর, তাহারও যথেষ্ট চর্চ্চা করা গেল; তৃপ্তি হইল কি?—মনুষ্যের মনের স্তরে স্তরে লুক্কায়িত শত শত আশা উকি ঝুকি মারিতে নিবৃত্ত হইল কি? আকাঙ্ক্ষার বন্ধন ঘুচিল কি?

এই জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে বিনাশের ব্যবস্থা দিয়া

গিয়াছেন। কিন্তু, হায়, মহাস্থবির! তুমিও যে রক্তমাংসের দ্বারা গঠিত! তোমারও যে দেহে উষ্ণতার আবশ্যক, ধমনীতে চাঞ্চল্যের আবশ্যক! অনেকে হয়ত তাহা স্বীকার করিবেন না, অনেকে হয়ত বলিবেন, যোগবলে তাঁহারা অসাধ্য সাধন করিতেন; রক্তকে জল ও মাংসকে পাথর করিয়া ফেলিয়াও বাঁচিয়া থাকিতেন। উত্তম, তাহাই করুন। আমিই বা তাহাতে সন্দিহান হইয়া নিজের পারলৌকিক সদ্গতির বাধা জন্মাই কেন? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহা করিয়াই কি তুমি—কঠ-ঈশ-মাণ্ডুক! আকাঙ্ক্ষার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ বা পরিত্রাণ পাইতে চাও? মরিলেই ত ইহার সর্ব্বত্র-প্রসারিত গ্রাস হইতে মুক্ত হওয়া যায়। না, আবার বুঝি পুনর্জ্জন্ম আছে, আবার বুঝি এই ক্ষণবিধ্বংসী কায়ের মধ্যে অবিনাশী কেহ আছে, তাহার বুঝি আবার একটা বাসস্থানের আবশ্যকতা আছে! তাহা হইলে মরণ তোমার পক্ষে মুক্তি নহে। যাহা হউক তোমাকে আমি এরূপ বর প্রদান করিতেছি যে তুমি সর্ব্বাংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হও, চাহিবে কি?

বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণের অর্থ কি? ইহা কি সর্ব্বাংশে ধ্বংস প্রাপ্তি? আশ্চর্য্য নহে; কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বর। যাহার ঈশ্বর নাই, সে জরামরণ-প্রবণ দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আর কি করিবে? কোথায় যাইবে? কোথায় আর যাওয়া তার সম্ভব? তাই বলি বৌদ্ধের নির্ব্বাণ মুক্তির অর্থ যাহাই হউক, হিন্দুর মুক্তির অর্থ তাহা নহে। হিন্দুর পক্ষে সেরা মুক্তি—সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য। এখন কথা হইতেছে, তুমি যাহাই চাও তাহাই আকাঙ্ক্ষা। আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বেদান্ত সূত্রকারও ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। তাঁহার সহিত ও তোমার আমার সহিত কেবল ইহাই পার্থক্য হইতেছে যে, ঈপ্সিত বস্তু এক নহে; তুমি আমি ধন ধান্য চাই, পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া নিজে খাইতে চাই, বড় বেশী উচুতে উঠিলাম ত উপাধি চাই, সম্মান চাই, পাঞ্চভৌতিক দেহ ধ্বংস হইলেও মর্ম্মর দেহে জীবিত থাকিতে চাই; কারণ ইহাপেক্ষা উচ্চতর আর কিছু জানি না, শিখি নাই, চাহিতে কল্পনায় যোগায় না; কারণ ইহাও ত যোটে না। মাননীয় সূত্রকার মহাশয়

অবশ্য তাহা চান না, কিন্তু এস্থলে ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে, দেহধারী জীব আকাঙ্ক্ষা হইতে কখনও পরিত্রাণ পাইতে পারে না।

এ স্থলে বৌদ্ধের নির্ব্বাণ মুক্তির বিষয়টা ভাল করিয়া দেখা যাউক। আমি বলিব ইহাও একপ্রকার আকাঙ্ক্ষা। জীব যখন জীবনসংগ্রামে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়ে, দুঃখদারিদ্র্য দৈন্ত ও জরা যখন তাহাকে বিশেষরূপে পীড়িত করিয়া তোলে, তখন তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয় কি হয়?—মুক্তি। পাঠক মনে রাখিবেন এইরূপ ক্লিষ্টতা কেবল ব্যক্তিগত মনুষ্যেই সম্ভব তাহা নহে, সমাজবদ্ধ মনুষ্যেরও এ অবস্থা হয়। বৌদ্ধের নির্ব্বাণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—যদি এ পর্য্যন্ত কোন বৌদ্ধ প্রকৃতই সুস্থ শরীরে, স্বচ্ছন্দচিত্তে, অন্তের বিনা অনুরোধে, এইরূপ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন—তবে আমি তাহা এই অবস্থার সামাজিক উদ্বেগ বলিব।

কথাটা যখন পাড়া গিয়াছে তখন ভাল করিয়া আলোচনা করা যাউক। ব্যক্তি বিশেষের সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভাগ যখন বেশী হইয়া পড়ে, তখন সে দেহ ধারণ হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে। শুধু দুঃখের আতিশয্য হইলেই হইবে না; এই দুঃখ অবসানের আশা করিবারও কোন পথ না থাকে, ভবিষ্যৎও নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখনই মুক্তি বা ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। যে রোগী রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে সেও হঠাৎ মরিতে চাহে না। তবে মরিতে চায় কখন? যখন এ যন্ত্রণা নিবৃত্তির আশা থাকে না। সমাজসংস্কারকও সমাজের এই অবস্থাতেই বিশুদ্ধ নির্ব্বাণের উপদেশ দেন এবং সমাজেরও নিম্ন অবস্থাতেই তাহা গৃহীত হয়।

এখনই আপত্তি হইবে যে বুদ্ধদেবের অভ্যুত্থান যে সময়ে হইয়াছিল সে সময় ভারতের বিশেষ অবনতির অবস্থা বলা যাইতে পারে না; বুদ্ধদেব কেন নির্ব্বাণ মুক্তির ব্যবস্থা করিলেন এবং সমাজই বা তাহা গ্রহণ করিল কেন? ইহার একমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে:—সে সময়ের সাধারণ মনুষ্য হইতে বুদ্ধদেবের হৃদয়ের উচ্চতা। আদিম মনুষ্যসমাজ, তদন্তর্গত ব্যক্তিগণের দ্বারা বিশেষভাবে গঠিত হয় না। প্রকৃতি—অর্থাৎ এই সমাজ যে অবস্থার মধ্যে স্থিত হয়—তাহাই

তাহাকে বিশেষরূপে গড়িয়া তুলে ; মানুষ স্বাধীন চেষ্টার দ্বারা এই সমাজের অত্যল্পাংশই গঠিত করে। এই আদিম অবস্থার সমাজে ধ্বংসবাদ পরিলক্ষিত হয় না ; জীবন এ সমাজে নিতান্তই অনন্ত দুঃখের কারণ স্বরূপ প্রতীয়মান হয় না। মানুষের মনের উন্নতির অনুপাত অনুসারে, প্রকৃতিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, সেই মন সমাজগঠনে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে। প্রকৃতি অপেক্ষা মধ্যযুগের মানবের মন, অনেকাংশে এই সমাজগঠনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী না হইয়া তদ্‌বিপরীত হইয়াছে দেখা যায়। আগে যেখানে অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধক্ষমতাপন্ন ভূতপ্রেতাদির সন্তুষ্টিকল্পে সামান্য ক্রিয়াকলাপ প্রচলিত ছিল, তাহা বহুবিস্তৃত করিয়া মনুষ্য জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইল। বহুজনাকীর্ণ বিস্তৃতসম্পংশালী নগরী মুহূর্ত্তেকে জলপ্লাবনে কোথায় চলিয়া যায়! ভীষণ মহামারিতে আক্রান্ত হইয়া অরণ্যে পরিণত হয়! মনসাদেবী কখন কাহার একমাত্র প্রিয়পুত্রের উপর দৃষ্টিপাত করেন! বাসন্তী কখন কাহার প্রাণস্বরূপা প্রিয়পত্নীর উপর প্রসন্না হয়েন! ইঁহাদের অপেক্ষা মানুষের প্রবল শত্রু মানুষ নিজে ; দস্যুতস্কর কখন কাহার সর্ব্বনাশ করে তাহার স্থিরতা নাই! রাজনৈতিক দস্যু—রাজা বা ততোধিক নির্ম্মম উপরাজা, রাজ-অনুচর—কখন স্ত্রী কন্যাকে টানিয়া লইয়া যায় তাহার স্থিরতা নাই! মরুভূমির প্রান্ত বা পর্ব্বতকন্দর হইতে, শোণিতলোলুপ বর্ব্বর জাতি পঙ্গপালের ন্যায় কখন সমাজের উপর পড়িয়া ছারখার করে তাহার স্থিরতা নাই। ইহার উপর আবার আধিভৌতিক অত্যাচার আছে ; কোটি কোটি উপদেবতা সদাসর্ব্বদা সংসারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্ত বিপৎপাত এক বৎসরের জন্য নহে, দশ বৎসরের জন্য নহে, শত বৎসরের জন্য নহে, এক জীবনের জন্য নহে, লক্ষ লক্ষ জন্ম, কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া অনন্ত যন্ত্রণাদায়ক। এরূপ অবস্থার মধ্যে থাকিয়া উচ্চহৃদয়বিশিষ্ট জীব কি ভাবে ভাবিবে? সে সময়ের সমাজের চিত্রটা পুনরায় মনের ভিতর অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা যাউক। ধর্ম্মের অবস্থা তখন কিরূপ? অর্থহীন, অকার্য্যকর, যাগযজ্ঞবহুল আচরণই ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে ; এই যাগযজ্ঞের

দ্বারা সাধারণ সমাজের যে কেবল মাত্র কোন মঙ্গল সাধিত হইতেছে না, তাহা নহে, অশেষরূপ অমঙ্গল হইতেছে; প্রকৃত ধর্ম্মের চর্চ্চা, নৈতিক উৎকর্ষতা, প্রকৃতিকে বুঝিবার বা প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা প্রকৃতিকে জীবন ধারণের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা, করা হইতেছে না; ধর্ম্মের অবমাননা, নীতির অবনতি ও প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা হইতেছে। বলিরূপ নৃশংসতা ইত্যাদি যে সমস্ত ক্ষুদ্র অমঙ্গল হইতেছে, তাহার আর সবিস্তার উল্লেখ অনাবশ্যক। সে সময়ের ধর্ম্মযাজকের অবস্থা কিরূপ? যেন তেন উদরপূর্ত্তি। রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ? নিরবচ্ছিন্ন রক্তপাত, হিংসা দ্বেষ, স্বার্থপরতা, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার। এরূপ সামাজিক অবস্থা তখন যে কেবল ভারতবর্ষে ছিল তাহা নহে, পৃথিবীর সমস্ত সমাজেরই অল্পবিস্তররূপে এই অবস্থা। অত্যন্ত দয়াপ্রবণচিত্ত এইরূপ সমাজের মধ্যে জন্মিয়া ভাবে ভাবিবে? সর্ব্বং শূন্যং, সর্ব্বং দুঃখং; তবে ভরসাস্থল এই র্ব্বং ক্ষণিকং ইহার অবসান আছে, ধ্বংসে বা নির্ব্বাণে ইহার হাই হইল ইউরোপীয় Pessimism বা দুঃখবাদ। তখনকার সমা মূলমন্ত্র হইতেছে স্বার্থ, এই মূলমন্ত্র সাধনের পন্থা হইতেছে সংহার, চরিতার্থতা হইতেছে পাশব; কাজেই যে মনীষী সমাজের উপযোগী হৃদয় লইয়া না জন্মাইয়া অনেক উচ্চতর হৃদয় লইয়া জন্মিয়াছিলেন, তিনি এ সমাজের এই শ্রেণীর জীবের পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন নাই, নির্ব্ব্যূঢ় ধ্বংসের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এখন কথা হইতেছে, মনুষ্যপ্রকৃতির যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাস্রোত তাহা সর্ব্বাংশে প্রতিহত করিবার পক্ষে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা করিয়াও বৌদ্ধধর্ম্ম কি কারণে অর্দ্ধজগৎ জয় করিল? যখন সমুদ্র পর্ব্বতাদির বাধা লঙ্ঘন করিয়া এই ধর্ম্ম দেশ দেশান্তরে আপনার বিজয় পতাকা রোপণ করিতে পারিয়াছে, তখন আকাঙ্ক্ষার বিনাশ হইতে পারে না, তাহা স্বাভাবিক নহে বা তাহা বাঞ্ছনীয় নহে, কি করিয়া বলা যাইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট বলিয়া অনেকে মনে করিবেন। যদি কেহ সন্দেহ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত না থাকেন, তাঁহাকে বলিব—বৌদ্ধধর্ম্ম যে বহুবিস্তৃতিলাভ করিয়াছে তাহা এই নির্ব্বাণ মুক্তির

ব্যবস্থার জন্য নহে, এ ব্যবস্থার অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও এই বিস্তার হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত জগতে যত ধর্ম্মের প্রচার করা হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত ধর্ম্মের মূলমন্ত্র যাহা, তাহা সমস্তই বৌদ্ধধর্ম্মে আছে; বরং অনেক বিষয়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্মেই ঐ বিষয় সর্ব্বাগ্রে প্রচার হয় এবং উহাতেই তাহা উত্তমরূপে সন্নিবেশিত আছে। একথাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে একটা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের প্রচার জন্য প্রয়াস প্রথমত এই ধর্ম্ম হইতেই হয়; অশোক পৃথিবীর প্রথম এবং অদ্বিতীয় প্রচারক। আবার এ প্রচার কার্য্যের প্রণালীও দেখিতে হইবে, ইহা অস্ত্রের সাহায্যে নহে, প্রীতির সাহায্যে। অশোকের ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য জগতের এক অদ্ভুত ব্যাপার। রাজশক্তির দ্বারা জগতের এত কল্যাণ আর কখনও সাধিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। রাজাকে এবং দেবতাকে একই চক্ষে সাধারণ লোকে দেখিয়াছে; সকল রাজাই দেবতার ন্যায় আচরণ করিয়া যাইতে [illegible]ারেন নাই; তবে বোধ হয় কোন দেবতাও সেই দেবানং প্রিয়দর্শীকে দে[illegible] পরাভূত করিতে পারেন নাই।

ধর্ম্মের মূলমন্ত্রগুলি কি? একটা [illegible] মন্ত্র প্রীতি; অর্থাৎ স্বার্থের স্থলে পরার্থকে প্রতিষ্ঠা, ভোগের স্থলে [illegible]সবাকে স্থাপনা করা, হিংসার স্থলে দয়ার অবতারণা করা। বৌদ্ধধর্ম্মে ইহার কতদূর প্রসার হইয়াছে বলা নিষ্প্রয়োজন। আর একটি মূলমন্ত্র হইতেছে কল্পনাকে সজীব রাখা। তুমি আমি বিষয় ভোগে সর্ব্বদাই লিপ্ত, সুখ অন্বেষণে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, জড়কে লইয়াই দিবানিশি মত্ত; মনে করি যে পার্থিব বা ঐহিক সুখস্বচ্ছন্দতাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ভুলিয়া যাই যে জড়রূপই প্রকৃতিনর্ত্তকীর একমাত্র ভূষা নহে, ইহার আরও বিচিত্র রূপ থাকিতে পারে। আছে কি না, দৈহিক সুখস্বচ্ছন্দতা ভিন্ন জীবনের অন্য সার্থকতা আছে কি না, জানি না, প্রমাণ হয় নাই। কিন্তু মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। প্রমাণকে অতিক্রম করিয়াও বিচিত্র জগতের কল্পনা হইতে মনুষ্যের মনকে কেহ কখন নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। Utilitarian পারেন নাই, Humanitarian পারেন নাই, বৈজ্ঞানিক পারেন নাই, চার্ব্বাক পারেন নাই। এই যে অনন্তমুখী কল্পনা, ইহাকে জাগ্রত রাখাও ধর্ম্ম বিশ্বাসের একটা কর্ত্তব্য কার্য্য। বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা এ কার্য্যও সাধিত

হইয়াছে। অতএব আমি বলিব যে, এই ধর্ম্ম, ধ্বংসরূপ নির্ব্বাণবাদের দ্বারা কলেবর বিস্তার করিয়াছে তাহা নহে, এই অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও, ইহার অন্যান্য মহৎ গুণে, কৃতকার্য্য হইয়াছে। এই যে ধ্বংসবাদ, এই যে আকাঙ্ক্ষার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার চেষ্টা, ইহা এই ধর্ম্মের ক্ষুদ্র কলঙ্ক; অর্দ্ধ জগৎ জয় করিয়াও যে এই ধর্ম্ম জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহারও কারণ ইহাই। ইহার ভিতরেও আকাঙ্ক্ষা কিরূপে আপনার সিংহাসন স্থাপন করিয়াছে তাহা বৌদ্ধদিগের, ঈশ্বরে না হইয়া, বুদ্ধে সালোক্য সাযুজ্য ইত্যাদি বাদেই প্রকাশ পাইতেছে।

সাংখ্য।

আমরা আরও দেখিতে পাই, বুদ্ধদেবের অগ্রগামী, কপিলও সম্পূর্ণ দুঃখবাদী।

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।

এই ত হইল আরম্ভ।

প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারব [illegible] তীকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বং।

প্রতিদিন ক্ষুধা পায়, প্রতি[illegible] ক্ষুন্নিবৃত্তিদ্বারা তাহার প্রতীকার করিতে হয়। সাধারণ উপায়ে, এই দুঃখের সাময়িক প্রতীকার মাত্র হইতে পারে, অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না; অতএব সাধারণ উপায় পরমপুরুষার্থ নহে। যাহাতে দুঃখের এককালীন নাশ হয় তাহাই পরম-পুরুষার্থ। এখন এই পুরুষার্থ কি?

জ্ঞানিনাজ্ঞাননাবাপি যাবদ্দেহস্যধারণম্।
তাবদ্বর্ণাশ্রমং প্রোক্তং কর্ত্তব্যোকর্ম্মমুক্তয়ে॥

জ্ঞানী হউন আর অজ্ঞানীই হউন, যতদিন দেহ ততদিন কর্ম্মভোগ অবশ্যম্ভাবী; তাহা হইতে নিষ্কৃতি নাই। তবে জ্ঞানী, প্রারব্ধকর্ম্ম ক্ষয় হইলেই, মুক্তিলাভ করিবেন; আর যে অজ্ঞানী, সে তাহা পারিবে না; তাহাকে পুনঃরায় কর্ম্মের বীজবপন করিতে হইবে, জন্মগ্রহণ করিয়া ক্লেশ-ভোগ করিতে হইবে।

সাংখ্যের মতে জ্ঞান কি, তাহার আলোচনা আমাদের নিষ্প্রয়োজন।

সাংখ্যকারের মতামত লইয়া আমাদের প্রয়োজন নাই, তাঁহার মনের ভাব লইয়াই আমাদের প্রয়োজন; তিনি কি ভাবে ভাবিয়াছিলেন এবং কেন এরূপ ভাবিয়াছিলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধানই আমাদের আবশ্যক। শাস্ত্রকারগণের লিখিত বিষয় মধ্যে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌ট মিথ্যা, কোন সত্য আছে কিনা, নির্ণয় করা অপেক্ষা, আর একটি সত্য সমধিক মূল্যবান; তাঁহাদের লেখার মধ্যে শত শত অসত্য থাকিলেও, তাঁহারা যে ঐ ভাবে ভাবিয়াছিলেন ইহা অবিসংবাদিতরূপে সত্য। ব্যবসায়ের খাতিরে অনেক সময় মনোভাব রূপান্তরিত করিয়া প্রকাশ অবশ্যই করিয়াছিলেন; তবে যে স্থানে তাহা ঘটে নাই, সে স্থলে ঐরূপ সত্য যে রহিয়াছে তাহা নিশ্চয়; এবং এই ঐতিহাসিক সত্যই বিশেষ মূল্যবান। প্রাচীনেরা যে ভাবে ভাবিয়াছিলেন তাহার স্বাভাবিক সত্যতা অনেকাংশে চলিয়া গি[illegible] [illegible]মরা যে ভাবে ভাবিতেছি কালে তাহার সত্যতা অনেকাংশে চলিয়া[illegible] কেবল এই ঐতিহাসিক সত্যতাই চিরদিন থাকিয়া যাইবে; [illegible]র সত্যতা না থাকিলেও তাহার মূল্য থাকিয়া যাইবে। এই [illegible]বেদাদি অমূল্য; অতি প্রাচীন সময়ের ভাবস্রোত আর কোথাও [illegible]রূপে লিপিবদ্ধ হইতে দেখা যায় না। প্রাচীন ভারতের দার্শনিক ভা[illegible], প্রাচীন গ্রীস ও মধ্যযুগের ইউরোপের দার্শনিক ভাবস্রোতের অনু[illegible] হইলেও, বিশেষত্ব আছে। যখন এক আর্য্যজাতি, একই কিম্বদন্তি (tra[illegible]ion) লইয়া, বিভিন্নস্থানে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তখন নিম্নলিখিত কারণে এই [illegible]েষত্ব জন্মিবে :—

১। স্থানের পার্থক্য।

২। সময়ের পার্থক্য; অর্থাৎ ঐ সময়ে জাতীয় জ্ঞান যে অবস্থায় উঠিয়াছিল তজ্জনিত পার্থক্য।

৩। পার্শ্ববর্ত্তী জাতি সমূহের সংস্পর্শ জনিত পার্থক্য।

স্থানীয় পার্থক্যের ফল এই হইতে পারে; গ্রীষ্মাতিশয্যতা বশত শক্তির হ্রাস; পূর্ব্ব সংস্কার ত্যাগ করিয়া নূতন পথে বিচরণ করিবার পক্ষে অনিচ্ছা। সাময়িক পার্থক্যের বিশেষ বিচার না করিয়া তৃতীয় পার্থক্যের বিচার করা যাউক। গ্রীস ইত্যাদি স্থল অপেক্ষা ভারতা-

ভ্যাগত আর্য্যজাতি অপেক্ষাকৃত উন্নতজাতি সমূহের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, ইহা মনে করিবার কারণ আছে; সে সময়েও ভারতবর্ষ, সভ্যতার প্রথম উপাদানসমূহ সংগ্রহের অধিকতর উপযোগী ছিল মনে করিতে হইবে। না থাকিলেই বা, এ স্থলে আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে দর্শন বিজ্ঞানাদির সৃষ্টি করিবেন কেন? এই পার্শ্ববর্ত্তীজাতি হইতে তাঁহারা কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছিলেন; ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এক শ্রেণীর মতানুসারে জন্মান্তরবাদ তাহার একটি। অবশ্য, এই বিশ্বাস তখন এবং এখন, সমস্ত বর্ব্বর জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে; কিন্তু ইউরোপ অপেক্ষা জন্মান্তরবাদ ভারতীয় আর্য্যগণের মন এত মুগ্ধ কেন করিল, তাহা অনুসন্ধানের বিষয় বটে। যে কারণেই হউক, এই বিশ্বাস সর্ব্বশ্রেণীর ভাবুকের মনে বিশেষ প্রবল হইয়াছিল; ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে এরূপ প্রাবল্য আদৌ দেখা যায় না। এই এক... কারণে ভারতের জাতীয় চিন্তাস্রোত বহুলপরিমাণে ভিন্নপথগামী পড়িয়াছিল। এই জীবন, বহুজীবনের একটি অঙ্কমাত্র; ইউ জীবনে একবারই কার্য্য হইবে, তাহা [illegible] স্থায়ী—হয় অনুরূপ। এস্থলে তাহা নহে; বহু [illegible] করিতে হইবে; স্থায়ীফল এক জী[illegible] বহুজীবনের সাধনা দ্বারা তাহা লাভ [illegible] সে, যেদিন যাহা উপার্জ্জন করে তাহা [illegible] সঞ্চয় করে; ভবিষ্যৎ সুখের আশায় [illegible] করে। আমাদের দর্শন ও ধর্ম্মপ্রচ[illegible] অতীব প্রবল; বর্ত্তমান জীবনের [illegible]ংকরতা সম্বন্ধে দৃঢ়। একমাত্র জন্মান্তরবাদ ভারতের চিন্তাস্রোত এইরূপে চালিত করিয়াছে। আমাদের জীবন যেন এক দিনের উপার্জ্জিত তাহা ভোগ করা যাইবে না, তাহার সামর্থ্য (possibilities) এ জীবনের জন্য ব্যয় করা হইবে না, পরজীবনের জন্য সঞ্চয় করিতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে, খৃষ্টিয়ানের যখন পরকাল রহিয়াছে, তখন তাহারও এইরূপ সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হইবার বাধা নাই—চিন্তাস্রোত বিভিন্নমুখী হইবে

না। উত্তরে বলা যায় যে, একমাত্র ধর্ম্মের দিক দিয়া আমরা দেখিতেছি না, দর্শনের দিক দিয়া দেখিতেছি। ধর্ম্মবিশ্বাসের স্থলে এরূপ বিভিন্নতা হইবার কারণ না থাকিলেও, কপিল হইতে সক্রেটিস, তাহা হইতে ডেকার্ট প্রমুখ দার্শনিকগণ অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসবিশিষ্ট ছিলেন না। সর্ব্বত্রই দর্শন, ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। কপিল ঈশ্বরকে মানেন নাই—স্বর্গনরকপরকাল ত দূরের কথা * কিন্তু জন্মান্তরবাদ তখন এতই দৃঢ়সংবদ্ধ যে তাহা মানিয়াছেন। কাজেই তাঁহার ও পরবর্ত্তী অন্যান্য দার্শনিকের চিন্তা, এই বিশ্বাসদ্বারা ভিন্ন পথে চালিত হইয়াছে; দুঃখভোগজনিত ত্রাস হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেবল মাত্র দুঃখনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াই কেহ কেহ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। জীবনের লক্ষস্থলকে সুখ দুঃখ ছাড়াইয়া অত্যন্ত উচ্চে উঠাইয়াছেন ... লক্ষস্থল হইতে তাহা অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। ... উদ্দেশ্য সাধন করা যায়, বহু জীবনের সমবেত ...ব উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে; এই জন্যই ...ল অনেক উচ্চে উঠিয়াছে—বেশী উচ্চ ... তখনকার সমাজের অবস্থানুসারে, ...র্য্য করিত, তাহার অনেকাংশ উচ্চ- ...না; অপরাংশ—যাহা আহারনিদ্রা সুখ- ...না হইলেও, কল্পনাকে সম্পূর্ণ চরিতার্থ করিবার ...এব একটা কাল্পনিক লক্ষ্যস্থল আবিষ্কৃত হইল

...কন্তু নিতান্তই দুঃখবাদী। তাঁহার লক্ষ্যতে সুখের সংস্পর্শ ...খের নিবৃত্তি মাত্র আছে। আশার বিদ্যুৎছটা এই দর্শনের আবিল ...ন্ধকার কোথাও উন্মোচন করে না। জন্মান্তরবাদে যদি বিশ্বাস করা না যায়, তবে সাংখ্যের বর্ণিত পথ অপেক্ষা, এই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইবার অতি

---

* প্রাচীন সাংখ্যসূত্রে সামান্যই পাওয়া যায়। আধুনিক সাংখ্য দর্শনের পুস্তকে যাহাই থাকুক, তাহাতে এ কথা অপ্রমাণিত হইতেছে বলিয়া আমি স্বীকার করি না।

সহজ পথই আছে—আত্মহত্যা। জন্মান্তরে বিশ্বাস করিলেও, আর এ আধুনিক সভ্যতার যুগে সাংখ্যের লক্ষ্য আমাদিগকে মোহিত করিতে পারে না। মোক্ষ যদি কোন সুখের অবস্থাই না হইল, কেবল মাত্র দুঃখ-বিহীন অবস্থা হইল, তবে তাহা পাইয়া কি হইবে? যদি কেহ এমন অবস্থার সন্ধান দিতে পারেন, যাহাতে শুধু দুঃখ নাই এরূপ নহে, সুখ আছে; তবে তাহাই আদরণীয় হইবে। এরূপ অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায় কিনা দেখিতে হইবে এবং স্মরণ রাখিতে হইবে, যদি পাওয়া যায় এবং প্রবৃত্তির ধ্বংস না করিয়াও পাওয়া যায়, তবে তাহা ধ্বংসের জন্য কেহ লালায়িত হইবে না। যদি মোক্ষ কোনরূপ উচ্চতর সুখের অবস্থা হয় তবে ত সাংখ্যও বিশেষরূপে প্রবৃত্তিমান্। জন্মান্তরবাদই ভারতবর্ষে দুঃখবাদের বহুবিস্তৃতির কারণ, ইহাই সাংখ্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহার সারাংশ।

বৈশেষিক বা ঔলুক্য দর্শন।

দুইটা পরমাণু সংযোগে একটা দ্ব্যণুক, তিনটা দ্ব্যণুকের সংযোগে একটী ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। এই দর্শন রীতিমত বিজ্ঞান (science); দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে ইহার বিশেষ চর্চ্চা না হইয়া, ন্যায়, বেদান্ত ইত্যাদির বহুল চর্চ্চা হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহারও উদ্দেশ্য মুক্তি।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যস্ত।

এই মনন অনুমান সাধ্য, অনুমান আবার ব্যাপ্তি জ্ঞানের অধীন, ব্যাপ্তিজ্ঞান পদার্থতত্ত্বজ্ঞান সাপেক্ষ, সুতরাং পদার্থতত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ নহে, পরম্পরায় নিঃশ্রেয়স্ বা মুক্তির কারণ। গুরুবস্তু পৃথিবীতে আকর্ষিত হয়; একথা কণাদ স্পষ্ট বলিয়াছেন। এই মতে পদার্থকে এত সূক্ষ্মরূপে বিভাগ করা যাইতে পারে যে তাহার আর বিভাগ হয় না—তাহাই পরমাণু। ইহা দেখা যায় না, অনুভব করা যায় না, কিন্তু অনুমান করা যায়। পরমাণুর অবয়ব নাই, তাহার সমষ্টির অবয়ব হয়। পাশ্চাত্য ন্যায়ের মতে তাহা হইতে পারে না। বৈশিষিক দর্শনোক্ত মোক্ষ কিরূপ?

ইহা কি কেবলমাত্র দুঃখের নিবৃত্তি, না আরও কিছু? ইহাও কি পূর্ব্বোক্তরূপ প্রবৃত্তিমূলক দর্শন? ইহাতে নিবৃত্তি কি আংশিকমাত্র, না সম্পূর্ণ? সম্পূর্ণ নিবৃত্তি অর্থে ধ্বংস।

ন্যায় দর্শন।

মিথ্যাজ্ঞান, দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম ও দুঃখ, পর্য্যায়ক্রমে ইহা একে অন্যের কারণ। মিথ্যা জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিনাশ হইলে মুক্তিলাভ। এ দর্শনের উদ্দেশ্যও মুক্তি, এখানেও সেই জন্মান্তরবাদ। এ দর্শন সম্বন্ধেও বলা যায় যে ইহাতে প্রবৃত্তি রহিয়াছে। এইরূপ মনে করিবার যে বিশেষ কারণ আছে, তাহা পরবর্ত্তী দর্শনের আলোচনা স্থলে ব্যক্ত করা যাইবে।

পাতঞ্জল দর্শন—ইহার ইতিহাস।

হিন্দু সভ্যতার মধ্যে একটি অভিনব ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না; বৌদ্ধসভ্যতা হিন্দুসভ্যতারই সন্তানস্বরূপ মনে করিতে হইবে। এই অভিনব ব্যাপার যোগশাস্ত্র। যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যতগুলি গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে প্রধান গ্রন্থ পাতঞ্জল-দর্শন। ঋগ্বেদে যোগ শব্দ পাওয়া যায় না। পুরাণ ইতিহাসাদিতে ইহার অদ্ভুত কার্য্যকরীশক্তির বিবরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে যোগ শব্দের পরিবর্ত্তে তপস্যা শব্দেরই ব্যবহার দেখা যায়। উভয়ের প্রণালী একই শ্রেণীর বলিতে হইবে; তবে তপস্যার প্রণালী কিঞ্চিৎ কঠোরতর বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে সিদ্ধ হইতে ষষ্টিসহস্র, লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে এরূপ দেখা যায়; যোগসিদ্ধিতে এত দীর্ঘ আয়াস আবশ্যক না হইলেও, ইহার ফল নিতান্ত কম নহে। বিভূতিপাদে ইহার যে সম্ভাবিত সামর্থ্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তপস্যাদ্বারা যাহা লাভ হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। এই পুরাণ ইতিহাস বহুকাল হইতে গৃহে গৃহে পঠিত হইয়া এই যোগ সম্বন্ধে এক বিষম কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। এই শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যের প্রচ্ছন্নতা ও প্রণালীর কঠোরতা, আবার এই কৌতূহলাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছে। যদি

সাধারণবোধগম্য বা আচরণীয় হইত, তাহা হইলে এরূপটি থাকিত না। আবার মধ্যে মধ্যে ভস্মমণ্ডিত, ঊর্দ্ধবাহু, কিলকারূঢ়, নানারূপ উৎকট ক্রিয়াশীল ব্যক্তি সমাজমধ্যে দেখা দিয়া এই কৌতূহল জাগরূক রাখিয়াছে। পুরাণাদি আর নূতন রচিত হইতেছে না, কিম্বদন্তী সে অভাব মোচন করিতেছে। ভূকৈলাসের রাজাদের বাটীর সন্ন্যাসী, তৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতির অদ্ভুত কাহিনী, এই কলিযুগে পুরাণের নূতন অধ্যায় রচনা করিতেছে। সংস্কৃত ভাষার যদি পূর্ব্বের ন্যায় আদর ও চর্চ্চা থাকিত, ম্লেচ্ছের ভাষা যদি প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ভারতক্ষেত্রে বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে এই সমস্ত বিষয় অবলম্বনে বর্ত্তমানে যে সমস্ত কাব্য লিখিত হইত, সহস্র বৎসর পরে তাহাই আবার পুরাণ হইতে পারিত। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে, এখন আর পারিশ্রমিক পোষায় না বলিয়া, তাহা রচিত হইতেছে না। যাহা হউক, এ সমস্ত কারণে যোগ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, শিক্ষিত অশিক্ষিত সমাজে যে একটি বিশেষ কৌতূহল রহিয়াছে, তাহা তুলনা রহিত।

ইহার উদ্দেশ্য।

এই যোগের উদ্দেশ্য কি? ইহাতে কি পাওয়া যায়? পতঞ্জলির মতে দ্বিবিধ ফল পাওয়া যায়: ১। বিভূতি ২। কৈবল্য। বিভূতি কাহাকে বলে?—

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্। ৩।১৬

অর্থাৎ অতীত অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া—

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্। ৩।১৮

পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান—

অন্তর্ধ্যানসিদ্ধিঃ। ৩।২১

বলেষু হস্তীবলাদিনি। ৩।২৪

হস্তীর ন্যায় বল—

চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ। ৩।৩৮

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ। ৩।৪৬

এই সমস্তই পাওয়া যায়। এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে কাহারও ভিক্ষার ঝুলি লুকায়িত আছে কি না, তাহা অনুসন্ধেয় বটে। জ্ঞান ও শারীরিক ক্ষমতা লাভের প্রকরণ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রতিশ্রুতি আছে, তাহা কতদূর দেহবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সম্মত, তাহাও বিশেষ বিচার্য্য। যাহা হউক, পতঞ্জলি প্রথম উদ্দেশ্য হইতে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন; এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কৈবল্য। ইহা কি?—

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ। ৪।৩০

অর্থাৎ সর্ব্বরূপ কর্ম্মশূন্যতা। স্বাধীন কর্ম্ম করিবার একটা উদ্দেশ্য থাকে, অন্যথায় লোকে কর্ম্ম করে না। কর্ম্মত্যাগেরও একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই; নচেৎ, আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, কর্ম্মত্যাগ করিব কেন? তাহার উত্তর কি? দুই রকম উত্তর হইতে পারে:—এক, এই মনুষ্য-জীবন দুঃখের হেতু, পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিয়া ক্লেশ পাইতে হইবে, তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে—ইহাই উদ্দেশ্য। এইরূপ উদ্দেশ্য আর আত্মহত্যা করিবার উদ্দেশ্য একই; আত্মহত্যা অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ আত্মহত্যা, কারণ পুনর্জন্ম পর্য্যন্ত হইবে না। এখন সহজে মানুষ আত্মহত্যা করিতে চাহে না। যদি বলা যায়, অবস্থা বিশেষে ইহা শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা, তখন এই অবস্থা কি তাহাই দেখিতে হইবে; ইহা জীবনে সুখ অপেক্ষা দুঃখের আধিক্য। ইহা জীবনের উৎকৃষ্ট অবস্থা কি করিয়া বলা যাইতে পারে? তবে এরূপ ব্যবস্থা হইল কেন? পতঞ্জলির জীবন বিশেষ দুঃখময় ছিল এরূপ মনে করা যাইতে পারে না; কারণ যে ব্যক্তির বুদ্ধি এবং কল্পনা আছে, সাধারণতঃ তাহার জীবন বিশেষ দুঃখময় হয় না। এ কথা কপিল, কণাদ, গৌতম ইত্যাদি সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। তবে যে এরূপ ব্যবস্থা কেন হইল, স্থানান্তরে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই তাহার কারণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। ব্যবস্থা যে জন্যই করুন, দেখিতে হইবে যে, যতক্ষণ না বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবন অত্যন্ত দুঃখময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ততক্ষণ এই ব্যবস্থা মনুষ্যের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না; কেবল মাত্র নির্ব্বাণ বা নিরতিশয় ধ্বংস লাভ করিতে প্রবৃত্তি জন্মায় না; এই ধ্বংসের সহিত কিঞ্চিন্মধু মিশ্রিত না থাকিলে,

মানুষ তাহা গলাধঃকরণ করিতে চায় না—বিভূতিপাদই ঐ মধু। প্রথমেই, বিভূতি পাদের ও কৈবল্য পাদের মধ্যে অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। যদি ধ্বংসই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হয়, তবে আর ঐ সমস্ত ক্ষমতা লাভ করিয়া ফল কি? এই বিভূতিপাদ থাকাতেই মনে করিতে হইবে, পতঞ্জলির অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। প্রথমেই বলিলেন—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ।১।২

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ ।১।৫১

এখন চিত্তবৃত্তিই কার্য্যকরীশক্তি, সুখদুঃখ ভোগের কারণ; তাহা নিরুদ্ধ হইলে ধ্বংসলাভই হইল। আবার বলিতেছেন—

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞাবৈরাগ্যম্ ।১।১৫

তাহা হইলে বৈরাগ্য অর্থে ধ্বংস। দৃষ্ট ও শ্রুতবিষয়ে বিতৃষ্ণা হইলে আর তৃষ্ণা রহিল কোথায়? তৃষ্ণা না থাকিলে তাহার তৃপ্তিজনিত সুখ কোথায়? সুখ না থাকিলে অস্তিত্বের আবশ্যকতা কোথায়? কাজেই বলিতে হইতেছে, এই বৈরাগ্য অর্থে ধ্বংসপ্রাপ্তি। ভূকৈলাসের সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে করা যাউক। ইনি জীবিত থাকিয়াও মৃত; যদি কোন তৃপ্তি না থকে তবে সেই জীবন কিরূপে বাঞ্ছনীয় হইতে পারে? এই তৃপ্তি কি? কেবলমাত্র অস্তিত্বতেই কি তৃপ্তি?

"মরণ যখন একটা দুঃখ, বাঁচিয়া থাকা যখন সেই দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি, তখন কেবল মাত্র অস্তিত্বতেই তৃপ্তি হইবার বাধা কি?"

বাধা কিছুই নাই, তবে মানুষের জীবনে উচ্চতর প্রবৃত্তি আছে কিনা, উচ্চতর চরিতার্থতা আছে কিনা, তাহা অগ্রে দেখিতে হইবে। যদি থাকে, তবে সেই উচ্চতর প্রবৃত্তি কেবল মাত্র অস্তিত্বে তৃপ্ত থাকিতে বাধা জন্মাইবে; তাহার ধ্বংস করিয়া কেবল মাত্র বাঁচিয়া থাকিবার উদ্দেশ্যে যোগাভ্যাস করিতে দিবে না।

"বাঁচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তিই সর্ব্বোচ্চ। অন্যান্য প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া তাহাতেই তৃপ্ত থাকিতে অভ্যাস কর।"

আমি যদি বলি মরিবার জন্য ভীত হইও না, তাহাই অভ্যাস কর? কোন্ অভ্যাসের দ্বারা ফল লাভের সম্ভাবনা বেশী? চিরস্থায়ি অস্তিত্বের

পক্ষে অভ্যাসের, না মৃত্যুতে ভয় ত্যাগ করিবার পক্ষে অভ্যাসের? বাঁচিয়া থাকিয়া হয়ত কোন সৎকার্য্যই হইবে না; দধীচি মুনি বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন নাই, মরিয়াই দেহ সার্থক করিয়া গিয়াছেন। কেবল মাত্র বাঁচিয়া থাকাই পাতঞ্জল দর্শনের তৃপ্তি নহে—

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বকইতরেষাং।১।২০

শ্রদ্ধাদি। জীবনের আর কোন তৃপ্তি পাতঞ্জলদর্শনে পাওয়া যায় কিনা দেখা যাউক—

ঈশ্বরপ্রণিধানাৎবা।১।২৩

ইত্যাদি সূত্রে দেখা যাইতেছে, বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ নহে, ঈশ্বরের উপসনার ফলে বৈরাগ্য জন্মে; তাহা হইলে বৈরাগ্য কি ঈশ্বর-লাভ হইতে উচ্চতর অবস্থা?

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানম্ তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্।২।২৫

তাহা হইলে বৈরাগ্য বা কৈবল্যের উদ্দেশ্য বা সার্থকতা হইতেছে—আত্মদর্শন (self-realisation)। এরূপ আরও সূত্র আছে, যথা—

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরা বিবেকখ্যাতেঃ।২।২৮

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা
বা চিতিশক্তিরিতি।৪।৩৪

তবেই হইল, পাতঞ্জল দর্শনের উদ্দেশ্য ধ্বংস নহে, কৈবল্য বা মুক্তি। মুক্তির উদ্দেশ্য আত্মার সতন্ত্রতা লাভ (a pure subjective existence untrammeled by objective existences)। অন্যান্য যোগ শাস্ত্রকারদিগের মতের আলোচনা বিশেষ আবশ্যকীয় নহে, পাতঞ্জল দর্শনই প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই কৈবল্যের আকাঙ্ক্ষাও একটা প্রবৃত্তি বলিতে হইবে। ইহা সর্ব্বোচ্চ বা কোন্ শ্রেণীর প্রবৃত্তি, তাহা বিচারের আবশ্যক নাই, কোনরূপ আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। আরও দেখিতে হইবে, ইহা কল্পনার অতি উচ্চস্তর; আকাঙ্ক্ষার চরম পরিণতি।

পতঞ্জলির মনে কেন এরূপ উদ্দেশ্য উদিত হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাৎকালিক সমাজের হিংস্র অবস্থাতে ব্যথিত হইয়া প্রাচীন অনেক উচ্চহৃদয় ব্যক্তি, তৎকাল প্রচলিত সাধারণ প্রবৃত্তি ও সেই প্রবৃত্তির চরিতার্থতাকে সমর্থন করিতে পারেন নাই; প্রবৃত্তিসমূহ নাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ ব্যবস্থা ভারতবর্ষ ভিন্ন প্রাচীন গ্রীস ও মাধ্যমিক খৃষ্টিয়ান যুগে ইউরোপেও যথেষ্ট দেখা যায়। এই সমস্ত দেশের ভাব একত্র করিয়া দেখিলে, নিবৃত্তিমার্গ ব্যবস্থার কারণ সহজেই অনুমিত হয়। নিবৃত্তির ব্যবস্থা আর ধ্বংসের ব্যবস্থা একই; সেইজন্য এই সমস্ত মনীষিগণ কেবল ধ্বংসের ব্যবস্থা দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই, হৃদয়ের তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই; যে হৃদয়ের উচ্চতা নিবৃত্তিমার্গ প্রবর্ত্তনের কারণ, সেই উচ্চতাই ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছে; হিংসাদ্বেষাদিমূলক প্রবৃত্তির স্থলে আর এক প্রবৃত্তি, আর এক লক্ষ্য, আর এক তৃপ্তির সংস্থাপন করিয়াছেন—তাহা মোক্ষ বা কৈবল্য। ইহাকে প্রবৃত্তি না বলিয়া, বিরোধবাচক নিবৃত্তিসংজ্ঞা দিয়াছেন; কিন্তু দূরদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, উভয় শ্রেণীর প্রবৃত্তির মধ্যে আকারগত বিরোধ থাকিলেও মৌলিক একত্ব দেখা যায়; এবং যদি বিরোধবাচক সংজ্ঞার অর্থ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বিষম অনর্থ উপস্থিত হয়—এই সমস্ত উপদেষ্টাকে ধ্বংসবাদী বলিতে হয়, আত্মহত্যা মন্ত্রের গুরু বলিতে হয়; কারণ প্রবৃত্তির বিরোধবাচক যে নিবৃত্তিসংজ্ঞা, তাহার অর্থ—প্রবৃত্তির সমূলে সংহার, এরূপ বলিতে হয়; কোন মূর্ত্তিতেই প্রবৃত্তি আদরণীয় নহে, তা সেই মূর্ত্তি আত্মদর্শনই হউক, ঈশ্বরদর্শনই হউক আর কামিনীকাঞ্চনই হউক।

পতঞ্জলির উদ্দেশ্যের উচ্চতা।

এই মোক্ষের কল্পনার স্বরূপ কি? ইহা কি কোন পার্থিব অবস্থা বা অবস্থা সমূহের সমবায়, না অপার্থিব অবস্থা? একটা বিষয় অগ্রেই দেখা যাইতেছে—পার্থিব অবস্থামাত্রই দুঃখমিশ্রিত, কিন্তু ইহাতে দুঃখের সংস্রব

নাই। দুঃখ নাই; তাহা হইলে ত কল্পনা সম্পূর্ণ হইল না। ইহা কি শুধু "নেতি নেতি?"—না কিছু অস্তি? দুঃখ ত নাই, সুখ আছে কি? নিশ্চয়ই নহে; ইহা সুখদুঃখের অতীত অবস্থা। ঐ প্রস্তরখণ্ডের সুখদুঃখ নাই, ইহা কি তদবস্থা? অবশ্যই নহে; ইহা উচ্চতর অবস্থা। পাঠক! সুখসংস্পর্শবিরহিত উচ্চ অবস্থার কল্পনা করিতে চেষ্টা করুন। সাযুজ্য? ইহার উচ্চতা কোথায়—উৰ্দ্ধে? না "উ" এবং "চ্চ," এই শব্দদ্বয়ে মাত্র? এই শব্দের অনুরূপ মনোভাব কোথায়?

"ইহা কল্পনার অতীত উচ্চভাব"।

যখন কল্পনার অতীত, তখন অবশ্যই জ্ঞান বুদ্ধির অতীত। তাহা হইলে হইতেছে, মানুষের মনের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা মনের অতীত।

"কিন্তু ভাবী উন্নত অবস্থা ত হইতে পারে?—ইহা সেই সময়ের কল্পনার অবস্থা।"

অর্থাৎ, বর্ত্তমান মনের অবস্থায় কল্পনা দ্বারাই কল্পনাকে ছাড়াইয়া চলিয়া যাওয়া হইল; নিতান্তই একটা অজ্ঞেয় অবস্থা। মোক্ষের সহিত সুখের লেশমাত্র মিশ্রিত করিলে সর্ব্বনাশ। এইখানেই mysteryর চরম হইল।

সাধারণ লোকের সামান্য ভোগাদির প্রবৃত্তি। ঐ ভোগাদির ক্ষণস্থায়িত্ব অবলোকন করিয়া, অতিউচ্চ কল্পনা বিশিষ্ট মানব তৃপ্ত থাকিতে পারে না; ইহার উন্নতি সাধন হইতে পারে কিনা, উচ্চতর প্রবৃত্তি থাকিতে পারে কি না, শ্রেষ্ঠতর চরিতার্থতা থাকিতে পারে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হয়। এই মনুষ্যজীবন ক্ষণস্থায়ী, তাহাতে কি করিয়া তৃপ্ত থাকা যাইতে পারে? এই শরীর ও মনের শক্তি সামান্য, তাহাতে কি করিয়া তৃপ্ত থাকা যাইতে পারে? এই অতৃপ্ততার ফলই বিভূতিপাদ। এই শরীর ও মনের ক্ষমতায় বহুবিভূতিলাভের ব্যবস্থাতেও পতঞ্জলির কল্পনার পরিসমাপ্তি হইল না, উচ্চতর পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না। এই পৃথিবী অনিত্য; এই বিশ্বসংসারও ত অনিত্য, সীমাবদ্ধ, অসম্পূর্ণতা পরিপূর্ণ। প্রবৃত্তি কোথায় ধাবমান হইল?—নিত্য পদার্থের দিকে, অসীমের দিকে, পূর্ণতার দিকে। সে কোথায়?

উপনিষদকার দেখিয়াছেন—ঈশ্বরে; আমার বোধ হয় সাংখ্যপ্রদর্শিত পথে চালিত হইয়া পতঞ্জলি দেখিয়াছেন—আত্মায়। এই দর্শনে ঈশ্বর সম্বন্ধে মাত্র ৮টি সূত্র আছে, তাহা বাদ দিলেও চলে; কিন্তু আত্মতত্ত্ব বাদ দিলে ইহার কিছুই থাকে না। এই অনিত্য, অসম্পূর্ণ জগতের সহিত আত্মা, চিত্তবৃত্তি দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত রহিয়াছে বলিয়াই যত অসম্পূর্ণতা তাহাতে বর্ত্তিয়াছে; এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই পূর্ণতৃপ্তি, চরম সার্থকতা লাভ হইল। মনুষ্যের কল্পনা আর বড় বেশী অগ্রসর হইতে পারে না। অন্য কোন দেশের কোন জাতির মধ্যে এই কল্পনা এত স্ফূরিত হয় নাই। আধুনিক ইউরোপীয়গণ ইহা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছেন। তাহা না হইলে পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামীর উক্তি তাঁহাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া নূতন ভাব জাগাইল কেন? দেবী বেসান্ত, নিবেদিতা প্রভৃতিকে হিন্দুত্বের মধ্যে টানিয়া আনিল কেন? আত্মার কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব নহে; এ কল্পনা সকল জাতিই করিয়াছে। এই আত্মা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তাহা মনুষ্যের ক্ষুদ্রজীবনের ক্ষুদ্রচেষ্টার সাধ্যায়ত্ত করা যাইতে পারে; এই কল্পনাকে বিশেষরূপ মহিমান্বিত করিয়া তোলাই হিন্দুর বিশেষত্ব। সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শনে একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। সাংখ্যের মুক্তি জীবন থাকিতে হইতে পারে না; কিন্তু পতঞ্জলি তাহাই করিবার প্রকরণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এখন আমাদের দুইটী বিষয় আলোচনা করিতে বাকী আছে: প্রথম, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ বর্ণিত অবস্থা লাভ করা সম্ভব কি না; দ্বিতীয়, ইহা লাভের শারীরিক ও মানসিক প্রকরণ, যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মূল্য কি। এই আলোচনার ফল যাহাই হউক, পতঞ্জলির নিকট মানবসমাজ চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে। আর কিছু না করিয়া থাকিলেও, তিনি আমাদিগকে কল্পনা করিতে শিখাইয়াছেন। উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিবার যে উপযোগী সোপান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, অনন্তকাল ধরিয়া মনুষ্য তাহাতে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতে পারিবে; যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন অনন্তকাল ধরিয়া তাহার অনুসরণ করিতে পারিবে।

এই যোগ যে অভ্যাস না করিয়াছে, তাহার এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিবার অধিকার নাই ; তবে অন্যান্য বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। একটা বিস্তৃত ভূখণ্ডের জ্ঞান দুইরূপে লাভ করা যায় : ১ম। ভূখণ্ডের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া ; ২য়। কোন উচ্চস্থান হইতে দৃষ্টি করিয়া। এখন যোগপ্রকরণ মধ্যে বিচরণ না করিয়া থাকিলে, দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ; বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখা ভিন্ন অন্য পথ নাই। বিজ্ঞানের রাজ্য অতি উচ্চ বটে ; সেখানে দাঁড়াইয়া জগতের অনেক স্থান দেখা যাইতে পারে।

এই প্রকরণ অষ্টবিধ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান, সমাধি। প্রথমোক্ত ক্রিয়াসমূহ শারীরিক ক্রিয়া বিশেষ, শেষোক্ত ক্রিয়া মানসিক। এই সমস্ত ক্রিয়ার দ্বারা বিভূতির একটাও কিরূপে লাভ হইতে পারে, বর্ত্তমান অবস্থায় বিজ্ঞান তাহা বলিতে অশক্ত ; বরং যাহা বলিতে পারে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের সকল প্রত্যঙ্গের উপর মনের ক্ষমতা নাই। উদরের উপরিস্থ চর্ম্ম ইচ্ছানুরূপ নাড়িতে পারা যায় না ; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর যোগী বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে তাহা করিতে পারে। ইহাকে শারীরিক শক্তির বৃদ্ধি বলিতে হইতে হইবে। অন্য এক শ্রেণীর লোক ভ্রূদ্বয় ইচ্ছানুরূপ নাড়িতে পারে। যোগীর লক্ষণ তাহাদের আদৌ না থাকিলেও ইহাও শক্তির বৃদ্ধি বলিতে হইবে। অবশ্য ইহা অভ্যাসের ফল। এখন এই অভ্যাসের ফল কতদূর যাইতে পারে তাহাই বিবেচ্য। বলের চর্চ্চা করিয়া একজন লোক দশজনের তুল্য বলশালী হইতে পারে, বলের যথেষ্ট বৃদ্ধি করিতে পারে ; ইহা ত স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী বৃদ্ধি। তাহার অতিরিক্ত ফল লাভ—অন্ততঃ এরূপ বৃদ্ধি, যাহা বিজ্ঞান সন্ধান করিতে পারে নাই—তাহা যে হইতে পারে, বিশেষ প্রমাণ অভাবে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। ইহা যে ভিক্ষার উপায়মাত্র তাহা যোগী, জাতি-নির্ব্বিশেষে সপ্রমাণ করিতেছে। স্মরণ রাখিতে হইবে, অযাচিত ভিক্ষাও ভিক্ষা ; পরদত্ত বস্তু গ্রহণ মাত্রই ভিক্ষা। বরং যোগের যে মানসিক প্রকরণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার ভিতর একটা সত্য রহিয়াছে—প্রবৃত্তির

উপর আধিপত্য লাভ করিবার চেষ্টা। এই আধিপত্য লাভ করা বিশেষ আবশ্যক বটে। সংসারের কাজেই এই আধিপত্য লাভ কতকটা করা যাইতে পারে; অবশ্য একোদ্দিষ্ট হইয়া আরও লাভ করা যাইতে পারে। সংসারে প্রতি পদেই প্রবৃত্তির সহিত আমাদের সংগ্রাম করিতে হইতেছে; তাহাও এক প্রকার যোগ। কিন্তু একটা বিশেষত্ব আছে; কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে যোগচর্চ্চা একরূপ, আর ঐ সংগ্রাম না থাকার স্থলে স্বপ্রবৃত্ত হইয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধের অভ্যাস আর একরূপ। প্রথমোক্ত স্থলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ গৌণ অভ্যাস, এস্থলে তাহা মুখ্য অভ্যাস। কর্ম্মক্ষেত্রে বাধ্য হইয়া এই অভ্যাস করিতে হয়, আর স্বাধীন ভাবে স্বপ্রণোদিত হইয়া এই অভ্যাস করাই যোগের বিশেষত্ব। কিন্তু হইলে কি হইবে? বিভূতি লাভের উপায় কি করিয়া হইতেছে? মন জড় জগতের উপর কি করিয়া আধিপত্য করিতে পারে? যোগমতাবলম্বী বলিবেন ইহা বিজ্ঞান অপেক্ষা উচ্চ বা বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি। এই কথায় যিনি বিশ্বাস করিবেন, তাঁহাকে বলিবার আর বিশেষ কিছু নাই; তবে এইমাত্র স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, বিশ্বাস নিজের জ্ঞান নহে, ইহা পরের জ্ঞান। যাহা হউক, যোগের মানসিক প্রকরণ যাহা, তাহাই ইহার বিশেষত্ব। এরূপ মনে করা যাইতে পারে, দৃশ্যমান প্রকৃতিকে, বাহ্যজগতকে গড়িয়া তোলা হইল বিজ্ঞানের পথ, আর আপনাকে (self) গড়িয়া তোলা হইল যোগের পথ। এই গঠনের উদ্দেশ্য রহিয়াছে; যোগপরায়ণ যে তাহাকে কোন প্রকারে ধ্বংসপিপাসু বলা যাইতে পারে না। বরং ইহাই বলা যাইতে পারে যে, সে সাধারণ লোকাপেক্ষা বেশী পরিমাণে আকাঙ্ক্ষাবান। তাহার আকাঙ্ক্ষার গঠন এবং গতি উভয়ই তীব্রতর। সে ঐশ্বর্য্যে তৃপ্ত নহে, রাজত্বে তৃপ্ত নহে, ইন্দ্রত্ব বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়া তৃপ্ত নহে; আকাঙ্ক্ষা যে তাহাকে কোন রাজ্যে উড়াইয়া লইয়া যায়, তাহার ভৌগলিক বৃত্তান্ত সে কিছুমাত্র অবগত নয়, কল্পনাও করিতে পারে না। ইহার দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কল্পনার বাহিরে গিয়াও বোধ হয় আকাঙ্ক্ষার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞানও যে কল্পনাকে কতকাংশে চরিতার্থ করিতে পারে না তাহা নহে। যদিও অমরত্বের বিষয়ে হলপ করিতে না পারে, তবুও সুস্থ সবল ও সুদীর্ঘ জীবন লাভের উপায় তাহার পক্ষে অপ্রতিপাদ্য নহে; যদিও একস্থানে বসিয়া ধ্যানের দ্বারা ত্রিলোকদর্শনের কোন প্রতিজ্ঞাই ইহাতে নাই, তথাপি দেশদেশান্তরের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে অসমর্থ নহে। কিন্তু হইলে কি হইবে। বিজ্ঞানের গতি এতই মন্থর যে তাহাতে এককালীন তৃপ্তিলাভ করা, আকাঙ্ক্ষাময় যে জীব, তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাই বলি, যিনি যত বড় যোগী হউন, তিনি তত বেশী আকাঙ্ক্ষাময়। তাঁহার আকাঙ্ক্ষার ব্যাপকতাও বেশী, বেগও তীব্রতর।

"কৈবল্যের অবস্থা মৃতের অবস্থা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ইহা জড়ের অবস্থা নহে, বরং বিশেষ উচ্চ জীবনের অবস্থা। প্রবৃত্তির অধীন যে জীবন, তাহা নিম্ন শ্রেণীর জীবন; আর এই প্রবৃত্তিকে নিরোধ করিয়া যে জীবন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা উচ্চ জীবন। এ স্থলে উচ্চ শব্দের অর্থ হইতেছে উচ্চতর সুখ বা তৃপ্তি। কৈবল্য লাভ হইলে এই উচ্চতর প্রবৃত্তির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ তৃপ্তি প্রবৃত্তির চরিতার্থতাজনিত তৃপ্তি নহে; প্রবৃত্তির তাড়নায় যে আর অকিঞ্চিৎকর বস্তুর উদ্দেশে দৌড়াইতে হইতেছে না, প্রবৃত্তিকে নিরোধ করিতে যে সামর্থ্য লাভ করা গিয়াছে, ইহা সেই সামর্থ্যের উপভোগজনিত তৃপ্তি; ইহা নিবৃত্তির উপভোগ। প্রবৃত্তির উপভোগজনিত তৃপ্তির অপেক্ষা ইহা মহা তৃপ্তি।"

ইহা তাহা হইলে তৃপ্তির অবস্থা, ভোগের অবস্থা। তাহা যদি হয়, তবে ইহা উচ্চতম মোক্ষের অবস্থা নহে। সে অবস্থা পূর্ণ অজ্ঞেয় রহস্যের অবস্থা' নিম্নতর মোক্ষের অবস্থার অজ্ঞেয়ত্ব আংশিক মাত্র। যদি অজ্ঞেয়ের দিকে যাইতে হয়, তবে বিশুদ্ধ অজ্ঞেয়ের দিকেই যাই না কেন? যে ভোগাদি অবস্থা ছাড়াইয়া উঠিতে চাইতেছি, তাহা এককালীন পরিত্যাগ করি না কেন? আর যদি আংশিক জ্ঞেয়ত্বের মধ্যেই থাকিতে হয়, তবে যাহা অলরূপ জ্ঞাত, যাহা প্রবৃত্তিমার্গানুগত, তাহার দিকেই যাই না কেন? ওরূপ কৈবল্যাবস্থার অবতারণা করা, দুনৌকায় পা দিয়া

সংসারসাগর পার হইবার চেষ্টার ন্যায় বিপজ্জনক বলিয়া মনে হয় না কি? প্রবৃত্তির রাজ্যেও উত্তম উত্তম সামগ্রী আছে; তাহা পরে দর্শান যাইবে। সেই প্রবৃত্তিসমূহের অনুশীলন বিশেষ জ্ঞেয় উপভোগ, বিশেষ হৃদয়গ্রাহী উপভোগই বটে; সে উপভোগের অবস্থার উচ্চতর উপভোগের অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে না। তবে কল্পনাকে পবিত্র রাখিতে হইবে; তাহাকে সংস্কারপঙ্কিল করিলে হয়ত নিম্নশ্রেণীর উপভোগ, বা আদৌ উপভোগের অভাবকেই, সর্ব্বোচ্চ উপভোগ বলিয়া মনে হইবে। মহিষের নিকট ভাগীরথীর পুণ্যময় গর্ভে অবগাহিত অবস্থা অপেক্ষা পঙ্কে নিমজ্জিত অবস্থায়ই শ্রেষ্ঠতর অবস্থা বলিয়া প্রতীত হয়। এরূপ প্রবৃত্তি আছে যাহার অনুশীলনের প্রত্যবায় নাই, ধ্বংসচেষ্টায়ই প্রত্যবায় আছে। বিশুদ্ধ প্রবৃত্তি, জীবনের উপযোগী প্রবৃত্তির, কোনটাই দুঃখের কারণ নহে; তাহাদের বিরুদ্ধাচরণই দুঃখের কারণ। এমন প্রবৃত্তি আছে, নিবৃত্তি যাহাকে স্পর্শ করিতে শঙ্কিত হইবে। উষার কিরণমালা প্রহত হইয়া অন্ধকার যেমন সত্রস্তে পলায়ন করে, এমন প্রবৃত্তি আছে যাহার শান্তোজ্জ্বল প্রভার সম্মুখ হইতে নিবৃত্তি ত্বরিত পলায়ন করিয়া আপনার বিবরে আশ্রয় গ্রহণ করে। নিবৃত্তির গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে আমরা ভুলিয়া যাই যে, যে প্রবৃত্তির প্রত্যবায় আছে তাহারই নিবৃত্তি আবশ্যক; যাহার প্রত্যবায় নাই, তাহার নিবৃত্তির আবশ্যকতা তো নাই, বিশেষ বৃদ্ধিরই আবশ্যকতা আছে। এই সমস্ত প্রবৃত্তির অনুশীলনই সুখ, তাহাই জীবন, তাহাই কল্পনার চরম, তাহাই জীবনের উচ্চ অধিকার। ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অধিকার সন্ন্যাস দিতে পারে না; বৈরাগ্য দিতে পারে না; নির্ব্বাণ, কৈবল্য, মোক্ষ, কেহই দিতে পারে না। তবে এই অধিকারকে ভাল করিয়া চেনা চাই, জানা চাই। তাহা না পারিলে হয়ত নেরো বা সিরাজদ্দৌলার রাজ্যাধিকার পরিচালনের ন্যায় অসুবিধার বিষয় হইয়া পড়িতে পারে। আর এই অধিকারের মূল্য বুঝিলে অন্য অধিকারের প্রত্যাশাই কেহ করিতে পারে না; ইহার তুলনায় অন্যাধিকার অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়; দেহধারণের অধিকার সার্থক হয়, ক্ষুদ্র জীবন ক্ষুদ্র দেহ সার্ব্বভৌম হয়।

এই প্রবৃত্তির তাড়নার জন্য বিশ্বের কার্য্যে নিজের ক্ষুদ্র শক্তিকে অর্পণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি ইহা জানিয়া প্রাকৃত সচ্চিদানন্দ লাভ হয়। আর তাহা না করিয়া বিশ্বসংসার হইতে নিজকে গুটাইয়া লইয়া কোঠরগত হইলে কি এমন তৃপ্তিলাভ হইতে পারে?

"ধনধান্য চাই, সুখ সম্পদ চাই, রাজত্ব প্রতিপত্তি চাই, ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব চাই, এ প্রবৃত্তিমার্গ অপেক্ষা, 'চাই না—ইহাই চাই', এই নিবৃত্তির ভাব কি উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা নহে?"

'চাই না—ইহাই চাই' এরূপ শব্দ সমাবেশ দোষণীয়। 'চাই' এবং 'চাই না' এই যে পরস্পর বিরোধী ভাবদ্বয়, শব্দ প্রয়োগ দ্বারা সেই বিরোধ নিরাকরণের চেষ্টা করা হইতেছে। এরূপ চেষ্টা অবৈধ। দুইটা বস্তুকে সমান কি অসমান বলা যাইতে পারে। একবার অসমান বলিলে আর সমান বলা যায় না। একবার সমান বলিলে আর তাহাদিগকে যেমন অসমানের সমান কিম্বা একবার অসমান বলিলে তাহাদিগকে যেমন সমানের অসমান বলা যায় না, অনন্ত এবং সান্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়া যেমন আর অনন্তের সান্ত বলা যায় না, অস্তিত্ব অনস্তিত্ব শব্দ প্রয়োগ করিয়া যেমন আর অনস্তিত্বের অস্তিত্ব বলা যায় না, মৃতকে যেমন জীবিত বলা যায় না, তেমন, চাই না বলিয়া পুনর্ব্বার চাই বলা যায় না। 'চাই' এবং 'চাই না' ইহারা পরস্পর বিরোধী ভাব। 'চাই না' এ ভাব কখনও আকাঙ্ক্ষার ভাব হইতে পারে না। 'চাই' ইহা ক্রিয়ার ভাব; প্রবৃত্তির ভাব; 'চাই না' ইহা ক্রিয়া শূন্যতার ভাব; নিবৃত্তির ভাব। আকাঙ্ক্ষার ভাব না হইলে তাহা জড়ের ভাব, মৃতের ভাব; জীবিতের ভাব নহে, উচ্চ জীবনের ভাব হইতেই পারে না।

অতএব আমরা একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছি, তাহা ই:—দেহধারীকে আকাঙ্ক্ষাপরতন্ত্র হইতেই হইবে।

"কিন্তু যে দেহধারী নয়?"

যে [illegible] নয়? আপনি যতক্ষণ দেহত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহ, স্বর্গীয় দেহ [illegible] ব্রহ্মদেহ ধারণ না করিতেছেন, ততক্ষণ সে সম্বন্ধে বিশেষ ব্যস্ত [illegible]বেন না; যাহা আছেন তাহাই আগে বুঝিতে

চেষ্টা করুন। সংস্কার বড় বিষম বালাই। মাতৃতন্ত্রের সহিত যে ভূত-প্রেতের অস্তিত্বকে পান করা গিয়াছে, একশত বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারা তাহা তাড়ান যায় না। পুনঃরায় প্রশ্ন হইবে—

"আমি যদিও এইক্ষণ সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্ত হই নাই, আমার গুরুদেব হইয়াছেন। তিনি আমার কাণে যে সুমন্ত্র দিয়াছেন, তাহা দ্বারাই তাঁহার অতিমানুষ অবস্থার প্রতীতি হইয়াছে; এবং অনুস্বার বিসর্গের দ্বারা শাস্ত্রেও একথা লিখিত আছে যে, আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্তিলাভ করা যায় এবং করাই ভাল।"

এই সমস্ত বিধাতাদিগকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি কখনও নিজ হইতে কিছু সত্যের উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছ কি? নিজ হইতে ভাবিতে শিখিয়াছ কি? অথচ বল সোঽহং, আত্মা আছে, চৈতন্য আছে। চেতনাকে প্রবুদ্ধ করিতে কখনও চেষ্টা করিয়াছে কি? যদি কখনও না করিয়া থাক, আমার অনুরোধে একবারমাত্র চেষ্টা কর।

মানুষ নিতান্ত হেয় জীব। ধর', আকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া গেল; কি থাকিবে? ধর', দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, অপ্সর, কিন্নর—তাহাদের কোন আকাঙ্ক্ষা নাই; তবে কি জন্য তাহারা বিদ্যমান থাকে? ধর', স্বয়ং ঈশ্বর—জগত-কারণ, তাঁহার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই; ভাল, সৃষ্টি হইল না! শঙ্করাচার্য্যের আবোল তাবোল কেহ কখনও বুঝিতে পারিয়াছে বা উহাতে স্পষ্টত যাহা বুঝা যায়, তাহা ভিন্ন অন্য কিছু বুঝিবার আছে বলিয়া মনে হয় না। তুমি বুঝিয়াছ কি? না বুঝিয়া থাক, এখন উপায়? হয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রা যাও; না হয় নিজের চক্ষু ফুটাইতে চেষ্টা কর।

কিন্তু যে অন্ধ, তাহাকে নয়ন উন্মীলন করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা নিতান্তই নিষ্ঠুরতা। আবার বাহ্যিক অন্ধতা হইতে আন্তরিক যে অন্ধতা, তাহা আরও দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। প্রথম শ্রেণীর কানাকে তাহার অভাব কথঞ্চিত বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষে তাহা আদৌ অসম্ভব; সে তাহার অন্ধজগতের অন্ধকারকেই স্বর্গীয় আলোক অপেক্ষা সুন্দর দেখে, সেই অন্ধকারেই হোচোট খাইতে ভালবাসে]; আলোক তাহার অসহ্য। এই কানা কি করিয়া জগতপদ্ধতির ভিতর

দিয়া চলিয়া যায়?—পরের স্কন্ধে চড়িয়া। কাহারও অবলম্বন শঙ্করাচার্য্য রামানুজ, কাহারও বা Hamilton Reid। অবশ্য পরের কাঁধে চড়িয়া জীবনপথ অতিবাহন বড়ই সুবিধাজনক; কিন্তু যে শ্রেণীর জীব স্বাধীন চিন্তাশক্তি অর্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া পরের চিন্তার বোঝা বহিয়া বেড়ায় তাহাকে ভারবাহী গর্দ্দভ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? সংসারে কেন এমন হয়? কানা কেন লাঠি ধরিয়া চলে? হেতু:—ঐ চলনই তাহার উপযোগী; সে যদি শকটাকীর্ণ রাজপথে স্বাধীন গতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। অতএব কানাকে কানার ন্যায় আচরণই করিতে হইবে, জ্ঞান-রাজ্যে পরপ্রদর্শিত পথেই চলিতে হইবে।

স্বাধীন চিন্তাশক্তি কিরূপে একেবারেই লোপ প্রাপ্ত হয়, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। একদা কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে একটা অতি সাধারণ ভাবের দার্শনিক বিষয়ের প্রশ্ন করিলাম। প্রশ্নটা বোধ হয় এই: পুষ্পকে কেন সুন্দর দেখি, শুষ্ক পত্রকে কেন দেখি না? অধ্যাপক মহাশয় অনেক ভাবিলেন; ষড়দর্শন—সমেত টীকা ভাষ্য—কণ্ঠস্থই ছিল, তাহা সমস্তই হাতড়াইলেন। কূল কিনারা না পাইয়া অবশেষে বলিলেন "কাদম্বরীতে" বা "নৈষধে আছে, যথা"—এই শ্রেণীর লোককে নিজ হইতে ভাবিতে বলা বৃথা। ইহারা বয়সে বৃদ্ধ হইলেও শিশুবিশেষ। অপরিচিত ব্যক্তি দর্শনমাত্র শিশু যেমন সভয়ে মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লয়, ইহারাও কোন অপরিচিত ভাবের সম্মুখীন হইলে, তদ্রূপ আমাদের সেই বাগ্‌দেবীর মুখনিঃসৃত আদি পবিত্র ভাষায় লিপিবদ্ধ বিষয় বিশেষের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

"শাব্দিক প্রমাণ আর বৈজ্ঞানিক প্রমাণের পার্থক্য কি?"

পার্থক্য এই যে, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, শাব্দিক প্রমাণ তাহা নহে।

"বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু কোন একটা বিজ্ঞানের সমস্ত অংশই কি তাঁহার জ্ঞাতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? চিকিৎসক, তাঁহার অপরীক্ষিত কিন্তু বিজ্ঞানে লিখিত, কোন নূতন ঔষধ

প্রয়োগ করিলেন; তিনি কোন বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া করিলেন, না যজ্ঞাদির ন্যায় শ্রুতিবিহিত কোন কার্য্য করিলেন? বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া করিলেন বলা যাইতে পারে না, কারণ এই ঔষধের গুণাগুণ তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। শ্রুতির উপর বিশ্বাস করিয়া যদি ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন, তবে মন্ত্রাদি জপই করিবেন না কেন?"

প্রথম কারণ: বিজ্ঞান কখনই প্রত্যক্ষের বহির্ভূত বিষয়ের আলোচনা করে না। ইহার বিষয়বিশেষ এক ব্যক্তির প্রত্যক্ষ না হইলেও অপর ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হইয়াছে; সে প্রত্যক্ষের উপর বিশ্বাস করা যাইতে পারে। কিন্তু শাব্দিক জ্ঞানের যে অংশ বিজ্ঞান নহে, তাহা কাহারও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যজ্ঞের জন্যই বৃষ্টি হইল, মন্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করিয়াই কেহ রোগ মুক্ত হইল; অন্য স্বাভাবিক কারণে হইল না, ইহা কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

"যোগের দ্বারা শাব্দিক জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।"

যোগের প্রত্যক্ষ আর ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের প্রভেদ আছে। যে যোগসাধনায় সিদ্ধ হয় নাই, যোগমূলক প্রত্যক্ষ তাহার হইতে পারে না, বিশ্বাসমাত্র হইতে পারে। প্রথমে বলা হইতেছে, শাব্দিক জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে পারে; পরে বলা হইতেছে, যোগের দ্বারা সেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এই উভয় বিষয়ই বিশ্বাসের বিষয়, প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। একটী বিশ্বাস অর্থাৎ শাব্দিক জ্ঞানের সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস, আর একটি বিশ্বাসের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা হইতেছে। এই উভয়বিধ বিশ্বাস কেহ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে, শাব্দিকের তাহাকে আর কিছুই বলিবার থাকে না। বিজ্ঞানবিদকে কিন্তু এত সহজে নিরস্ত করা যায় না। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষজনিত যে বিশ্বাস, তাহা অপেক্ষা ধ্রুবতর বিশ্বাস আর নাই; বিজ্ঞানবিদ সেই বিশ্বাসের অনুকূল প্রমাণ উপস্থিত করিবে। কাজেই শাব্দিক প্রমাণ বৈজ্ঞানিক প্রমাণের সহিত পারিয়া উঠে না। প্রত্যক্ষজাত যে প্রমাণ, তাহাকেও বিশ্বাস বলা হইয়াছে; কিন্তু তাহা বলা উচিত নহে। প্রত্যক্ষই প্রমাণ, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। পরের প্রত্যক্ষকে গ্রহণ করার নাম বিশ্বাস। প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের পার্থক্য "জ্ঞানও

অনুমান" শীর্ষক অংশে দেখান হইয়াছে। অনুমান একটা নূতন বিষয় নহে।

আরও দেখিতে হইবে যে, বিষয় যতক্ষণ প্রত্যক্ষ না হইতেছে ততক্ষণ বিশ্বাসের তৃপ্তি হইতে পারে না—সে ঐন্দ্রিয় বা অতীন্দ্রিয়, যেরূপ প্রত্যক্ষ হোক। অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বলিয়া যে একটা প্রত্যক্ষের কথা বলা হইতেছে, তাহার অস্তিত্ব নাই; থাকিলে প্রত্যক্ষ শব্দ—যাহা ইন্দ্রিয় জগতের ভাষা—তাহার সাহায্য ভিন্ন অভিব্যক্তি হয় না কেন? ইন্দ্রিয়াতীত প্রত্যক্ষ আছে, আর তাহার একটা ভাষা নাই? প্রত্যক্ষ না বলিয়া অনুভব বলিলেও চলিবে না—ইহাও ইন্দ্রিয় জগতের ভাষা। তবে ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান বা বুদ্ধি বলা যাইতে পারে। "জ্ঞা" ধাতু এবং "বিদ" ধাতু যে মৌলিক ধাতু নহে, ইহার পূর্ব্বাবস্থা যে নিতান্ত ইন্দ্রিয়জগতের ধাতু, তাহাও দেখান যাইতে পারে; তবে এ প্রবন্ধ সে বিষয় বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে। ফল কথা: যতক্ষণ কোন বিষয় প্রত্যক্ষ না হইতেছে ততক্ষণ মনের তৃপ্তি হইতে পারে না; বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে না কিন্তু ভবিষ্যতে হইতে পারে, এইরূপ বিশ্বাসের মূলেও প্রত্যক্ষ রহিয়াছে, অন্যথায় বিশ্বাসও নাই। এখন, যে প্রত্যক্ষের শক্তি সকলেরই আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া, যে প্রত্যক্ষ 'হইতে পারে' তাহার অনুসরণ, সংস্কার ভিন্ন সাধারণ বুদ্ধির অনুকূল হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি বাড়াইতে চেষ্টা সকলেই করিতে পারেন; কিন্তু যতক্ষণ তাহা না বাড়িতেছে, ততক্ষণ অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া সাধারণ ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের প্রতিকূলে কোন সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ ইহার সম্বন্ধে বিশ্বাস মাত্র হইতে পারে; সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সাধারণইন্দ্রিয় নিগ্রহের সাপক্ষে কোন যুক্তি নাই।

যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহ বা সম্প্রদায় আকাঙ্ক্ষা উন্মূলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা কি বলিতেছেন ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে পারেন নাই। আকাঙ্ক্ষা দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর দ্বারা সংসারের অবনতি হয়, যথা—অসদুপায়ে ধন লাভের ইচ্ছা, নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য

পরপীড়নের ইচ্ছা। আর এক শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা আছে, ধর—মুমুক্ষা। ইহা দ্বারা সংসারের ঐরূপ অপকারের সম্ভাবনা দেখা যায় না। এখন গোল হইয়াছে, নিকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষার স্থল অধিকার করিতে দিয়া, উৎকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব অপলাপ করিয়া, আকাঙ্ক্ষামাত্রকেই অশ্রদ্ধা করা। মুমুক্ষা শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষাকে আকাঙ্ক্ষা শব্দদ্বারা অভিহিত করিতে যদি কোন আপত্তি থাকে, তবে ইহাকে অন্য যে কোন শব্দদ্বারা ব্যক্ত করা হউক, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। শব্দাভাবে ইহাকে হ্রীং শ্রীং ক্লীং বলিলেও আপত্তি নাই। ইহাদ্বারা আমি যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি, তাহা বুঝিলেই হইল। একটী বিষয়মাত্র দেখিতে হইবে যে, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক তাহা একই শ্রেণীর মনের অবস্থা। আমি ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধার নাশ করিতে চাই, আর আমি হত্যা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে চাই; অত্যন্ত বিসদৃশ হইলেও ইহার মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে—তাহাকে ঈক্ষণ বলা যাইতে পারে এবং তাহাই এস্থলে বুঝিতে হইবে। উৎকৃষ্ট ঈক্ষণ যাহা, তাহা বর্জ্জন করিয়া চৈতন্য বিশিষ্ট কোন জীব—তা তিনি দ্বিপদই হউন আর চতুষ্পদই হউন, দেবতা হউন বা সৃষ্টিকর্ত্তাই হউন—কাহারও অস্তিত্বের স্বার্থকতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে না। চৈতন্য এখানে মুখ্য পদার্থ নহে, গৌণ উপাদান মাত্র। আকাঙ্ক্ষাকে উৎপাদন করা ও জাগরিত রাখাই চৈতন্যের কর্ম্ম এবং তজ্জন্যই যে চৈতন্যের আবশ্যকতা, তাহা জড়ের সহিত তুলনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। জড়ের চেতনা বা আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুটরূপে আছে একথা অনুমান করিবার পক্ষে কোন যুক্তি পাওয়া যায় নাই। চৈতন্য-বিশিষ্ট বস্তুকে আকাঙ্ক্ষাবিহীন কর, সে জড়ত্বে পুনপ্রত্যাগমন করিবে। আকাঙ্ক্ষার পরিপুষ্টি করা ভিন্ন চেতনার অন্য কোন কার্য্য থাকিতে পারে কিনা, ইহা বিচার করিতে গেলে দেখা যাইবে, মানুষের মস্তিষ্কের সাধারণ অবস্থায় অন্য কোন কার্য্য থাকা কল্পনার অতীত।

মানুষ আকাঙ্ক্ষাদ্বারা পরিচালিত হইয়া কি করিতেছে? ইহার জবাব অতি সহজেই দেওয়া যাইতে পারে; দুঃখের নাশ ও সুখের বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। অন্য কোনরূপ লক্ষ্য থাকা আদৌ সম্ভবপর নয়।

'দুঃখ, সুখ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সারশূন্য পদার্থ, ইহার জন্য যে প্রকৃত জ্ঞানী সে ব্যথিত বা লালায়িত হয় না; শান্তি, মুক্তি, কৈবল্য ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষাই শ্রেষ্ঠ।'

তোমার এই কৈবল্য প্রভৃতিকেও কোনরূপ সুখের অবস্থা বলিয়া ধরিয়া লও। সুখ শব্দ ব্যবহার করিতে না চাও, পুনরায় সেই হ্রীং ক্রীং ব্যবহারের ব্যবস্থা কর, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এ স্থলে সুখ অর্থে আমি কোন শ্রেণীবিশেষের সুখের কথা বলিতেছি না, সর্ব্বপ্রকারের বাঞ্ছনীয় বস্তু বা অবস্থাকেই বুঝাইতে চাই।

অতএব বাসনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিও না; ইহাই জীবের জীবন, জীবনের জীবন। মৃত্যু ভিন্ন ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই; তাহাও গলায় রজ্জু দিবার পূর্ব্বে তোমাকে বিশুদ্ধ নাস্তিক হইতে হইবে—ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমনজনিত বিপদপাৎবিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইতে হইবে।

তবে উপায়! ঋষিগণ যে আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন, আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন না করিতে পারিলে মনুষ্যত্ব জন্মিবে না। সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে না; এক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে না হইতে নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা রক্তবীজের ন্যায় কিল কিল করিয়া জন্মাইতে থাকে; ইহার সীমা নাই, সমাপ্তি নাই, পূর্ণতৃপ্তি নাই; সুতরাং কতকাংশে অতৃপ্ত থাকিয়া যাইবে। বাসনা অতৃপ্ত থাকিয়া গেলে তাহার ফল দুঃখময়। আবার এই আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় সর্ব্বদাই দৌড়াইতে হইতেছে, যাহা হয়ত করা উচিত নয় তাহাও করিয়া ফেলা হইতেছে; অতএব এখন উপায়? এই বাসনার বিষম উৎপাৎ কি করিয়া এড়ান যায়? ঋষিদিগের ব্যবস্থা কি করিয়া কার্য্যে পরিণত করা যায়? আমি বলি—ভয় নাই, উদ্বিগ্ন হইও না। জগৎ-পদ্ধতিকে ভাল করিয়া বিশ্লেষ করিয়া স্পষ্টরূপে দেখিতে চেষ্টা কর। সেই যে স্রষ্টা, তিনিই আকাঙ্ক্ষাকে জীবসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জীবের অন্তরে বীজ (Nucleus) স্বরূপে রোপণ করিয়াছেন এবং এই পৃথিবীতেই ইহা অন্ততঃ দশ কোটী বৎসর ধরিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে; ধ্বংসের কোন লক্ষণই প্রকাশ করিতেছে না। জীবসৃষ্টির গোড়াতেই তিনি একটা মস্ত ভুল

করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেই ভুল আমাদিগকে সংশোধন করিতে হইবে, ইহা অগ্রে সিদ্ধান্ত না করিয়া, বিষয়টা আর একবার নাড়িয়া চাড়িয়া বুঝিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আকাঙ্ক্ষা বহু প্রকারের। তাহার এক শ্রেণী হয়ত মঙ্গলজনক নহে; কিন্তু অপর শ্রেণীর ভিতর অমঙ্গলের কিছু নাই। প্রথম শ্রেণীর বাসনা গুলি ত্যাগ কর, সমূলে উৎপাটিত কর, আমার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতি সেই ব্যবস্থা করিতে গেলে স্বয়ং সেই সৃষ্টিকর্ত্তাই আপত্তি আরম্ভ করিবেন এবং তিনি যে বিশেষ আপত্তি করিতেছেন, তাহা তোমার হাড়েহাড়ে জানাইয়া দিবেন। আহারের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ যে বড় সুবিধার বিষয় নহে, তাহা উদর বিশেষ করিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবে; স্ত্রী পুত্র পরিবারের সঙ্গত্যাগ করিয়া বনবাসের ব্যবস্থা করিলে মনের যে একটা উদর আছে, সে খাদ্যের ঘোরতর অভাব বোধ করিবে। আমার কোন এক মাননীয় বন্ধু এই প্রসঙ্গে বিশেষ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—"তাহা হইলে কি স্বাভাবিক উদ্বেগ যাহা কিছু তাহারই পোষণ করিতে হইবে? হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি ত খুবই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাহারও চর্চ্চা তাহা হইলে করিতে হইবে?" করিতে হইবে। কেবল-মাত্র সামান্য তারতম্য আছে, মূলের কোনই ব্যতিক্রম করিতে হইবে না। হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি প্রবৃত্তির মূলীভূত কারণ কি? ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির এ গুলি উপায় স্বরূপ হইলে অর্থাৎ ইহার চর্চ্চা দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্ত হইবার সম্ভব থাকিলে, মনুষ্য এই প্রবৃত্তির বশীভূত হয়। কিন্তু যদি আকাঙ্ক্ষাপরিতৃপ্তির অন্যপথ থাকে, এই পথ যদি অধিকতর সরল রাজপথ না হয়, তবে প্রবৃত্তি ইহাতে ধাবিত হইবে না। অর্থাৎ সমাজের উন্নত অবস্থাতে—যেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে কৃতসংকল্প, সমর্থ এবং বাধা শূন্য, সেখানে হিংসাদির দ্বারা সেরূপ ফল পাইবার সম্ভাবনা অল্প হইবে এবং প্রবৃত্তির ভিন্ন অবস্থা দাঁড়াইবে। সমাজের যে অবস্থায় জ্ঞানের সাহায্যে এবং পরস্পর অনুকূলতার সাহায্যে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির উপায়ই প্রশস্ত, সে স্থলে প্রবৃত্তির অবস্থাও সেই পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইবে। এই দৃষ্টান্ত হইতে

একটা মূল্যবান সাধারণ তত্ত্বের আবিষ্কার করা যাইতে পারে :—মানুষের প্রবৃত্তি সমূহের মৌলিক অবস্থা, তাহার জীবনের পক্ষে উপযোগী ভিন্ন অনুপযোগী নহে এবং হইতেও পারে না। ইহার মধ্যে অংশবিশেষ কালসহকারে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু মৌলিক অবস্থা কোন স্থলেই বিকৃত নহে; এবং আপাতস্ফুট আকার হইতে যতই দূরবর্ত্তী অস্পষ্ট মৌলিক অবয়বের প্রতি লক্ষ্য করা যায়, ততই উহার উপযোগিতার উপলব্ধি দৃঢ় হইতে থাকে।

এই আকাঙ্ক্ষাকে বাদ দিলে আমরা ধর্ম্মকেই পাই না; ধর্ম্ম ইহার একটী অধ্যায়। ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানে চিরকাল দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্র বলিতেছে, এই পৃথিবী বাসুকির মাথার উপর স্থাপিত রহিয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞান পৃথিবীকে তন্ন তন্ন করিয়া, পৃথিবীকে ছাড়াইয়া কোটী কোটী ক্রোশ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াও বাসুকির কোন সন্ধান পায় নাই। পরন্তু পৃথিবীর মূলাধারের যে সন্ধান পাইয়াছে, তাহার সহিত বাসুকির ফণার আদৌ সাদৃশ্য নাই। একবার যে রাক্ষস বিষ্ণুর হস্তে ছিন্ন হইয়াও সংসার জ্বালাইতে ছাড়ে নাই, জগতের প্রাণস্বরূপ চন্দ্রসূর্য্যকে পুনঃপুন গ্রাস করিয়া, তাহাদের হজম করিতে পারুক আর নাই পারুক, লক্ষ লক্ষ ভক্তের মনে ব্যথা দিয়াছে এবং গঙ্গাস্নান দ্বারা সেই ব্যথার কতকাংশ সান্ত্বনা করিতে হইতেছে, বিজ্ঞান তাহাকে এবার নির্ম্মূলে সংহার করিয়াছে। এইরূপে ক্রমেই বিজ্ঞান ধর্ম্মকে হটাইয়া লইয়া যাইতেছে এবং যেরূপ ভাবে কোণবদ্ধ করিয়াছে, তাহাতে সমূলে বিনাশের আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য এই মূল সত্যের দ্বারা করা যাইতে পারে কি?

তুমি বৈজ্ঞানিক, তুমি কি করিতে পার? হয়ত দৈহিক দুঃখের বিনাশ সমূলে করিতে পার, সংসার হইতে জরা অকালমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, দরিদ্রতা, শীতোত্তাপ জনিত দুঃখ, হয়ত একেবারেই উঠাইয়া দিতে পার; খৃষ্টীয় বিংশতি লক্ষ শতাব্দিতে হয়ত ইহা আরব্য উপন্যাসের স্থান গ্রহণ করিবে। শুধু দুঃখের নাশ নহে, দৈহিক সুখেরও হয়ত অনেক ব্যবস্থা করিতে পার। মধুকেও মিষ্টতায় লজ্জা দিতে পার বা দুগ্ধফেণনিভ

শয্যাকেও হয়ত হার মানাইতে পার। আচ্ছা, মনে কর কি তাহা হইলেই মানুষ আর বাঁচিয়া থাকিবে না? বাঁচিয়া থাকিলে তাহার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ সমাধি হইবে; আর কিছু চাহিবার থাকিবে না? তোমারই মনোবিজ্ঞান বলিতেছে যে—না, তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে না। তুমি যে দৈহিক সুখের ব্যবস্থা করিলে, কিন্তু দেহভিন্ন ও মনুষ্যের আর একটা জিনিষ আছে—মন; মনের সুখের জন্য তুমি কি করিতে পার? এ রাজ্যে তোমার প্রবেশ নিষেধ। তোমার রাজ্য বড়, না এই মনের রাজ্য বড়? বড়ই হউক, ছোটই হউক, এ তোমার স্বপ্নরাজ্য; এখানের তুমি রাজা নও, অধিবাসীও নও, ইচ্ছা করিলে পর্য্যটক স্বরূপে এ রাজ্যে ভ্রমণ করিতে পার; কিন্তু মনে রাখিবে ভারতবাসীর পক্ষে যেমন Australia, তোমার পক্ষে এ রাজ্য তাহাই। তবে তুমি বৈজ্ঞানিক! আস্ত মানুষটার উপর একছত্র অধিকার বিস্তার করিতে কিরূপে তুমি সক্ষম? একা তোমাকে লইয়া মানুষের চরম তুষ্টি কি করিয়া হইতে পারে! এই যে সর্ব্বত্রপ্রসারিণী কল্পনা, ইহার উদর সর্ব্বথা পূরণ করিবার তোমার ক্ষমতা নাই। তোমাকে নিঃশেষে খাইয়াও এ রাক্ষসীর ক্ষুধার উপশম হইবে না। অতএব ধর্ম্মেরও স্থান আছে। বিজ্ঞান যে স্থলে শেষ হইয়াছে, ধর্ম্ম সেই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, পরস্পরের রাজ্য পৃথক্। এই কথা স্বীকার করিলেই আর বিবাদ থাকে না। ইহাই কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য।

২। প্রবৃত্তির ক্রমবিকাশ।

(ক) প্রবৃত্তির উৎপত্তি।

এখন, এই যে আকাঙ্ক্ষা, ইহার যে বহুপ্রকার মূর্ত্তি আছে, যে বিভিন্নপ্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ইহা জীব জগতকে চালিত করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে—তাহা এক একটী করিয়া বিশ্লেষ করিয়া দেখিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে জড় ও উদ্ভিজ্জগতে ইহার বা ইহার স্থানীয় কোন শক্তির অস্তিত্ব আছে কিনা, দেখা যাউক। পর্ব্বত হইতে যে জলপ্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, চুম্বক যে লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করিতেছে, মৃদুমন্দ

মলয়হিল্লোল যে দিগধ্বংসকারী ঝঞ্ঝাবাতে পরিণত হইতেছে, তাহার অভ্যন্তরীণ কারণ কি? আকাঙ্ক্ষা জড় প্রকৃতির মধ্যে কোন আকারে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না। অনুসন্ধানে কারণ বলিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহা আকাঙ্ক্ষা নহে, অন্যরূপ শক্তি,—যথা আকর্ষণীশক্তি ইত্যাদি। শক্তিরূপা প্রকৃতির অন্যান্য মূর্ত্তি আছে, যাহা দ্বারা জড়জগতের গতির সঞ্চার হইতেছে এবং যাহার অভাবে জগৎ নিশ্চল, যথা—উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ। এই সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত হইয়াই জড়কে গতিশীল করিয়াছে, সৃষ্টিকে বহমান করিয়াছে; অন্যথায় সৃষ্টি অসাড়, নিষ্ক্রিয়, অস্ফুরিত। দার্শনিক, এই সমস্ত বিভিন্নরূপা শক্তির সমন্বয় করিয়া একমাত্র আদিম শক্তিমাতৃকার কল্পনা করিয়া থাকেন; কিন্তু আপাতত তাহা কল্পনামাত্র, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পাঠক! সেই মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিতে কৌতূহল হয় কি? যদি হয়, তবে তাহার চরিতার্থতাও সম্ভবের অতীত নহে; কারণ, কৌতূহলরূপী আকাঙ্ক্ষাও সেই মাতার পরিচারিকা। সে পথ দেখাইয়া তোমাকে একদিন জ্ঞানের সেই প্রান্তদেশে লইয়া যাইতেও পারে।

উদ্ভিজ্জগতেও যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত রহিয়াছে তাহাও বলা যায় না। ঘনপল্লবিত বটবৃক্ষ শনৈঃশনৈঃ পদপ্রক্ষেপ করিয়া যে অর্দ্ধপ্রান্তরকে পরিবেষ্টন করিতেছে, লতিকা যে শাখা হইতে শাখান্তরে নিঃশব্দে তাহার অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছে, দিগন্ত বিস্তারিত জলভূমিতে যে লক্ষ পুষ্প সূর্য্য কিরণে হাঁসিয়া উঠিতেছে; আকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হইয়া যে তাহারা এইরূপ আচরণ করিতেছে, কবি ভিন্ন তাহা অন্য ব্যক্তির বলিবার অধিকার নাই। অথচ দেখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র উত্তাপ, আলোক ইত্যাদি শক্তির দ্বারা উদ্ভিজ্জগতের সমস্ত কার্য্য হইতেছে তাহাও বলিতে পারা যায় না। এই জগতে শক্তি মাতৃকার কোনও অস্ফুটপূর্ব্ব মূর্ত্তির বিকাশ কল্পনা করিতে হইবে—ইহাকে জীবনীশক্তি বলা যাইতে পারে।* সৃষ্টির আর এক স্তর উর্দ্ধে উঠিলে আমরা প্রকৃত প্রাণীর সাক্ষাৎ পাই। উদ্ভিদের ন্যায় ইহার যে কেবল জীবন আছে তাহা নহে, ইহার প্রাণ আছে—আকাঙ্ক্ষাই সেই প্রাণ। আকাঙ্ক্ষা না

থাকিলে ইহা জড় বা উদ্ভিদ হইবে, প্রাণী হইবে না; আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া তাহা ত্যাগ করিলেও পুনরায় নিম্নস্তরেই চলিয়া যাইবে, উর্দ্ধে উঠিবে না।

অতি নিম্নশ্রেণীর যে প্রাণী, তাহাকে উদ্ভিদ হইতে স্বতন্ত্র করা যায় না, তাহার আকাঙ্ক্ষাও দেখা যায় না। এক স্তর উর্দ্ধে উঠিলে ক্রিমিকীট শ্রেণীর প্রাণী পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে এই যে আকাঙ্ক্ষা, যাহা জীবের জীবন, তাহা কি মূর্ত্তিতে বিচরণ করিতেছে?—একমাত্র 'ভোজনেচ জনার্দ্দন' মূর্ত্তি। ইহাদের জীবনে অন্য কোন লক্ষ্য নাই, অন্য কোন প্রয়াস নাই, অন্য কোন সফলতা নাই। এরূপ আকাঙ্ক্ষা উদ্ভিদেও রহিয়াছে বলা যাইতে পারে, তবে এখানে অধিকতর স্ফুট। মনে রাখিতে হইবে, আকাঙ্ক্ষা কোন একটা অভিনব বস্তু, জগতে কোন সময়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নহে; ইহা পূর্ব্বে অস্ফুট ছিল, পরে স্ফুরিত হইয়াছে। এক বস্তু যে অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে, তাহাকেও শক্তিরূপ আকাঙ্ক্ষা বা আকাঙ্ক্ষারূপ শক্তি বলা যাইতে পারে। দার্শনিক যে শক্তিমাত্রেরই একত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তা তাহা জড়েরই হউক, উদ্ভিদেরই হউক, আর প্রাণীরই হউক। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সহিত শেষোক্ত চালকশক্তির সমন্বয়ই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ক্রিমিকীটের স্বপ্রণোদিত গতিশক্তি আছে, উদ্ভিদের তাহা নাই। উদ্ভিদকে একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই পুষ্টির আকাঙ্ক্ষা সফল করিতে হইতেছে, কিন্তু প্রাণী গতি শক্তিকে এই উদ্দেশ্যের পোষকতায় নিয়োগ করিতেছে; সুতরাং ইহাদের আকাঙ্ক্ষা অধিকতর স্ফুট বলিতে হইবে। উদ্ভিদের ইহা ইচ্ছাধীন গতি দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারিতেছে না, পরন্তু এ স্থলে তাহা হইতেছে। খাদ্যোদ্দেশে ক্রিমির যে অশ্রান্ত পরিভ্রমণ, তাহা জড় পদার্থের মধ্যগত আকর্ষণীশক্তির অনুরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রাণীর মধ্যে ঐ শক্তি অধিকতর জটিলরূপে স্ফুট। একজন উচ্চ শ্রেণীর মনুষ্যের সমস্ত কার্য্য যেমন এই মৌলিক আকর্ষণ দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে বলিলে যথেষ্ট হয় না, ঐ আকর্ষণের বিশেষমূর্ত্তি যেমন কল্পনা করিতে হয়; তেমনই এই ক্রিমিরও অস্থিরতার জন্য ঐরূপ বিশেষ মূর্ত্তির উন্মেষ কল্পনা করিতে

হয়।—কারণ, ঐ প্রাণীই ক্রমে মনুষ্য হইয়াছে; মনুষ্যে যে শক্তি বিশেষরূপে সুস্পষ্ট হইয়াছে, তাহাই উহাতে অবভাষিত হইতেছে। অতএব, জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণী, যে শক্তি দ্বারা চালিত হইতেছে, তাহা পর্য্যায়ক্রমে এই: ১ম। আকর্ষণাদি; ২য়। ঐ আকর্ষণাদি শক্তির মূর্ত্তি বিশেষ—বাঁচিয়া থাকিবার জন্য চেষ্টা; ৩য়। ঐ আকর্ষণাদির মূর্ত্তি বিশেষ—ঐ বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টার মূর্ত্তি বিশেষ—আকাঙ্ক্ষা। এই তিন অবস্থার মৌলিক শক্তি সেই গতি-শক্তিই (Dynamic impulse) বটে, তবে তাহার বিভিন্ন মূর্ত্তি। বাষ্পীয় যানের (Piston) চালকদণ্ড যে চালিত হইতেছে, তাহা কিসের জন্য? সংক্রামিত শক্তির জন্য। উত্তপ্ত বাষ্প তাহাকে যে ভাবে যতক্ষণ চালাইবে, সেই ভাবে ততক্ষণ চলিতে হইবে; কোন সময় গতি দ্রুত কোন সময় মন্দ; কোন সময় একশত গাড়ী টানিয়া লইবার পক্ষে যথেষ্ট বলশালী, কোন সময় একখান গাড়ী টানিবার পক্ষে সামর্থ্যহীন। এই যে লৌহখণ্ড, ইহার স্বাধীনতা নাই; স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র শক্তি উৎপাদনের বিকাশ নাই—তাহার অহংজ্ঞান জন্মে নাই। এই লৌহখণ্ডের বিপরীত পার্শ্বে, সৃষ্টির অপর অংশে—মনুষ্য। সে ক্রমশ আপনাকে আধারের এরূপ অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে, যাহাতে তাহার জীবন ধারণের পক্ষে উপযোগিতা ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ চেষ্টাই জীবন, এইরূপ চেষ্টা যে করে সে জৈবনিক। Piston নামধারী লৌহখণ্ডের এরূপ চেষ্টার বিকাশ নাই—সে জীবিত নহে। আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বাংশে ত্যাগ করিলে কি হয়? সে আর জৈবনিকের গুণবিশিষ্ট থাকে না। আমরা যদিও উদ্ভিদ, ক্রিমিকীটের মধ্যে স্বাধীনশক্তি উৎপাদনের পরিচয় পাই, তাহা নিতান্তই অল্প। প্রথম স্তরের জীব হইতে জড়ের পার্থক্য করাই কঠিন; অতএব অনুমান করিতে হইবে যে, এই পার্থক্য মনুষ্যে যতই ভাস্বর হউক, আদিতে ইহা সত্ত্বাবিহীন; জড়েরই আকর্ষণাদি শক্তির বিকাশ ক্রমশ হইয়াছে। আবার প্রথম স্তরের উদ্ভিদ হইতে সেই স্তরের-প্রাণীর পার্থক্য করা যায় না; অতএব প্রাণীতে ঐ শক্তিরই অধিকতর বিকাশ হইয়াছে।

(খ) প্রবৃত্তির পরিণতি।

আমরা আকাঙ্ক্ষার জন্ম বৃত্তান্ত পাইলাম, এখন জীব জগতে তাহার ক্রমবিকাশ দেখা যাউক। আদিতে ইহার একমাত্র রূপ—উদরপূর্ত্তি বা দেহগঠন। নিম্ন শ্রেণীর জীবের উদরও নাই, সমস্ত দেহই তাহার উদর। যাদৃশীর্ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এখন এই যে প্রাণী, ইহার জীবনেতিহাসের প্রধান অংশ হইতেছে, জড় জগতাধারের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ। জড়জগত ইহাকে অনবরত জড়ে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে; আর জীব তাহা হইতে আপনার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। এই দ্বন্দ্ব জীবনের সারাংশ বলিয়া মানুষ যখন চিন্তা করিতে শিখিল, তখন অস্মদ্ ও যুষ্মদের স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি করিতে শিখিল। এই সংগ্রামে জীবনই জয়ী হইতেছে এবং যতদিন পৃথিবী জীবনের উপযোগী থাকিবে ততদিন জয়ী হইবে। তাপক্ষয় ইত্যাদি কারণে হয়ত জড়ই আবার জয়ী হইবে; অতএব জড়ও কম পাত্র নহে; তাহাকে অবজ্ঞা করা চলে না, বরং তাহার সহিত ভাল রকম পরিচয় করাই ভাল। বিজ্ঞান সেই পরিচয়েরই ফল। জড়ের এবং চৈতন্যের এই সংগ্রাম হয়ত কালের প্রথম হইতেই চলিয়া আসিতেছে। অনেকানেক দীর্ঘকালব্যাপী সমরের ইতিহাস পাঠ করা গিয়াছে, তাহার সহিত এই সমরের তুলনা করা যায় কি? এই সমরের ইতিহাস পাওয়া যায়, সেই ইতিহাসের নাম জৈবিক ক্রমবিকাশবাদ। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়েরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। জড় যেমন প্রথমে বিক্ষিপ্তঅবস্থায় ছিল, ক্রমেক্রমে দলবদ্ধ হইয়া চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রে পরিণত হইয়াছে, জীবন তেমনি আনুবীক্ষণিক ক্ষুদ্রকায় জৈবনিক হইতে গজ কচ্ছপাদি বৃহতকায় জীবে পরিণত হইয়াছে। সেই যে ক্ষুদ্র জৈবনিক, সে একাকী জড়ের সহিত যুদ্ধে বেশীক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারে না; জড় তাহার দেহকে ক্রমশ জড়ীভূত করিতে থাকে। তখন তাহাকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, নূতন দেহ লইয়া আসিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে হয়। আবার যেখানে একটী প্রাণী একা দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছিল, সেখানে সে বিভক্ত হইয়া বহু হইয়া যুদ্ধ চালায়। কীটাণু এইরূপেই বৃদ্ধি পায়;

তাহারা সন্তান প্রসব করে না; খণ্ড খণ্ড হইয়া নূতন নূতন জীবে পরিণত হয়।

যুদ্ধে যে বৃহৎকায় এবং বহুসংখ্যক তাহারই সুবিধা বেশী—কীটাণু জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ক্রমশ বৃহৎ হইতে লাগিল। তখন কিন্তু আর বিভক্ত হইয়া বহু হইবার সুবিধা থাকিল না; কারণ যাহার অঙ্গ বৃহৎ, তাহার সেই অঙ্গ চালনা করিবার জন্য জটিল অভ্যন্তরের (Complicated structure) আবশ্যক হয়। বিভক্ত হইলে জটিল অন্তরের কতক অংশ এক খণ্ডের ভিতর রহিয়া যায়, অপর খণ্ডে অন্য অংশ চলিয়া যায়। জটীল দেহের পক্ষে প্রত্যেক অংশেরই আবশ্যকতা রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক অংশ মূল দেহে একটা বই অধিক থাকিবার আবশ্যক হয় না। এইজন্য, এই প্রকার দেহ বিভক্ত হইলে জীবিত থাকিতে পারে না; তাহার জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ-বিশেষের অভাব হইয়া পড়ে; সেই অভাব বশত সেই জীবের বংশবৃদ্ধি না হইয়া মৃত্যু ঘটে। অতএব জীব, বংশবৃদ্ধির অন্য উপায় দেখিতে লাগিল; স্ত্রীপুরুষভেদ এবং উভয়সংযোগে বংশ উৎপাদন, এই উপায় পাওয়া গেল; তদবধি এই উপায়ই অবলম্বনীয় রহিয়াছে। আমরা প্রথম স্তরের কীঠাণুর মধ্যে বিভক্তির দ্বারা বংশবৃদ্ধিই প্রচলিত দেখিতে পাই; দ্বিতীয় স্তরে, অঙ্গের কথঞ্চিৎ সৌষ্ঠব সহকারে, এই সংযোগমূলক বংশবৃদ্ধি দেখা যায়। প্রকৃতি এই কৌশল আবিষ্কার করিতে না পারিলে জীবের আর উন্নতি হইত না, দেহের বৃদ্ধি হইত না, সংসারে মনুষ্য দেখা দিত না। ইহার ন্যায় আশ্চর্য্য এবং দুর্ব্বোধ্য কৌশল জগতপদ্ধতির মধ্যে আর দেখা যায় কি না সন্দেহ। এই দ্বিতীয়রূপ বংশ বৃদ্ধির প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে আমরা আকাঙ্ক্ষার দ্বিতীয় মূর্ত্তি দেখিতে পাই। পূর্ব্বে যাহা কেবল মাত্র দেহবৃদ্ধি (Self-sustenance) রূপে বিদ্যমান ছিল, এ স্থলে তাহার দ্বিতীয়রূপ হইল—দেহবৃদ্ধি* এবং বংশবৃদ্ধির ইচ্ছা। কাল সহকারে এমনও হইল যে, দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষা অনেক সময়ে প্রথম আকাঙ্ক্ষার অপেক্ষাও বলবতী হইয়া উঠিল। তিলোত্তমার জন্য কেবল সুন্দ উপসুন্দই প্রাণ দেয় নাই, প্রাণীজগতের সর্ব্বস্তরেই এই অসুরদ্বয়ের স্থলাভিষিক্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

বিভক্তির দ্বারা যে বংশধর সৃষ্ট হয়, সে সৃষ্টির পরক্ষণেই আপন জীবন সংরক্ষণে সমর্থ; এইরূপ সামর্থ্য জন্মিবার পূর্ব্বে সে পিতৃদেহ হইতে বিযুক্ত হয় না। কিন্তু সংযোগোৎপন্ন যে বংশধর, সে অল্পবিস্তর অসমর্থ হইয়া জন্মায়—প্রথম স্তরে অল্প, পরে বিস্তর। এইবার যে আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র আত্মাভিমুখী ছিল, তাহা পরমুখী হইতে চলিল; ইহার আদিম মূর্ত্তি মাতৃস্নেহ। অনাদিকাল হইতে ইহা আদি এবং শ্রেষ্ঠ চিত্তবৃত্তি। পৃথিবীতে যদি স্বর্গীয় কোন ভাব থাকে, তবে তাহা এই মাতৃস্নেহ—স্বর্গেই বা ইহা অপেক্ষা বেশী কি আছে? ইহা আকাঙ্ক্ষার তৃতীয় শ্রেণীর মূর্ত্তি—পারিবারিক চিত্তবৃত্তি সমুদয়ই ইহার অন্তর্গত। ইহারও প্রাবল্য যথেষ্ট; অনেক সময়ে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি হইতেও ইহা বলবতী।

সমাজবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে—সমাজ বন্ধন কেবল মনুষ্যে সীমাবদ্ধ নহে—আর একশ্রেণীর পরার্থপরতা দেখা যায়। মানুষ অপেক্ষা পিপীলিকা, মক্ষিকা শ্রেণীর জীবের মধ্যে সামাজিক প্রবৃত্তি অধিকতর বলবতী; সমাজ রক্ষার জন্য প্রাণপাত করিয়া শ্রম বা যুদ্ধ করিতে তাহারা পশ্চাৎপদ হয় না। অন্য যে সমস্ত প্রবৃত্তির উল্লেখ করা যাইবে, তাহা মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না—পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকারের ভাব অন্যত্রও আছে।

আর্ত্তকে সেবা করিলে নারায়ণের সেবা করা হয়, ইহা অতি উচ্চ অঙ্গের কথা। ইহাতে একশ্রেণীর পরাভিমুখী প্রবৃত্তি—দয়াকে, নূতন আর শ্রেণীর প্রবৃত্তির সহিত যোজনা করা হইয়াছে—তাহা ধর্ম্মভাব। এখানে প্রবৃত্তি, আত্মপর ছাড়াইয়া ঈশ্বরমুখী হইয়াছে। বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ঈশ্বরকে লাভ করিবার যে আকাঙ্ক্ষা তাহাই ধর্ম্মভাব; ধর্ম্মের আর সমস্ত অংশ আবর্জ্জনা মাত্র। অল্প সময়ের জন্য যে ঈশ্বর লাভ, তাহাকে পূজা বা আরাধনা বলে। ঈশ্বরের সহিত যাহার মন সর্ব্বথা—অর্থাৎ অন্য কোনরূপ আকাঙ্ক্ষানির্ব্বিশেষে—যুক্ত না হয়, তাহার পূজা হয় না। স্বার্থ, এমন কি হৃদয়ে কোন পরার্থকামনার চিহ্ন থাকিলে, সে হৃদয় ঈশ্বরে যুক্ত হয় না। এমন কি দেশের মঙ্গলের জন্যও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া আরাধনা করিলে পণ্ড হইবে—কারণ মন অন্য

কামনানির্ব্বিশেষে ঈশ্বরমুখী হয় নাই। ঈশ্বরমুখী যে প্রবৃত্তি তাহার ঈপ্সিত বস্তু একমাত্র ঈশ্বর; তাহা না হইলে ঐ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি বা সার্থকতা হইতে পারে না। দেশহিতৈষণা ইত্যাদি ভিন্নমুখী আকাঙ্ক্ষা, তাহার চরিতার্থতার উপায়ও ভিন্ন। ঈশ্বরমুখী প্রবৃত্তি অন্য প্রবৃত্তির সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে ইহার ঐকান্তিকতার অভাব হয়। বিশুদ্ধ একাগ্রতা ভিন্ন যে ইহার পরিতৃপ্তির উপায় নাই, জগতের সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থে তাহা বিশেষরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে। আত্মমুখী, পরমুখী ও ঈশ্বরমুখী, প্রধান এই তিন শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিশেষ বিসদৃশতা রহিয়াছে; অনেকস্থলে ইহারা পরস্পর বিরোধী—একের ছায়াপাতে অন্যের মলিনতা জন্মায়।

এই পাঁচ রকম আকাঙ্ক্ষা ব্যতীতও মনুষ্যে অন্যরূপ আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে।

(গ) মনুষ্য জীবনে প্রবৃত্তির ক্রমবিকাশ।

আমরা প্রাণীর জীবনে বিভিন্নরূপ আকাঙ্ক্ষা চিহ্নিত করিলাম, এখন ক্রিমিকীটাদির ইতিহাস ছাড়িয়া দিয়া, কেবলমাত্র মনুষ্যজীবনে ইহা কখন কি মূর্ত্তিতে বিকাশমান হয়, তাহা দেখিতে হইবে। এই মানুষ, মানুষ হইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত প্রাণীস্তরের মধ্যে দিয়া গমন করিয়াছে, প্রত্যেক মানুষকেই তাহার জীবনে পুনরায় সেই স্তরসমূহ অতিক্রম করিতে হয়; সেই কীটাণু হইতে পুনরায় আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যে উঠিতে হয়। শৈশবে আবার সেই উদরপূর্ত্তি বা দেহরক্ষাই একমাত্র অভিলষিত বিষয়, যৌবনে সেই বংশবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা একমাত্র লক্ষ্যস্থল না হইলেও, প্রবলতম প্রবৃত্তি; পরমুখী এবং ঈশ্বরমুখী প্রবৃত্তি জীবনের আরও পরবর্ত্তী সময়ে লাভ হয়; এই হইল সাধারণ পৌর্ব্বাপর্য্য। এখন কয়েকটী বিশেষ প্রবৃত্তির আলোচনা করা যাউক।

মনুষ্য প্রথমে যে উদরপূর্ত্তির জন্যই সর্ব্বথা লালায়িত থাকে, সেই উদরপূর্ত্তির উপায় দ্বিবিধ—মুখ্য এবং গৌণ। পশুহনন, মেষপালন বা কৃষিকার্য্য ইহার মুখ্য উপায়; নগর বন্দর, রাস্তা ঘাট, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ, বিজ্ঞান, ইহার দ্বিতীয় বা গৌণ উপায়। উদরপূর্ত্তি ক্রমান্বয়ে দেহ রক্ষা, ও তৎপরে দৈহিক সুখস্বচ্ছন্দতায় পরিণত হয়। ধর, মনুষ্য বিশেষের

জীবনে এমন একদিন উপস্থিত হইল, যখন তাহার সুখস্বচ্ছন্দতার উপাদান সংগ্রহ এক প্রকার শেষ হইল, ভবিষ্যতেরও ব্যবস্থা যথেষ্ট হইয়া থাকিল। বিচারবিতরণকার্য্যে সহায়তা করিয়া বা রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ পক্ষে চরমব্যবস্থা করিয়া বা বাঙ্গলার কৃষকের কষ্টের ধন তাহার মাথা হইতে নামাইয়া লইয়া কিম্বা জেলার হাকিমী করিয়া অবসর লইয়া যক্ষশালায় (Bank) অর্থের পাহাড় সঞ্চিত করিয়া যখন বসিয়া থাকি, টেবিল চেয়ারে বসিয়া কাঁটা চাম্‌চে সহযোগে গো মেষাদির অমিশ্র আস্বাদে রসনা যখন বিগলিত হইতে থাকে, দাসদাসীগণ যখন বাবু না বলিয়া বলে সাহেব, পুত্র কন্যা যখন মা বাবা না বলিয়া Mamy Daddy বলিতে থাকে, তখন আর কি চাই ?—কালো রংটা উঠিয়া যায় এরূপ সাবান চাই ; কিন্তু সেখানে বিধাতা বিরূপ, বাঙ্গলা পর্য্যন্ত ভোলা যাইতে পারে, তাহার উর্দ্ধে আর উল্লম্ফন করা যায় না। কার্পাসপিণ্ডে ন্যস্ত শরীরে চারিজন চাকরে যখন রাশি রাশি তৈল মর্দ্দন করিতে থাকে, তখন আর কি চাই ? তখনও চাই ; ভিন্নরূপ আকাঙ্ক্ষা তখনও তাড়না করিতে ছাড়ে না।—অতএব প্রমাণ হইতেছে, সেই যে আদি কারণ, জগতকে সে হাপ ছাড়িতে দিবে না, কেবল দৌড় করাইবে।

তখন কিসের আকাঙ্ক্ষা হয় ?—যশের। এই মূর্ত্তিটা ভাল করিয়া দেখিবার জিনিস বটে। যশের মরুভূমিতে মানুষ আজীবন দৌড়াইতে পারে ; ইহার কুল কিনারা নাই এবং আরও সুবিধা, তৃষ্ণা নিবারণের উপযোগী কোন বস্তু নাই ; অতএব প্রকৃতির যদি ইহাই উদ্দেশ্য হয় যে, মানব আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া চিরকাল দৌড়াইবে, চিরকাল গতিশীল থাকিবে, স্থিতিশীল হইতে পারিবে না, এই আকাঙ্ক্ষাতেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত। কিন্তু রাক্ষসীর উদ্দেশ্য আরও বিষম, গতিকে আরও দ্রুত করিতে চায়। যেমন, যে শকটে এক অশ্ব যোজিত রহিয়াছে, তাহাতে বহু অশ্ব যোজনা করিলে বেগ তীব্র হয় ; তেমনই নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা, একের সহিত অন্যকে, তাহার সহিত আবার অন্যকে, জুড়িয়া দিয়া মনুষ্য জীবনকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তোলে। আলেক্‌জেণ্ডার অর্দ্ধপৃথিবী জয় করিয়াছিলেন ; কেননা লোকে তাঁহাকে খুব বীর বলিবে।

ধর, কোন ব্যক্তি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া ফেলিল, পৃথিবীতে উপভোগের যত কিছু দ্রব্য আছে, তাহার সমস্ততেই তাহার একাধিপত্য হইল, সে সর্ব্বাপেক্ষা বীর হইল; ধর, সে আরও হইল, সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান হইল, কল্পনার শীর্ষস্থানীয় সুন্দর হইল এবং বলবান হইল; তখনও কি আরও চাহিবে? চাহিবে, কারণ আকাঙ্ক্ষা কোথায় যাইবে? রাজাই হউন আর ভীমসেনই হউন, সকলকেই আকাঙ্ক্ষা দেবীকে স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া বেড়াইতে হয়।

তখন কল্পনার সহচরী আকাঙ্ক্ষা অন্তর্মুখী হইবে; কারণ, নিজের জন্য আর বেশী কিছু চাহিবার নাই। এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, আলেক্‌জেণ্ডারকে অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে প্রবৃত্তি পরমুখী হইবে না। ইহার একটা ক্রমবিকাশ আছে; যে পরিমাণে স্বার্থাভিমুখী প্রবৃত্তি চরিতার্থতা লাভ করিবে, সেই পরিমাণে অন্য প্রবৃত্তির প্রবলতা জন্মিবে। উদরে অনল লইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া থাকাও বড় সুবিধার নহে; উদর বোঝাই থাকিলে তবে মন অন্য দিকে যাইবে। পূর্ব্বে যে প্রবৃত্তির বিভিন্ন মূর্ত্তির বর্ণনা করা হইয়াছে, অবশ্য তাহার চরিতার্থতার সীমা নাই; কারণ, যাহা পাওয়া সম্ভব, তাহা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হইলেও অসম্ভবের দিকে কল্পনা ধাবমান হইবে। কিন্তু ইহাই দেখিতে হইবে যে, পাছে লোক দৌড়াইতে নিরস্ত হয় বা বেগ শ্লথ করে, তজ্জন্য এক প্রবৃত্তির আংশিক চরিতার্থতার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি নূতন নূতন প্রবৃত্তির যোজনা করিয়া দেয়; উদ্দেশ্য—বেগ ক্রমশ দ্রুত হইতে দ্রুততর করা।

এ পর্য্যন্ত প্রবৃত্তির যে সমস্ত মূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সংসারে তাহা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে; এখন দুই একটা প্রচ্ছন্ন অবস্থার প্রবৃত্তির আলোচনা করা যাউক। জ্ঞানার্জ্জন প্রথমে মানুষের মনে একটা স্বাধীন প্রবৃত্তির স্থান পায় না; ইহার উদ্দেশ্য অন্য একটা উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ অধীন। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, এই উদ্দেশ্য উদরপূর্ত্তি মাত্র; কিন্তু অভ্যাসের ফলে, কাল সহকারে, জ্ঞানার্জ্জনী প্রবৃত্তি স্বাধীনতা লাভ করিয়া একটা উচ্চশ্রেণীর প্রবৃত্তির স্থান গ্রহণ করে। কেন এরূপ হয়, তাহা পরে বিচার করা যাইবে।

স্বার্থাভিমুখী প্রবৃত্তির সমধিক চরিতার্থতার সঙ্গেসঙ্গে মানবহৃদয়ে পরাভিমুখী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমন একদিনের মানব সমাজের, এমন এক উন্নত অবস্থার কল্পনা করা যাউক, যে অবস্থায় পরোপকারের স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। প্রত্যেক মানুষেরই দৈহিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার উপকরণ যথেষ্ট সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং উপকারের স্থল কোথায়? সেই অবস্থায় আকাঙ্ক্ষার অভিনব মূর্ত্তি অবশ্যই ঈশ্বরমুখী। এই প্রবৃত্তির চরিতার্থতা মনজগতেই সীমাবদ্ধ, বাহ্যজগতে ইহার কোন কার্য্যই নাই। প্রকৃতি কিন্তু এখনও ছাড়ে না। শুধু মনজগতের কার্য্য লইয়া থাকিলে বহির্জগত কে বেগবান রাখিবে? মানুষের এই চরম উন্নতির অবস্থায় বাহ্যজগত কি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে? প্রকৃতি তাহাতে সন্তুষ্ট নহে; মানবকে, তাহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, বাহ্যজগতকে ঠেলিয়া ঊর্দ্ধে লইয়া যাইতে বাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে আর একটি প্রবৃত্তি অন্তর্নিহিত করিল। এই প্রবৃত্তি পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার প্রবৃত্তির সমবায়; ইহা জগন্মুখী। ইহাকে নির্ম্মাতৃকী (constructive) প্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে; ইহা বিশ্বনির্ম্মাণ কার্য্যে সহায়তা করা। ইহাতে, কাহারও উপকার হউক বা না হউক, তাহা লক্ষ্যস্থল নহে, গঠন মাত্র লক্ষ্যস্থল। এই প্রবৃত্তি মানবহৃদয়ে অতিশয় অপরিস্ফুট, কারণ ইহা জ্ঞানজ প্রবৃত্তি; জ্ঞানের বিশেষ উন্নতি ভিন্ন ইহার পরিস্ফুট মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার অস্ফুট মূর্ত্তি সর্ব্ব সমাজেই অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। যখন এই শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বলবতী হয়, অন্য শ্রেণী হইতে যখন তাহার পার্থক্য প্রকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে একটা নূতন মূর্ত্তির আসন দেওয়া যাইতে পারে; অন্যথায় বলিতে গেলে স্বার্থাভিমুখী প্রবৃত্তি ভিন্ন অন্য প্রবৃত্তিই ত নাই—অন্য সমস্ত প্রবৃত্তি তাহার রূপান্তর মাত্র। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে, জগতে নূতনসৃষ্টি কিছুই নাই; যাহা নূতন দেখিতেছি তাহা পুরাতনেরই নূতন সমাবেশ—পূর্ব্ব হইতেই যে সমস্ত উপাদান রহিয়াছে তাহার নূতনতর সংযোজনা মাত্র। ক, খ, গ, ঘ,……হ প্রভৃতি নানাবিধ উপাদান ছড়ান রহিয়াছে; কোন সময়ে "ক"য়ের

সহিত "খ" মিলিত হইতেছে, কোন সময় "গ", "ঘ" মিলিত হইতেছে; কোন সময়ে "ক, খ, গ, ঘ" একত্র মিলিত হইতেছে, কোন সময়ে "ক, খ, গ, হ" মিলিত হইতেছে—নূতন কিছু আসিতেছে না, নূতন রূপে যুক্ত হইতেছে মাত্র। এই রূপেই জগতে বিচিত্রতার অভিব্যক্তি হইতেছে; ইহা হইল গুণাত্মক (qualitative) বিচিত্রতা। ইহা ভিন্ন আর এক প্রকার সংখ্যামূলক (quantitative) বিচিত্রতা আছে, যথা ক কক ককক ইত্যাদি। অতএব বুঝিতে হইবে, এই নির্ম্মাতৃকী মূর্ত্তি আকাঙ্ক্ষার পূর্ব্বপূর্ব্ব মূর্ত্তির সংমিশ্রণে এবং কোন কোন অংশে সংবর্দ্ধনের দ্বারা স্ফুরিত হইয়াছে। সন্দেহ হইতে পারে যে, এই প্রবৃত্তির কল্পনা করা বাহুল্য মাত্র; ইহা দ্বারা যাহা হইতে পারে, পরাভিমুখী প্রবৃত্তির দ্বারাও তাহা হইতে পারে; পরন্তু পরাভিমুখী প্রবৃত্তির দ্বারা যাহা হইতে পারে না, ইহা দ্বারাও তাহা হইতে পারে না। ইহার যদি কোন অস্তিত্ব থাকে, তবে তাহা পরাভিমুখী প্রবৃত্তির প্রচ্ছন্ন অবস্থা মাত্র। এই আপত্তির মূলে এই প্রবৃত্তির স্বতন্ত্রতা দেখাইবার সুযোগ হইয়াছে। পরাভিমুখী প্রবৃত্তি বলিলে মনুষ্যাভিমুখী প্রবৃত্তি বুঝায়, পরোপকার বলিতে মনুষ্যই বুঝায়; অর্থের বিশেষ আয়তনবৃদ্ধি করিলেও প্রাণীজগতকে মাত্র বেষ্টন করিতে পারে, তাহার বাহিরে যাইতে পারে না। কিন্তু প্রাণী-জগতের বাহিরেও জগত বিস্তৃত রহিয়াছে, সেখানেও কার্য্য রহিয়াছে। কেবলমাত্র প্রাণীজগতের কার্য্যাবলীর মধ্যে নিজের কার্য্যকরণী প্রবৃত্তিকে সীমাবদ্ধ করিলে বুদ্ধির সংকীর্ণতাই প্রকাশ পায়; প্রাণী-জগত ছাড়াইয়া উঠিতে পারিলে, তাহা আরও উদার হয়। নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তি সমস্ত জগতকে বেষ্টন করে।

৩। ভগবদগীতার ধর্ম্ম ব্যাখ্যা হইতে নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই প্রবৃত্তির দ্বারা আমরা ভগবদগীতার ধর্ম্ম ব্যাখ্যা দর্শন করিব। ভগবান বলিতেছেন, কার্য্য করিতেই হইবে—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৩।৫

কেহই কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজ গুণে সকলেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ৩।৮

তুমি নিয়ত কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মশূন্যতা হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মশূন্যতায় তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

আবার বলিতেছেন :—কার্য্য করিবে কিন্তু সঙ্গ বা আসক্তি ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিবে।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ২।৪৮

হে ধনঞ্জয়! যোগস্থ হইয়া "সঙ্গ" ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্যজ্ঞান করিয়া (কর্ম্ম কর)। (এইরূপ) সমত্বকে যোগ বলে।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।

অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ৩।১৯

অতএব সতত অসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিবে। পুরুষ অসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে মুক্তিলাভ করে।

এখন আসক্তি ত্যাগ করিলে তো কার্য্য হয় না; কার্য্যে প্রবৃত্তি না থাকিলে কেহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। প্রবৃত্তি কার্য্যের প্রবর্ত্তক। অন্য প্রবর্ত্তক যে নাই তাহা ভাষা দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে—ভাষাতে অন্য শব্দই নাই। যাহার কোন প্রবৃত্তি নাই, তাহার কোন কার্য্যও নাই; অতএব প্রবৃত্তির ব্যবস্থা হইল—

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।

নিরাশীর্নির্ম্মমোভূত্বা যুদ্ধস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩।৩০

আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া অধ্যাত্মজ্ঞানের দ্বারা নিস্পৃহ, মমতাশূন্য ও শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর।

এখন গোল হইতেছে, প্রকৃত ঈশ্বরমুখী যে প্রবৃত্তি, তাহা দ্বারা মানসিক ভিন্ন বাহ্যিক কোন ক্রিয়া হইতে পারে না; যে ঈশ্বরে যুক্ত

হইয়াছে সেই বা বাহ্যিক কর্ম্ম কেন করিবে? বাহ্যিক কর্ম্ম তাহার পক্ষে অসম্ভব। যদি করে, তবে সে ঈশ্বরে সংযুক্ত হয় নাই—তাহার অন্য উদ্দেশ্য রহিয়াছে; না হয়, বলিতে হইবে—যুক্ত হইয়াছে, অন্য উদ্বেগ নাই; তবে ঈশ্বর হইতে সংসারের দিকে সে কি করিয়া নামিয়া আসে? যদি বলা যায়, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে, অন্যথায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না, ঈশ্বরমুখী প্রবৃত্তির সাধনা করা হইবে না; তাহার উত্তর এই যে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ নাই হইল; এ জীবনেই হউক বা অন্য কোন জীবনেই হউক, ঈশ্বরকে পাইবার বাধা নাই। যে ঈশ্বরে সংযুক্ত রহিয়াছে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইল কি না হইল, তাহা তাহার দেখিবার অবকাশ থাকিতে পারে না। জীবনের জন্যই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের আবশ্যকতা, ঈশ্বরলাভের জন্য নহে; ত্যাগ জীবনে মরণে সমভাবেই হইতে পারে। অতএব গীতাকার বা গীতাকারগণের মনভাবের ব্যাখ্যা এইরূপে করিতে হইবে: দেহধারী জীব সর্ব্বদা ঈশ্বরে সংযুক্ত থাকিতে পারে না, তাহা হইলে সংসার চলে না। যখন চলে না, তখন তাহাকে সংসারের কার্য্য করিতেই হইবে। এখন কথা হইতেছে, আসক্তি না থাকিলে কেন করিবে? ঈশ্বরাদেশ বলিয়া করিবে, ইহা ভিন্ন অন্য উত্তর নাই। এই ঈশ্বরাদেশই নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তি। ঈশ্বরাদেশ যে, তাহা আমি কি করিয়া জানি? আমি যদি গীতাকারের উক্তির প্রমাণ চাই, উক্তিমাত্রেই বিশ্বাসবান হইতে আপত্তি করি? গীতাকারকে নিরস্ত হইতে হইবে; কারণ, ভগবানের দোহাই মাত্র তাঁহার সম্বল। ঈশ্বর, তাঁহার আদেশ একমাত্র ভাষা দ্বারাই প্রচার করেন না, সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক রচনাই তাঁহার একমাত্র কৃতিত্বের পরিচয় নহে, শব্দের সাহায্য না লইয়াও তাঁহার আজ্ঞা অন্য উপায়ে মনের ভিতরে প্রবেশ করে। সে আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, মনের তাহা এড়াইবার যো নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁহার গ্রন্থে, ঈশ্বরাদেশ বা তন্মুখী প্রবৃত্তি এবং উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তির মিশ্রণ করিয়াছেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এরূপ মিশ্রণ ঠিক নহে। তিনি বলিতেছেন: তুমি সংসারে যে কাজ করিবে তাহা নিম্নলিখিত কারণে করিবে:

১। ঈশ্বরাদেশ। ২। পরোপকার। এখন ঈশ্বরাদেশ বা ঈশ্বর-মুখী প্রবৃত্তির দ্বারা সংসারের কোন কাজ হইতে পারে না। থাকিল উপচিকীর্ষা। গীতাকার কিন্তু পরোপকারের একান্ত পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয় না। আনুসঙ্গিক ভাবে দুই এক স্থলে মাত্র পরোপকারের উল্লেখ আছে, যথা—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৬।৩২

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আপনার সুখদুঃখের ন্যায় সকলের সুখদুঃখ দর্শন করে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং॥ ১২।৩

যাহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠাননিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, সর্ব্বব্যাপী, হ্রাসবৃদ্ধি বিহীন, কূটস্থ, এবং নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ১২।৪

ইহাতেও আত্মস্বার্থ পরস্বার্থে বলি দিবার কোন কথা নাই।

এখন কথা হইতেছে এই যে, উপচিকীর্ষার দ্বারা আমরা প্রাণীজগত পর্য্যন্ত উঠিতে পারি, তাহা ছাড়াইয়া যাইতে পারি না। কিন্তু এই নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তিরূপ যে ঈশ্বরাদেশ মনে প্রতিফলিত হইতেছে, ইহার দ্বারা আমরা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া আরও যে উদার স্বধর্ম্মের দিকে পৌঁছিতে পারি, তাহার দ্বারাই গীতার উক্তির উত্তমরূপ সামঞ্জস্য হয়।

কার্য্য যে কেন করিবে, তাহার কারণ সম্বন্ধে গীতাকারের উদ্দেশ্য অনুরূপ বুঝা যায়। কার্য্য করিবে, কারণ ইহা তোমার স্বধর্ম্ম, যথা—

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ২।৩১

স্বধর্ম্মপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ভীত হইও না। ধর্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় আর নাই।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩।৩৫

পরধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্মের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

এই স্বধর্ম্ম পালন জন্য কার্য্য করিতে হইবে।

ইহা সংকীর্ণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা; এখন আর ইহা চলে না। অথচ আমরা আসক্তিকে যে ভাবে দেখিতেছি, তাহার অভাবে মানুষ ইচ্ছা-প্রণোদিত কর্ম্ম করিতে পারে না; কোনরূপ আসক্তি তাহাকে চালিত করে, অন্যথায় সে কর্ম্মরহিত, নিশ্চল। গীতার মিল রাখিতে হইলে, এই আসক্তি বা প্রবৃত্তিকে আর কি বলা যায়? পরোপকার বলিলে মানুষকে না বুঝাইলেও, অন্তত প্রাণীর উপকার বুঝায়। তাহা হইলে স্থাবর কোথায় যাইবে? তাহার কার্য্য কে করিবে? বৃক্ষলতাদির কার্য্যের সহায়তা কে করিবে? এই কার্য্য করাকে কি পরোপকার বলা যায়? যদি তাহা না যায়, তবে এই প্রবৃত্তিকে নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। আপত্তি হইতে পারে যে, এটা একটা নিতান্ত কাল্পনিক প্রবৃত্তি; জড়ে প্রবৃত্তি কি জন্য যাইবে? নিজের দেহ হইতে সন্তানে প্রবৃত্তি কেন যায়? নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা অতিক্রম করিয়া সমাজের দিকে প্রবৃত্তি কেন ধাবিত হয়? পশুর ক্লেশে মোহিত হইয়া সমস্ত প্রাণীজগতকে কেন বেষ্টন করে? এত যদি হইল, তবে আর একটু অগ্রসর হয় না? মনের কোন্ অংশ প্রবৃত্তিকে এতদূর টানিয়া লইয়া গেল? ভাবের অংশ (Emotional side)। জ্ঞানের অংশ (Intellectual side) কি আরও টানিতে পারে না।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ৪।১৯

যাহার সকল চেষ্টা কাম ও সঙ্কল্প বর্জ্জিত এবং যাহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ, তাহাকেই জ্ঞানীগণ পণ্ডিত বলেন।

অতএব এই প্রবৃত্তি জ্ঞানমূলক।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ২।৪৮

হে ধনঞ্জয়! যোগস্থ হইয়া "সঙ্গ" ত্যাগ করিয়া, কর্ম্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্যজ্ঞান করিয়া (কর্ম্ম কর)। (এইরূপ) সমত্বকে যোগ বলে।

এ কর্ম্ম কি পরোপকার? তবে সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করিব কেন? সিদ্ধি হইলে তাহার জন্য উৎফুল্ল হইব না কেন? আসন্ন মৃত্যু হইতে কাহাকেও রক্ষা করিতে সফল হইয়া, তাহার সুখে সুখী হইব না কেন? যদি সফল না হই, তবে তো কোন কার্য্যই হইল না। যে প্রবৃত্তির লক্ষ্যস্থল পরোপকার, তাহা দ্বারা সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান জ্ঞান হইতে পারে না। পরোপকার করিবার উদ্দেশ্যে যে কার্য্য, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে, তাহা বিফল। তবে কার্য্যমাত্রের সফলতা কখন?—যখন কার্য্যমাত্র লক্ষ্যস্থল, গঠনমাত্র উদ্দেশ্য।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ৩।২২

হে পার্থ। এই তিন লোকে আমার কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই। অপ্রাপ্ত অথবা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি।

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং যাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ৩।২৩।

কর্ম্মে অনুরাগ না হইয়া যদি আমি কখনও কর্ম্ম না করি, তবে হে পার্থ! মনুষ্য সকলে সর্ব্বপ্রকারে আমার ঐ পথের অনুবর্ত্তী হইবে।

এ কর্ম্ম কি পরোপকার, না জগতনির্ম্মাণ? তবেত ভগবানকেই ফাঁদে ফেলা গিয়াছে! তবেত এই নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তি স্বয়ং ভগবানের প্রবৃত্তি! এ প্রবৃত্তি না থাকিলে তিনিও সৃষ্টিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না!

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়া যে শ্লোকাবলী আমরা দেখিতে পাই, তাহার সরল ব্যাখ্যা এইরূপ:—গীতা বেশ প্রাচীন গ্রন্থ; দুই হাজার বৎসরের পরবর্ত্তী নহে। সমসাময়িক এবং তৎপূর্ব্বের পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের ধর্ম্মমূলক গ্রন্থতে একটা বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। গীতাকার কামক্রোধের

উপর খড়্গাহস্ত ; অন্যত্রের ধর্ম্মগ্রন্থেও প্রায় তাহাই দেখা যায়। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের মনুষ্যচরিত্র, মনুষ্যসমাজ, এখনকার দণ্ডবিধি-আইনশাসিত সমাজ ও চরিত্রের অনুরূপ ছিল না। সে সময়কার চিত্র মনে অঙ্কিত করা কিঞ্চিৎ কঠিন। সে সময়ে, এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থই দণ্ডবিধি আইনের কার্য্য করিত। কলহ —বিশেষত স্ত্রীলোকঘটিত কলহ—তখন সমাজের অশেষ অমঙ্গল করিত ; অতএব গীতার সোজা অর্থ—তাহা হইতে লোককে নিবৃত্ত করা ; তজ্জন্য ব্যবস্থা হইল "কামক্রোধের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিও না, কামক্রোধ ত্যাগ কর।" দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে "কাম" শব্দে কি বুঝাইত, তাহা বলিবার সাধ্য আমার নাই। যদি কোন বিশেষ আকাঙ্ক্ষার সহিত এই শব্দের যোগ তখন না হইয়া থাকে, তবে "কাম" অর্থে প্রবল দুর্দ্দমনীয় কামনাই বুঝিতে হইবে। সমাজে এইরূপ কলহের অবস্থা দেখিয়া বিশেষ বিরক্ত হইয়া, ইতি-পূর্ব্বেই আর এক শ্রেণীর ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, "শুদ্ধ কাম ক্রোধ নহে সংসার পর্য্যন্ত ত্যাগ কর, কার্য্য করাও ত্যাগ কর ; দেখ যদি নিশ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদির কার্য্যও ত্যাগ করিতে পার।" গীতাকার বলিলেন "না, সে চেষ্টা সুবিধাজনক নহে ; কামক্রোধাদিকে ধ্বংস না করিয়া বশীভূত করিলেও চলিতে পারে ; তাহাই কর।" এই হইল শাস্ত্রকার-দিগের নীতিজ্ঞান (Ethical sense) ; ইহা ভিন্ন তাঁহাদের একটা নীতির অতিরিক্তজ্ঞান (Super-Ethical sense) ছিল, সেটা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাঁহাদের কল্পনাশক্তি অবশ্য সাধারণ লোকের অপেক্ষা বেশী ছিল। তাঁহারা ভাবিলেন : আহারনিদ্রামৈথুন, সংসারের ক্ষণস্থায়ী আশাভরসাভালবাসা, লইয়াই কি জীবনের চরমসার্থকতা ? ইহাপেক্ষা উচ্চদরের সার্থকতা কি হইতে পারে না ? হইবার পক্ষে এক প্রধান বিঘ্ন হইল, মানুষের শারীরিক ও মানসিক শক্তির অল্পতা—যোগের ব্যবস্থা হইল। গীতাকারের সময় যোগের আড়ম্বর অবশ্য খুব বেশী ছিল ; তাহার বিফলতা দেখিয়াই হউক বা সেসম্বন্ধে কোন সংস্কার (prejudice) না থাকিয়াই হউক, ব্যবস্থা করিলেন—কর্ম্মযোগ। কথাটা হয়ত পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু ইহার যে অবয়ব দেওয়া হইল, তাহাই

গীতার বিশেষত্ব। "কার্য্য করিবে, কিন্তু তাহাতে আসক্তি ত্যাগ করিবে, ফলের কামনা ত্যাগ করিবে, ভগবানে এই সমস্ত অর্পণ করিবে।" গীতাকার, সাধারণ কার্য্যকরণী প্রবৃত্তিকে এইরূপ উচ্চভাবে গঠন করিতে চাহিতেছেন। তাহাতেই হইল, তিনি কোন উচ্চঅঙ্গের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতেছেন। তাহা যদি পরোপকার হইত, তবে খুলিয়াই লিখিতেন; সব কার্য্য পরের জন্য করিতে হইবে, তাহা বলিতেন। এই উচ্চঅঙ্গের প্রবৃত্তিকে উপচিকীর্ষা বলিলে দুইটা দোষ ঘটে: প্রথম, নিজের জন্য যে কার্য্য করিতে হয় এবং অগ্রে যাহা না করিলে পরের জন্য কার্য্য করিবার সুবিধা ঘটে না—কারণ, জীবন, শক্তিসামর্থ্য রক্ষা না হইলে পরের উপকার করিবার সুযোগ হয় না—তাহার স্থল থাকে না; এবং জড়জগতের কার্য্যের স্থল থাকে না। অতএব উপচিকীর্ষা হইতে নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তি আরও উদার বলিতে হইবে। আরও কথা এই যে, গীতা পাঠ করিলে ইহাই মনে হয় যে, ইহা সাধারণভাবের উপদেশ গ্রন্থ। পরের উপকার করিবে কি নিজের উপকার করিবে, কোন স্থলে নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া পরের স্বার্থ রক্ষা করিবে বা কতটুকু নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিবে, এই সমস্ত বাহুল্য (details) ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্য ইহাতে নাই। তবে খণ্ডাকার হেতু ইহার শ্লোকসমূহের মধ্যে বিস্তর ফাঁক রহিয়াছে, তাহাতে যে অর্থ যার ভাল লাগে তাহা প্রবিষ্ট করাইবার বাধা নাই; অতএব আমিও সে চেষ্টা করিলাম।

আমরা প্রাণী সমূহের বিভিন্ন প্রবৃত্তির উৎপত্তি ও পরিণতি সাধারণ ভাবে বিচার করিয়াছি, এইবার ঐ পরিণতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা যাউক। নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে:—

১। জগতে আমরা দ্বিবিধ সত্তা দেখিতে পাই—জড় ও শক্তি। এই শক্তি বিভিন্নরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জড়কে চালিত করিতেছে; অন্যথায় জড় নিশ্চল, জগৎ অস্ফুরিত। জড় ও শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ একটি কথা এই যে, জড়েরই শক্তি বরং ইহা কল্পনা করা সম্ভব, শক্তির জড় ইহা কল্পনা করা সম্ভব নহে; দ্রব্যেরই গুণ ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে, গুণের

দ্রব্য বলা যাইতে পারে না। শক্তির যে বিভিন্ন মূর্ত্তি, জড় ও জীব জগতে তুল্যরূপে প্রকাশমান, তাহা হইতেছে: (ক) গতিশক্তি, (খ) উত্তাপ, (গ) আলোক, (ঘ) তড়িৎ, (ঙ) শব্দ। ইহা ভিন্ন জড়জগতে অন্য শক্তি কার্য্যকরী দেখা যায় না। আর যাহা দেখা যায়, তাহা এই পাঁচপ্রকারই শক্তির অন্তর্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

২। উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে আমরা শক্তির আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহাই জীবের বিশেষত্ব। জীবশরীরের উপাদান জড় মাত্র; বর্ত্তমানে তাহা ক্ষিত্যপতেজ নহে, অম্লজান জলযান ইত্যাদি। কিন্তু যে শক্তি এই জড়ীয় উপাদানসমষ্টিকে চালিত করিতেছে, তাহার বিশেষত্ব আছে। সেই শক্তি ইহাকে অনবরত অস্তিত্বের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে। জড়ের মধ্যে যে পঞ্চবিধ শক্তি সঞ্চারিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহাদের অধ্যুসিত বস্তুকে এইরূপ ভাবে চালিত করিবার কোন বিশেষ চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে না; কিন্তু জীবজগতের এই অধিষ্ঠাত্রী শক্তি, যাহাকে জীবনীশক্তি বলা হইয়াছে, তাহা এই কার্য্য করিতেছে। এবং কল্পনা করা হইয়াছে যে, এই ষড়বিধ শক্তিই এক আদিম শক্তির ক্রমবিকাশ।

৩। উদ্ভিদের সহিত প্রাণীজগতের পার্থক্য কি? উভয় জগতেই জীবন আছে। পার্থক্য এই যে, এই জীবনীশক্তি শেষোক্তস্থলে স্ফুটতর, বস্তু হইতে আধারের পার্থক্য আরও বিশদ; এবং যে প্রবৃত্তি একমুখী ছিল, প্রাণী জগতে তাহা বহুমুখী হইয়াছে; যাহা কেবলমাত্র নিজ অস্তিত্ব রক্ষকরূপে প্রকাশমান ছিল, তাহা ক্রমে অন্যান্য রূপ ধারণ করিয়াছে।

৪। উদ্ভিদ এবং যে কীটাণু বিভক্তিদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহাদের প্রবৃত্তি—একমাত্র দেহরক্ষা। যখন স্ত্রীপুরুষসংযোগে বংশবৃদ্ধির নিয়ম হইল, তখন প্রবৃত্তি দ্বিবিধ হইল: প্রথম, দেহরক্ষা; দ্বিতীয়, সংযোগস্পৃহা। এই উভয় প্রবৃত্তিই আত্মাভিমুখী। সংযোগদ্বারা বংশবৃদ্ধির নিয়ম কেন হইল, তাহা একটা উপমা দ্বারা স্পষ্টীকৃত করা যাউক। স্তূপীকৃত মৃত্তিকা একাধিক অংশে বিভক্ত করিলে তাহার সাময়িক পরিবর্ত্তন হইবে, কিন্তু গুণাত্মিক পরিবর্ত্তন হইবে না—প্রত্যেক অংশই মৃত্তিকাস্তূপ মাত্র

রহিয়া যাইবে। কিন্তু এই স্তূপ যখন বিশেষ আকার ধারণ করিয়া ঘটকুম্ভাদিতে পরিণত হয়, তখন একটা বিশেষত্ব জন্মে। এই ঘটকুম্ভাদি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিলে গুণাত্মিক পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে; তাহারা আর তাহাদের নির্ম্মাতার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে না। সেইরূপ, প্রাণীর দেহ যখন জটিলতা প্রাপ্ত হয়, তখন আর বিভক্তির দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার সুযোগ থাকে না। একটা জলৌকাকে দ্বিখণ্ড করিলে, উভয় খণ্ডে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না; কিন্তু একটা মৎস্যের প্রতি সেই ব্যবহার করিলে অন্যরূপ প্রতীতি হয়।

৫। অবয়বের জটিলতা বৃদ্ধি সহকারে, সংযোগপ্রসূত যে সন্তান, সে জন্মমাত্র জীবনসংগ্রামের উপযোগী হয় না। তাহার দেহ তাহার হইয়া কেহ রক্ষা না করিলে, তাহার বাঁচিবার উপায় নাই; ইহার ফলে প্রবৃত্তি পরমুখী হইল, পারিবারিক প্রবৃত্তি সমূহের জন্ম হইল।

মাতা সন্তানের প্রতি কেন আকৃষ্ট হয়? রজ্জু শৃঙ্খলাদি দ্বারা সংবদ্ধ বস্তুদ্বয় একে যে অন্যকে আকর্ষণ করে, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি, তাহার আর কারণ জিজ্ঞাসা করি না। কিন্তু এস্থলে কারণ জিজ্ঞাসার পথ রুদ্ধ নহে; রজ্জু শৃঙ্খলের অনুরূপ কোন সম্বন্ধের আবিষ্কার করিতে মন স্বতঃই ধাবিত হয়। মাতার সহিত সন্তান যে সূক্ষ্ম শৃঙ্খলদ্বারা যোজিত রহিয়াছে, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা দেখা যাউক। কারণ বলিতে কি বুঝায়? পূর্ব্বে যাহা জানা গিয়াছে, অভিনব বিষয় তাহা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা নির্দ্দেশ করাই কারণনির্দ্দেশ। পূর্ব্বে আমরা আত্মমুখী প্রবৃত্তিকে পাইয়াছি; তাহার আর কারণ অনুসন্ধান করা চলে না; কারণ, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। এই আত্মমুখী প্রবৃত্তি হইতে পরমুখী প্রবৃত্তির উদ্ভব কি করিয়া সম্ভাবিত হয়, সন্তানের দেহরক্ষার সহিত মাতার মানসিক সম্বন্ধ কি করিয়া স্থাপিত হয়, তাহা দেখিতে হইবে। ক্রমবিকাশবাদে ইহার কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করা হয়: বহুকাল ধরিয়া, বহুশ্রেণীর প্রাণী, বহুবিধ উপায়ে, আপনাকে জীবন সংগ্রামের অধিকতর উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে; মরণ এই উপযোগিতা সংগ্রহের পথ রুদ্ধ

করিতে পারিতেছে না; একটী প্রাণী তাহার জীবনে যে উপযোগিতা সংগ্রহ করিতেছে, তাহার মৃত্যুতে তাহা লোপ পাইতেছে না; সেই উপযোগিতার সারাংশ তাহার বংশে সংক্রামিত হইতেছে; এইরূপ বহু বৎসরের সঞ্চিত উপযোগিতার ফল—মাতৃস্নেহ। এই প্রবৃত্তি যে সমস্ত প্রাণীর মনে বেশী পরিমাণে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল, তাহারা জীবনসংগ্রামের সমধিক উপযোগী হইতে লাগিল; এবং যাহাদের হইল না, তাহারা সেরূপ উপযোগী হইল না—উচ্চস্তরে উঠিতে পারিল না, সৃষ্টির নিম্নস্তরেই রহিয়া গেল। আমরা প্রবৃত্তি পরমুখী হইবার কারণ পাইলাম।

৪। যশোলিপ্সা ও নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তির তারতম্য।

আত্মমুখী প্রবৃত্তির প্রথমাবস্থা—দেহরক্ষা, দ্বিতীয় অবস্থা—বংশরক্ষা, তৃতীয় অবস্থা—গৌণদেহরক্ষা। এই শেষোক্ত প্রবৃত্তি আবার চতুর্বিধ . (ক) ক্রীড়া—ইহা যদিও তৎক্ষণাৎ দেহরক্ষা বিষয়ে কার্য্য করে না, কিন্তু দেহকে চালনা দ্বারা রক্ষার অধিকতর উপযোগী করিয়া তোলে; (খ) যুদ্ধপ্রবৃত্তি —ইহা ভিন্ন আত্ম রক্ষা হয় না; (গ) কলাবিদ্যার চর্চ্চা—প্রবন্ধান্তরে এই প্রবৃত্তি বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষ করা যাইবে (ঘ) যশোলিপ্সা। এই যশোলিপ্সা আবার বহুমূর্ত্তিক; ইহার প্রথম অবস্থা—অন্যের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন। যশ কেন চাই? ইহাতে তো পেট ভরে না, তবে কেন চাই? পেট ভরিবার উপযোগিতা ইহার কি আছে দেখিতে হইবে। আমি যশ চাই, অর্থাৎ অন্যের হৃদয়ে ভীতির উদ্রেক দ্বারা দেহ রক্ষার সুবিধা করিতে চাই। যশোলিপ্সার অন্যান্য মূর্ত্তিতেও এই ভীতিউৎপাদনের ছায়া পাওয়া যাইবে। যে আমাকে ভয় করে, তাহা দ্বারা আমার অনিষ্টের সম্ভাবনা কম; বরং আমি তাহা দ্বারা আবশ্যক মত আমার দেহরক্ষার সাহায্য করাইতে পারি। আটিলা, চেঙ্গিস খাঁ প্রভৃতি, এই প্রথমস্তরের যশাভিলাষী ছিল। ইহার কিছু উর্দ্ধে আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি। ক্রমশ এই প্রবৃত্তি, দেহরক্ষী প্রবৃত্তি হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে লাগিল; নিজের বাহুবল, বুদ্ধিবল ইত্যাদি প্রচার করিয়া, পরের হৃদয়ে নিজের সম্বন্ধে অনুকূল ভাব উদ্রেক করিবার পথে গেল; দেহরক্ষা আর মুখ্য বা গৌণ উদ্দেশ্য স্পষ্টত রহিল না।

এইস্থানে নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তির সহিত যশোলিপ্সার তুলনা করা যাউক। যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া, রাজকার্য্যে যিনি বিনা বেতনে বা তুচ্ছ বেতনে নিজের অবিশিষ্ট জীবন অর্পণ করেন, তিনি কি প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া এই কার্য্য করেন?—যশের? তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "আপনি কি জন্য এইরূপ করিতেছেন?" তিনি কিন্তু যশের কথা স্বীকার করিবেন না। তিনি বলিবেন দেশের উপকার, পরের উপকার। যশোলিপ্সা যে উচ্চশ্রেণীর প্রবৃত্তি নহে, তাহা তিনি নিজের মনেই অনুভব করিয়াছেন। কেন নহে? ইহার জন্ম উচ্চ-বংশে নহে; ইহা স্বার্থপরতা বা উদরপূর্ত্তিরই নামান্তর মাত্র। যদিও অনেক-স্থলে স্বার্থরক্ষার কোন কিছুই দৃষ্ট হয় না—যথা অর্থাগমসম্ভববিরহিত কাব্যাদি রচনা—তবুও সেই কবি যশোলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিবেন না; বলিবেন, "যদি ইহাতে কাহারও উপকার হয়, একজন পাঠকও পড়িয়া ক্ষণমাত্রের জন্য হৃদয়ে তৃপ্তি লাভ করে", ইত্যাদি। যশোলিপ্সা স্বীকার করিতে বাধা কি? বাধা এই যে, ইহার আদিম অবস্থা—ভীতিউৎপাদন। যশোলিপ্সা অস্বীকার করিবার আরও বিশেষ কারণ এই যে, ইহা আত্মাভিমুখী প্রবৃত্তি; পরের নিকট তাহা প্রকাশ করিলে, যশের ব্যাঘাত হইয়া যশোলিপ্সা প্রবৃত্তির চরিতার্থতার ব্যাঘাত হয়। অবিমিশ্র পরমুখী প্রবৃত্তি অন্যে চায়, একের স্বার্থের বিনিময়ে তাহাদের স্বার্থরক্ষামাত্র চায়; সেই স্বার্থরক্ষা হয় বলিয়াই মূল্যস্বরূপ যশঃকীর্ত্তন করে; স্বার্থপরতার ছায়াও থাকিলে যশোগান করিতে ইতস্তত করে। অবশ্য যশোলিপ্সা ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি যে নাই তাহা নহে; তাহার কথাই হইতেছে। পূর্ব্বকথিতশ্রেণীর রাজনৈতিক বা কবিকে যদি বলা যায়, "আপনার কার্য্যদ্বারা সংসারের উপকার হইতে পারে তাহা কিরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন?" অনেকে হাড়ে চটিয়া যাইবেন। "এরূপ সন্দেহ করে, এরূপ অর্ব্বাচীনও আছে? আমি জানি না, আমি বুঝি না, আমার ভুল হইতে পারে, ইহাও কি কখন সম্ভব?" কিন্তু প্রকাশ করিবার যো নাই; এই ভাব ব্যক্ত করিবার যো নাই; অন্য কথা বলিতে হইবে: "তাহা কি করিয়া জানিব; কাহারও উপকার হইতে পারে,

এই বিশ্বাসেই করিতেছি।" কিন্তু এই শ্রেণীর মধ্যে এমন কি কেহ নাই, যাহার নিজের উপর বিশ্বাসের মধ্যে এরূপ সন্দেহের স্থল আছে যে, তাঁহার কার্য্যের দ্বারা সংসারের উপকার না হইয়া অপকারও হইতে পারে? একটা নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করিলে বা একটা নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করিলে, তাহার ফল ভাল না হইতেও পারে? যাহার মনে এরূপ সন্দেহের স্থান আছে সে কি করিবে? হয় সে কিছু করিবে না; তাহার কার্য্য ফুরাইয়া যাইবে; প্রকৃতি, প্রবৃত্তির সহায়তায়, তাহার জীবন-স্রোত আর বেগবান করিতে পারিবে না, স্রোতে ভাঁটা পড়িয়া আসিবে; না হয়, তখনও সে রাজনীতি বা কাব্যকে ছাড়িতে পারিবে না। কেন পারিবে না? কিজন্য পুনরায় সে এই পথে দৌড়াইবে? কে তাহাকে দৌড় করাইতে পারে?—আর কেহই নহে—নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তি।

এখন দেখা যাউক, কোন্ শ্রেণীর লোকের প্রবৃত্তি উচ্চতর। নিজের বিদ্যাবুদ্ধির বিরুদ্ধে সন্দেহের স্থান যাহার মনে নাই, সে তো মূর্খেরই অবতারবিশেষ—তাহার প্রবৃত্তি মূর্খজনোচিত। সে সন্দেহ হৃদয়ে ধরিয়াও যিনি কার্য্য করেন, সেই কার্য্যের প্রণোদকপ্রবৃত্তি অবশ্যই উচ্চতর; অতএব যশোলিপ্সা বা উপচিকীর্ষা হইতে এই প্রবৃত্তি উচ্চতর। যদিও বর্ত্তমানে এই প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি নাই, ভবিষ্যতে ইহা বিশেষ বিকসিত হইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মনুষ্যমাত্রে যে প্রবৃত্তি সীমাবদ্ধ, তাহা অপেক্ষা যে প্রবৃত্তি বৃহত্তর জগতকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ, পশু-পক্ষীর প্রতিও যে প্রবৃত্তি ধাবমান হয়, সে প্রবৃত্তি উচ্চতর উপচিকীর্ষা। আবার যে প্রবৃত্তি প্রাণীজগৎ ছাড়াইয়া সমগ্রজগৎকে বেষ্টন করে, সে প্রবৃত্তি উপচিকীর্ষা হইতে শ্রেষ্ঠতর। সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, এই ভাব জ্ঞানজ। জ্ঞানজ হইলেও ইহা ভাব, সুতরাং অনুভবের বিষয়। যাহার হৃদয়ে এই ভাবের অঙ্কুর নাই, ইহা তাহার অনুভূত হইবে না—কাল্পনিক বলিয়া মনে হইবে।

আমরা দেখিয়াছি, দেহরক্ষী প্রবৃত্তি ভিন্ন, অন্য সমস্ত প্রবৃত্তিই আদিতে আদৌ অন্তঃকরণে স্বাধীনপ্রবৃত্তিরূপে স্থান পায় না; চর্চ্চার ফলে সেই স্থান প্রাপ্ত হয়। বহু উপকাণ্ডবিশিষ্ট (shoots) অতি প্রাচীন

বটবৃক্ষসমূহ দেখিলে দেখা যাইবে, তাহাদের কাহারও কাহারও আদিকাণ্ড শুষ্ক হইয়া লোপ পাইয়াছে; বর্ত্তমানে আর ঐ আদিকাণ্ড সেই বৃক্ষের প্রধান আশ্রয়ের স্থল নহে। প্রথম উদ্গমে যে উপকাণ্ড শাখাকে আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছিল, যাহার স্বাধীন অস্তিত্ব আদৌ ছিল না; বর্ত্তমানে সেই উপকাণ্ডই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে—বৃক্ষের মূলাশ্রয় হইয়াছে। আমাদের প্রবৃত্তিরাজ্যেও এইরূপ ঘটনা সর্ব্বদা ঘটিতেছে। পরাভিমুখী প্রবৃত্তি—যাহা প্রথমে আত্মরক্ষারই উপায় মাত্র ছিল—কালে তাহারই প্রাধান্য হইল; তাহা দ্বারা চালিত হইয়া লক্ষ লোক জীবন বিসর্জ্জন করিতে ধাবমান হইল। এরূপ কেন হয়, তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। স্নায়ুর ভিতর দিয়া কোন প্রবাহ একবার বহিয়া গেলে, স্নায়ুর ঐরূপ প্রবাহ বহনের উপযোগিতা বৃদ্ধি হয়; পুনঃপুন বহনে আরও বৃদ্ধি হয়; যে প্রবাহ আর অধিক বহিতেছে না, তাহার উপযোগিতা কমিয়া যায়; এইরূপে স্নায়ু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থান্তর প্রাপ্তির ফলে, যে সমস্ত প্রবৃত্তি আগে স্বাধীন ও প্রবল ছিল না, তাহার স্বাধীনতা ও প্রবলতা জন্মায়। আমাদের নিজের জীবনে এবং তদপেক্ষাও—জাতীয় জীবনে, প্রবৃত্তিবিশেষের বিশেষ অনুসরণের ফলই, জ্ঞানার্জ্জনী ও নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তিসমূহ।

এখন আমরা ষড়বিধ প্রবৃত্তি পাইলাম—

১। দেহরক্ষণী।

২। বংশোৎপাদিকা।

৩। পরাভিমুখী।

৪। জ্ঞানার্জ্জনী।

৫। ঈশ্বরমুখী।

৬। নির্ম্মাতৃকী।

ভিন্ন দিক দিয়া দেখিলে ইহার প্রথম চারিটা আবার দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হয়—

১। আপাতশরীরপ্রণোদিত (Sensual)

২। গৌণশরীরপ্রণোদিত (Emotional)

এই প্রবৃত্তির সংমিশ্রিত অবস্থাই সমাজে অনেক স্থলে মানুষকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। আমরা অনেক স্থলে প্রবৃত্তির অবিমিশ্র অবস্থা দেখিতে পাই না, একাধিক প্রবৃত্তির মিশ্রিত অবস্থা দেখিতে পাই। এই প্রবৃত্তি সমূহের অনুসরণই জীবনের জীবন; ইহার একের বা একাধিকের অনুসরণই জীবনের স্বার্থকতা; ধ্বংস ভিন্ন ইহাদের হস্ত হইতে নিস্কৃতি নাই।

পূর্ব্বে আমরা ক্রমবিকাশবাদে জীবজগতের আলোচনা করিয়াছি; পরে তাহা হইতে, "কি চাই" তাহা দেখিতে গিয়া, মনোজগতের আলোচনা করিলাম; এখন এই উভয়বিধ আলোচনা দ্বারা যে সমস্ত তত্ত্ব স্থিরীকৃত করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে, তাহার সাহায্যে মনুষ্যের কর্ম্মজগতের আলোচনা করিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কি করি ?

(কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি ?)

১। কর্ম্ম ইহকাল, না পরকালের জন্য করিতে হইবে ?

কি করি ?—মনুষ্য জীবনের ইহাই প্রধান প্রশ্ন, ইহার উত্তরই প্রধান মীমাংসা। এই প্রশ্নের উত্তর স্থিরীকৃত করিতে হইলে প্রথমেই বিচার্য্য হইতেছে—কর্ম্ম ইহকালের জন্য করিতে হইবে, না পরকালের জন্য, অথবা আংশিক ইহকাল আংশিক পরকালের জন্য করিতে হইবে। পরকালের জন্য কি কার্য্য করিতে হইবে ? পরকালের সাক্ষাৎ কোথায় পাইব ? যদি বলা যায়—শাস্ত্রাদিতে ; তাহাতে সম্যক্ বিশ্বাস করিবার যে বাধা আছে, পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে। নিজের জ্ঞানপ্রদর্শিত পথে চলিতে হইবে। এখন নিজের জ্ঞানের দ্বারা পরজন্মে যে যে বিষয়ের আবশ্যকতা হইবে, তাহা কি করিয়া স্থির করিব ? পিণ্ডাদি খাদ্যের প্রয়োজন তথায় হইবে কি ? যাঁহারা মৃত ব্যক্তির আত্মার সহিত সর্ব্বদা আলাপপ্রলাপ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিবেন ; আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তির এরূপ উচ্চপদস্থ জীবের সহিত আলাপ পরিচয় হইবার সুবিধা নাই ; কাজেই জ্ঞানের দ্বারা সেই রাজ্যের কল্পনা করা ভিন্ন চাক্ষুষ বা শ্রৌত জ্ঞানলাভের উপায় আপাতত নাই। পঞ্চভূতাত্মক দেহের কোন অংশই যখন সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া যায় না, তখন কদলীতণ্ডুলাদির প্রয়োজনীয়তা সঙ্গে লইয়া যাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ স্থল। তদভাবে সৎকর্ম্মের উপযোগিতা কল্পনা করা হইয়া থাকে। ইহজীবনে এই সমস্ত সৎকর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া রাখিলাম, পরজন্মে ভাঙ্গাইয়া খাইব। এই সৎকর্ম্ম ত্রিবিধ : আত্মনিগ্রহ, পরোপকার, ঈশ্বরোপাসনা। আত্মনিগ্রহের দ্বারা পরকালের জন্য যে বিশেষ কিছু সঞ্চয় হইতে পারে, সভ্যসমাজে তাহা আর কেহ বিশ্বাস করিতে চাহে না। বর্ব্বরসমাজের

দেবতা—যাহারা সেই সমাজের অধিপতিগণের ন্যায় বা তদপেক্ষা বেশী হিংস্রনির্দ্দয়—তাহারা এরূপ স্বকৃত যন্ত্রণাভোগ দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে এবং দয়া করিয়া পরজন্মের কিছু ব্যবস্থা করিতে পারে, কিন্তু সভ্য সমাজের দেবতারা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিবেন কিনা সন্দেহ। নিম্নশ্রেণীর সমাজের এরূপ বিশ্বাস হইতেই আত্মনিগ্রহের ব্যবস্থা উঠিয়াছে; ইহার আর কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

পরোপকার করিলেই বা পরলোকের ব্যাঙ্কে তাহা জমা হইবে কেন? অনেক সময় ইহলোকেই ত তাহার সম্পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া যায়; লোকের নিকট শ্রদ্ধা পাওয়া যায়, ভক্তি পাওয়া যায়; তবে আয় জমা খরচে উদ্বৃত্ত থাকিল কি যে ব্যাঙ্কে জমা হইবে? আর যে স্থলে না পাওয়া যায়, সে স্থলে নিজের হৃদয়ের তৃপ্তি পাওয়া যায়। যে তাহা পায় না বা তাহাই যথেষ্ট প্রতিদান বলিয়া মনে করে না, সে পরোপকার করিবার অযোগ্য; ইহকাল, পরকাল, প্রলয়কাল, কোনকালেই তাহার জন্য কিছুই সঞ্চিত হয় না। যদি এমন হইত, ক্ষুধার্ত্তকে একপেট খাইতে দিলে নিজের প্রাণে জ্বালা উপস্থিত হইত; তাহা হইলে বরং কল্পনা করা যাইতে পারিত যে, তাহাকে খাওয়াইয়া কিছু সঞ্চয় করিলাম। মজ্জমান ব্যক্তির জীবন দান করিয়া নিজে ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা হইত, বালকের হস্তে ক্রীড়নক দিয়া তাহার হাসি দেখিয়া নিজের যাতনা উপস্থিত হইত, তবে বুঝিতাম কিছু সঞ্চয় হইল। আর প্রতিদান নাই পাইলাম; পরোপকার করিয়া ইহজীবনেই কি আমরা প্রতিদান পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠি? পরকালে কি আমরা নিকৃষ্টতর জীব হইব? বলা যাইতে পারে: একশ্রেণীর লোক পরোপকার করে না, আর একশ্রেণীর লোকে করে; যাহারা করে তাহাদের জন্য কি কিছু সঞ্চিত হইবে না? যাহারা করে না তাহাদের অপেক্ষা উচ্চ আসন সংস্থিত হইবে না? কেন হইবে? যাহারা করে না, ইহ জন্মেই তাহারা নিম্নতর জীবনই উপভোগ করে, তাহাদের শাস্তি এখানেই হয়। অতি উচ্চ রাজকীয় পদ বা প্রভূত ধনসম্পদ লাভ করিলেও, পরের দুঃখমোচনজনিত তৃপ্তির অভাবে উচ্চজীবন লাভ করে না। বিপদবিপন্ন

জীববিশেষ পদবৃদ্ধিসহকারে চতুষ্পদে পরিণত হয় ভিন্ন, আর কিছুই হয় না। কিন্তু যে স্থলে এ জীবনে কোনই প্রতিদান হইল না? যে নরপিশাচ শতশত লোককে ভীষণ যন্ত্রণাসহকারে বধ করিয়া, শতশত পতিব্রতার সতীত্ব বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া, সুখে স্বচ্ছন্দে নিরদ্বেগ চিত্তে কাটাইয়া গেল; আর যে ব্যক্তি নির্জ্জন স্থানে অন্য ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজেও মরিল, কেহ দেখিল না শুনিল না বা সংসারের কোন উপকার হইল না; ইহারা উভয়ে কি পরকালে একইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে? হইত না, যদি তুমি আমি জগতের কর্ত্তা হইতাম। কিন্তু যে কর্ত্তা, সে নিতান্তই যে ভিন্ন প্রকৃতির লোক, তাহা পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। তিনি যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহার কাছে আমাদের কল্পিত শাস্তি বা পুরস্কার হয়ত নিতান্তই অপর্য্যাপ্ত; সে ব্যবস্থা হয়ত শাস্তিও নহে পুরস্কারও নহে; তাহা কি, আমাদের জানিবার উপায় নাই; কেন এরূপ করেন, অন্যরূপ ব্যবস্থা কেন করেন না, বুঝিবার উপায় নাই; তবে এই পর্য্যন্ত মনে করিবার বাধা নাই যে, তাঁহার ব্যবস্থা হয়ত আমাদের ব্যবস্থা হইতে নিতান্ত মন্দ নয়।

ঈশ্বরোপাসনা কি বিশেষ দুঃখকর ব্যাপার? ইহা অপেক্ষা কি সুখের কার্য্য আর আছে? যদি না থাকে তবে এ কার্য্য দ্বারাও পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় হইতে পারে না, ইহকালেই যথেষ্ট প্রতিদান পাওয়া যায়। যদি বলা যায়, ইহা এমনই মহৎব্যাপার যে ইহকালে সুখ হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়; তাহা হইলেও পরকালে এই উদ্বৃত্তাংশের ফল কিরূপ হইবে, আমরা যাহাকে ভাল বলি কি মন্দ বলি তাহার কোনরূপ হইবে কি না, আমরা যাহাকে ফল বলি তাহাও হইবে কি না, কিছুই হইবে কি না, হওয়া না হওয়ার যে ভাব তাহা ছাড়াইয়া যাইবে কি না, কিছুই বলা যায় না। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, পরকাল যদি বাস্তবিকই অজ্ঞেয় হয়, তবে এস্থলের মত সেস্থলে কিছুই হইবে না। ঈশ্বরোপাসনা করিলে পরকালের জন্য কিছু সঞ্চিত হয় বলিলে, আর তাহা অজ্ঞেয় রহিল না, জ্ঞেয় হইল। ইহা জ্ঞেয় হইতে পারে না, ইহা ইন্দ্রিয় সংস্পর্শাতীত। বাস্তবিকই যদি অজ্ঞেয় হয়, তবে ইহার উদ্দেশে কোন

কার্য্যের যথার্থকল্পনা হইতে পারে না। কালসহকারে নূতন নূতন ইন্দ্রিয়স্ফুরণও স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়কে বাদ দিয়া কোন জ্ঞানের সম্ভাবনা আদৌ স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে সৃষ্টির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে অজ্ঞেয়বাদের বর্ণনা করা গিয়াছে, পরকাল সম্বন্ধেও সেই অজ্ঞেয়বাদই একমাত্র সম্বল। আমরা মানুষ; যাহা আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত, তাহাকে নিজের আকারে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করি—দেবতাগঠন সম্বন্ধে এ বিষয় সবিস্তারে বলা হইয়াছে। পরলোক সম্বন্ধেও তাহাই করি। পরকালকে যে ভাবে গঠন করা হয়, তাহা মনুষ্যাকার ভূতের গঠন (Anthropomorfic phantom) মাত্র; জ্ঞানের দ্বারা ঝাড়িলে তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না। ইহলোকের উপাদান দিয়া পরলোককে গঠন করিয়া কিছুমাত্র লাভ নাই; ইহার অজ্ঞেয়ত্ব সরলভাবে স্বীকার করাই ভাল। তাহা না করিয়া, অজ্ঞেয়ের দ্বারা জ্ঞেয়কে বিকৃত করিবার চেষ্টা করা গর্হিত। অজ্ঞেয় পরকালের সমস্তই অজ্ঞেয়; তথা কার অবস্থা, তথাকার কর্ত্তব্য, তথাকার আবশ্যকতা, সেখানকার জন্য কার্য্যের আবশ্যকতা আছে কি না, সমস্তই অজ্ঞেয়। সেই অজ্ঞেয় পরকালের অজ্ঞেয় কর্ত্তব্যের দ্বারা ইহকালের কর্ত্তব্যকে রঞ্জিত করা নিতান্ত বিড়ম্বনা।

২। প্রবৃত্তির অনুসরণ করিব—না নিবৃত্তির অনুসরণ করিব?

কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে: প্রবৃত্তির অনুসরণ করিব—না প্রত্যাহার করিব? পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, জীবনে একটুকু রস থাকিতে প্রত্যাহার করিবার উপায় নাই; আর যদি তাহাও না থাকে, তবে প্রবৃত্তি আপনিই ধ্বংসের পথ দেখাইয়া বৃক্ষমূলে বা গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবে। অতএব প্রমাণ হইল: ১ম। ইহকালেরই কাজ করিতে হইবে; ২য়। প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে হইবে।

৩। প্রবৃত্তির অনুসরণ না করিয়া বিবেকের অনুসরণ করা উচিত কি না?

প্রবৃত্তির অনুসরণ করাটা উচ্চ অঙ্গের কার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে না, বিবেকের (conscience) অনুসরণ করিলে কেমন হয়? এটা এদেশের কথা নহে, বিলাতী কথা। বিবেক কাহাকে বলে? মানুষের

মনের ভালমন্দ বিচার করিবার যে স্বাভাবিক শক্তি, তাহাকেই লোকে বিবেক বলে। এই শক্তির অবস্থাটা দেখা যাউক। অন্ধকার রাত্রে লোকালয় হইতে বহুদূরে এক সালঙ্কৃতা সুন্দরী একাকী চলিয়া যাইতেছে; এমন সময় একজন হিন্দুব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল; তাহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া যথাস্থানে পৌছাইয়া দিল। সকলেই কি এইরূপ আচরণ করিবে? হিংস্র বন্যজাতীয় লোক কি তাহা করিবে? প্রথমত, এই স্ত্রীলোকের গলা চাপিয়া ধরিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার উত্তম সুযোগ—কেহ দেখিবে না, কেহ জানিবে না, কোন শাস্তির আশঙ্কা নাই; দ্বিতীয়ত, ইহার অলঙ্কার আত্মসাৎ করিয়া ভবিষ্যতের সংস্থান করিবার তদ্বৎ সুযোগ; তৃতীয়ত, লগুড়াঘাত দ্বারা ইহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ভবিষ্যৎ বিপৎপাতের আশঙ্কা সমূলে উৎপাটন করিবার ততোধিক সুযোগ রহিয়াছে। এই সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবে, সংসারে এরূপ লোক বিরল নহে। তবে আর বিবেক কোথায় থাকিল? মানুষের মনে ভালমন্দ বিচারের স্বাভাবিক শক্তি কই? ব্রাহ্মণ যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিল, বর্ব্বর তদ্বিপরীত কর্ত্তব্য অবধারণ করিল। কাজেই প্রশ্নকে সংশোধিত করিয়া বলিতে হইতেছে: অসভ্য সমাজের কথা হইতেছে না, সভ্য সমাজের কথা হইতেছে। সভ্যসমাজস্থ চণ্ডালেরও ঐ কার্য্য করিবার সময় অন্তঃকরণ বলিয়া দিবে যে, সে মন্দ কাজ করিতেছে ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, একই সমাজে বালক ও বৃদ্ধ উভয়ে বিভিন্নরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন হয় কেন? পুনরায় পূর্ব্ব প্রশ্নের সংস্কার আবশ্যক হইল: সভ্যসমাজের বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিবেকসম্পন্ন, বালক নহে; বালকের বুদ্ধির পরিণতি হয় নাই। তাহা হইলে একটা কথা পাওয়া গেল: বিবেকবুদ্ধির পরিণতি আছে, চর্চ্চার আবশ্যকতা আছে, চর্চ্চা না করিলে সেই পরিণতি হয় না। সভ্য বলিয়া পরিচিত সমাজ-বিশেষে ব্যক্তিবিশেষ, অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী একটী গৃহে স্থাপনা করা বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবেন; আবার সেই সমাজের অন্যতম ব্যক্তি ইহা অতি গর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করিবেন। পিতৃআজ্ঞায় পরশুরাম মাতার মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন; মাতৃআজ্ঞায় পঞ্চদশায়

একজন নিজের পদে নিজে কুঠারাঘাত করাই কর্ত্তব্য মনে করিবে, অন্য একজন করিবে না। নিজের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া পরের উপকার করা কেহ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবে, কেহ করিবে না।—তবে আর বিবেক রহিল কোথায়? বিবেকদ্বারা পরিচালিত হইয়া যখন পরস্পরবিরোধী কার্য্য করা যাইতে পারে, তখন বিবেককে আমাদের জীবনতরীর কর্ণধার নিযুক্ত করিয়া সন্তুষ্ট থাকা যাইতে পারে না। আবার ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য ছাড়িয়া দিয়া সামাজিক কর্ত্তব্যের কথা ধরিলে, কর্ত্তব্যাবধারণ পক্ষে বিবেক নিতান্তই অপর্য্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সর্ব্বদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দেখা যায়, যথা—চরমপন্থী, সংযমপন্থী, Liberal, Unionist, Socialist; নানারূপ সমাজনৈতিক দল দেখা যায়, যথা—প্রাচীনমতাবলম্বী, প্রতীচ্যমতাবলম্বী, আধুনিকমতাবলম্বী। ইহাদিগের মধ্যে আবার অসংখ্য পর্য্যায়। ইহাদের সকলকেই প্রতারক বলা যাইতে পারে না, অনেকেই কর্ত্তব্যবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া দলবদ্ধ হইয়াছেন বলিতে হইবে। আবার ইহাও দেখা যায়, প্রত্যেক দলই অপর দল হইতে লোক সংগ্রহে ব্যস্ত; বুঝাইতে ব্যস্ত যে, তাহারাই ঠিক কার্য্য করিতেছে, অন্য সকলে ভুল করিতেছে। এই প্রচার কার্য্যে যথেষ্ট চেষ্টা, উৎসাহ, অর্থব্যয় হইতে দেখা যায়; তাহার ফলে কখন কখন ব্যক্তি বিশেষের কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। অতএব বিবেকও পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তন কে ঘটায়? সে বিবেক অপেক্ষা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ? তাহাকেই জীবনতরীর কর্ণধার করিতে হইবে। সাধারণ সভ্য সমাজেও এই বিবেকবুদ্ধির পরিণতি বড় বেশী নয়। আমার একখানি বাড়ী আছে, তাহা বিক্রয় উপলক্ষে দর চাহিলাম—বার হাজার টাকা; কিন্তু তাহার ন্যায্য বাজার দর—দশ হাজার টাকা মাত্র। আবার যখন আমিই ক্রেতা, তখন সেই মূল্যের বাড়ী আট হাজার টাকায় খরিদের চেষ্টা করি। ইহা কি অকর্ত্তব্য নহে? কিন্তু তাহা যে অকর্ত্তব্য, কয়জন লোক তাহা জানে? এমনও দেখা যায় যে, প্রকৃত টেক্স না দিয়া যে সামান্য টেক্স দিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে ঠকায়, সমাজে তাহার বিশেষ নিন্দা না হইয়া বরং তাহার চতুরতার প্রশংসা হয়।

নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া দেখা গিয়াছে, সভ্যসমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিগণই বিভিন্ন উত্তর দিয়াছেন।

১। রামচন্দ্র সীতাদেবীকে নির্দ্দোষী জানিয়াও পরিত্যাগ করিয়া ভাল করিয়াছিলেন কি মন্দ করিয়াছিলেন?

২। মার্শাল নে, এল্‌বা হইতে প্রত্যাগত নেপোলিয়ানের পক্ষাবলম্বন করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তিনি ভাল করিয়াছিলেন কি মন্দ করিয়াছিলেন?

৩। দেবীচৌধুরাণীর ভবানী পাঠক, ইংরাজের নিকট স্বইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া দণ্ডের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই কার্য্য ভাল করিয়াছিলেন কি মন্দ করিয়াছিলেন?

৪। কাহারও স্নেহময় পিতা, পুত্রের সম্মুখে একটি মনুষ্য হত্যা করিল। বিচারস্থলে পুত্র সত্য কথা বলিবে, কি মিথ্যা বলিবে, না সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিবে?

৫। ঐরূপ অবস্থা; কিন্তু এস্থলে হত্যাকারী—স্ত্রী অথবা স্বামী।

৬। ঐরূপ অবস্থা; কিন্তু এস্থলে হত্যাকারী যে ব্যক্তি, তাহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ, সে আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল।

৭। রাম, শ্যামকে দশ হাজার মুদ্রা দিয়া তাহাকে রক্ষা করিল; এই দান সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে করিল। হরি, প্যারীকে ঐরূপ দান করিল; কিন্তু বলিয়া দিল "তোমাকে ঐ পরিমাণে কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে।" কাহার দান শ্রেষ্ঠ?

তাহা হইলে প্রমাণ হইতেছে, বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে পরস্পরবিরোধী কার্য্যও করিয়া থাকে। বিরোধী কার্য্যের উভয়টাই কখন কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে পারে না। অতএব কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের অন্য পথ আছে কিনা দেখিতে হইবে। তবে যে লোকে মনে করে, বিবেকের দ্বারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে, তাহার কারণ বিবেকের জীবনেতিহাসের মধ্যেই ব্যক্ত রহিয়াছে। "চুরি করিও না," "মিথ্যা কথা কহিও না," মানুষ বিবেকের শাসন বা ধর্ম্মের শাসনের দ্বারা এই সত্যের অনুভব করিবার পূর্ব্বেই ইহার উপকার অনুভব করিয়াছে। ইহা দ্বারা সমাজের

উপকার হইয়াছে, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের উপকার হইয়াছে, ঐ উপকার অনুভব করিয়া সমাজের অধিকাংশ লোক ইহার চর্চ্চা করিয়াছে ; ঐরূপ চর্চ্চাবশত প্রবৃত্তি ইহার অনুকূল হইয়াছে দেখিয়া, পরে ধর্ম্মশাস্ত্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বহুবৎসর ধরিয়া এই উপকার অনুভব করিয়া, সমাজ ও ধর্ম্মের দ্বারা শাসিত হইয়া, মানুষের মনে ইহা বিশেষরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে। এখন আর আমরা সে উপকারের কথা মনে করি না ; চুরি না করার উদ্দেশ্য, বিবেকের অনুশাসন পালনই মনে করি। কিন্তু তাহা নহে, ইহার চরম উদ্দেশ্য সমাজের সুখস্বচ্ছন্দতা। চুরি না করা, মিথ্যা কথা না কহার উদ্দেশ্য যে ইহা, তাহার একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কোন রোগীর পীড়া অত্যন্ত কঠিন হইল। বৈদ্যের তাহাকে সত্য কথা বলা নিষিদ্ধ, মিথ্যা বলিতে হইবে ; বলিতে হইবে যে, তাহার রোগ নিতান্তই সহজ, সত্বরই আরোগ্য হইয়া যাইবে ; সত্য কথা বলিলে, তাহার রোগ অত্যন্ত কঠিন বলিলে, ভয় পাইয়া রোগীর অত্যন্ত অপকার হইতে পারে। অতএব প্রমাণ হইতেছে, সত্যই লক্ষ্য নহে, সমাজের উপকারই লক্ষ্যস্থল। অনেক স্থলে এই উদ্দেশ্য কিরূপে সাধিত হইতে পারে, বিশেষ শিক্ষা, চর্চ্চা না করিয়াও তাহা স্থির করা যাইতে পারে ; সেস্থলে বিবেকই যথেষ্ট। কিন্তু অনেক স্থলে তাহা যায় না ; সে স্থলের জন্য অন্য উপায় আবশ্যক।

৪। পরের উপকার করাই কর্ত্তব্য।

এ ব্যবস্থার কয়েকটী দোষ আছে। প্রথম দোষ : পরোপকার একমাত্র এবং মুখ্য লক্ষ্য হইতে পারে না, তাহা হইলে নিজের জীবন ও সামর্থ্য রক্ষা হয় না। পরোপকার করিতে হইলে অগ্রে নিজের জীবন ও সামর্থ্য রক্ষা এবং অর্জ্জন করিতে হইবে, তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে হইবে ; পরোপকার গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র হইতে পারে। ইহার বিরুদ্ধে কেহ বলিতে পারেন—

"তাহা হউক, কিন্তু জীবন ও সামর্থ্যের উদ্দেশ্য পরোপকার, এইরূপ মনে করিলে পরোপকারই মুখ্য এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হইল।"

যদি বলি পরোপকার করিব কেন?

"তোমার তৃপ্তি হইবে।"

তবেই, পরোপকার চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না; আমার তৃপ্তিই আমার চরম উদ্দেশ্য হইয়া গেল।

"তোমার তৃপ্তি নহে ঈশ্বরের কাজ করা হইবে"

ইহারও ঐ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে: ঈশ্বরের কাজ করিব কেন? তাঁহার কাজ তিনিই করুন। পরকালে সদগতি হইবে, যখন আর এই কথা বলিবার স্থান নাই, তখন নিজের তৃপ্তি পুনরায় চরম উদ্দেশ্য হইয়া পড়িতেছে।

"নিজের তৃপ্তির জন্যই তবে তাহা কর; পরোপকারে নিজের তৃপ্তি হয়, এরূপ অভ্যাস কর।"

কথা খুব উচ্চ অঙ্গের হইল; কিন্তু ইহার উপরেও কথা আছে:—প্রকৃতি নিজের কাজ করিতে তোমাকে যতটা শিখাইয়াছে, পরের কাজ করিতে ততটা শিখায় নাই; নিজের কাজই কর, কিন্তু নিজের কাজ কাহাকে বলে জানিতে হইবে।

একমাত্রপরোপকার ব্রতের দ্বিতীয় দোষ: যে ব্যবস্থা আদর্শসমাজে খাটে না, তাহাকে আদর্শব্যবস্থা বলা যায় না। পরের উপকার করা আদর্শসমাজে চলে না, পরের উপকারের স্থল সেথায় নাই। যেখানে সকলেই পরের নিঃস্বার্থসাহায্য ব্যতীত, নিজের উপায় নিজেই করিতে সমর্থ, সেই আদর্শ সমাজ; সেখানে উপকারের স্থল কোথায়? আর উপকার করিলেই বা তাহা গ্রহণ করিবে কে? যদি পরোপকার করাই আদর্শসমাজের মূলমন্ত্র হয়, তবে তোমার কৃত উপকার কেহই লইবে না; বরং তোমাকেই উপকার প্রদান করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিবে। পরোপকার সমাজের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইলে, সমাজ চলিতে পারে না।

৩য় দোষ: সমাজের যত উন্নত অবস্থা হইবে, তত নিজের কাজ না করিয়া পরের কাজ করিয়া বেড়াইলে আলস্য, অকর্ম্মণ্যতা ও

অযোগ্যতার বৃদ্ধি হইবে। সমাজের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত ও যোগ্য, তাহারাই পরের কাজ করিয়া বেড়াইবে; যাহারা অযোগ্য ও অলস, তাহারা বসিয়া বসিয়া খাইবে। ফলে, অযোগ্য ব্যক্তিগণের বংশবৃদ্ধি হইবে। এই অযোগ্য স্ত্রীপুরুষের বংশধরগণ সমধিক অযোগ্য হইবে, আবার তাহাদের বংশধরগণ আরও অযোগ্য হইবে, যোগ্য ব্যক্তির বংশবৃদ্ধি ও সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইবে; এইরূপে সমাজ উচ্ছন্নে যাইবে।

"তাহা হইবে না; অযোগ্য ব্যক্তিগণ যোগ্য ব্যক্তির সাহায্যে যোগ্য হইয়া উঠিবে; সমাজের উপকার হইবে।"

ত্রিবিধ উপায়ে অযোগ্যকে যোগ্য করা যাইতে পারে: আকস্মিক বিপৎপাত হইতে তাহার শরীর ও প্রাণরক্ষার দ্বারা এবং শিক্ষালাভ পক্ষে সহায়তার দ্বারা। এই ত্রিবিধ সাহায্য ভিন্ন, অন্যরূপ সাহায্যে তাহার উপকার না হইয়া অপকার হইবে; সে যোগ্যতর না হইয়া অধিকতর অযোগ্য হইয়া যাইবে।

"নিজের জীবন ও সামর্থ্য অর্জ্জনের কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া অবশিষ্ট সময় এইরূপ পরোপকারের জন্যই ব্যয় কর।"

এ ব্যবস্থার দুইটা দোষ আছে। প্রথম দোষ: জীবন ও সামর্থ্য অর্জ্জনের শেষ নাই; সম্যক্‌ভাবে ইহা অর্জ্জন করিতে হইলে পরোপকারের অবসর থাকে না। দ্বিতীয় দোষ: নিজের জীবন অন্যের কার্য্যে অতিবাহিত করিলে, হয়ত যে আমার অপেক্ষা অযোগ্য তাহারই কার্য্য করা হইবে। আমি যদি তাহার অপেক্ষা যোগ্য হই, তাহা হইলে নিজের যোগ্যতা বৃদ্ধি করিলে সমাজের অধিকতর মঙ্গল হইত; যে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য, তাহার কার্য্য করিয়া সমাজে আপেক্ষিক অযোগ্যতার বৃদ্ধি করিলাম মাত্র। ধর, সমাজে তিন জন লোক আছে—ক, খ, গ; ইহাদের লইয়াই সমাজ। এখন সমাজের মঙ্গল অর্থে, ক, খ, গ এর সমবেত মঙ্গল। সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি "ক" নিজের শক্তিশালিতা খর্ব্ব করিয়া "খ" ও "গ" এর শক্তি বৃদ্ধি করিতে গেলে, মোটের উপর সমবেত শক্তি বৃদ্ধি হইল, কি ক্ষয় হইল, তাহা দেখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। আরও বিশেষ কথা হইতেছে যে, কাহারও ভাল হইল কি মন্দ হইল,

তাহাতে আমার কি? আমি কেন অপরকে সাহায্য করিতে যাইব? পরোপকারবাদী ইহার কি সদুত্তর দিতে পারেন?

"সমাজের উপকার হইবে।"

তাহাতে আমার কি?

"সমাজের উপকার হইলে তোমার উপকার।"

তবেই পরোপকার লক্ষ্যস্থল নয়, মুখ্যও নহে, গৌণও নহে; আমার উপকারই আমার লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়িল।

"তবে আর কি করিবে? আত্মসুখের অনুসরণ কর, পাশবরৃত্তি চরিতার্থ কর।"

সর্ব্বদা পাশবরৃত্তির অনুসরণ করিয়া আত্মসুখ লাভ করিবার যে সুবিধা নাই, তাহা পূর্ব্বোক্ত সালঙ্কৃতা সুন্দরীর উদাহরণে দেখান গিয়াছে। তবে, পাশবপ্রবৃত্তির না হইলেও, সুখের অনুসরণ করা যাইতে পারে বটে। সুখ দ্বিবিধ: প্রথম, সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়লব্ধ—যথা আহার, নিদ্রা; তৃপ্তিজনক খাদ্যের সহিত রসনার সংযোগ, নাসিকার উপযোগী ঘ্রাণের সহিত তৎ-সংযোগ ইত্যাদি। আর এক শ্রেণীর সুখ আছে যাহা গৌণ ইন্দ্রিয়লব্ধ। মুখ্য বা গৌণ ইন্দ্রিয়সংযোগ জনিত সুখ ভিন্ন, অন্য কোনরূপ সুখ নাই; তবে অনেকস্থলে ইন্দ্রিয়সংযোগ হইতে এই সুখ এত দূরে সরিয়া গিয়াছে যে, তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্রব খুঁজিয়া পাওয়াই কঠিন। পরাভিমুখী প্রবৃত্তি সমস্তই যে গৌণ, অর্থাৎ জাতীয় দেহরক্ষামূলক প্রবৃত্তি, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। জাতীয় দেহরক্ষামূলক প্রবৃত্তিই পরাভিমুখী প্রবৃত্তি। ইহা কিন্তু প্রবৃত্তি এবং আমার প্রবৃত্তি; আমার প্রবৃত্তি না হইলে, ইহা আমার নহে। এই প্রবৃত্তিই অন্যের সহিত আমার সংযোগ সাধন করিয়াছে, অন্যথায় অন্যের সহিত সম্বন্ধ নাই, আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই প্রবৃত্তিই পরের কাজ আমার নিজের কাজে পরিণত করিয়াছে, অন্যথায় তাহা নিজের কাজ হয় না।

৫। সুখ কাহাকে বলে?

আমরা দেখিয়াছি, সুখ দ্বিবিধ; তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়জ ও মনোজ সুখ বলা যাউক। একটী ইন্দ্রিয়জ সুখ—আহার। সকল দ্রব্য আহারই

সুখের নহে, দেহের উপযোগী আহারই সুখের; আমাদের জিহ্বা হইতেছে পরীক্ষক, যাহা উপযোগী তাহা পরীক্ষা করিয়া জানাইয়া দেয়। দ্রব্য বিশেষের সুস্বাদুত্ব নির্ভর করে কাহার উপর? দেহের গঠনের উপর। দেহ, নিজের অনুকূল পদার্থ সঞ্চয় করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, ঐ অনুকূল পদার্থ পাইলে সুখী হয় ও পুষ্টি লাভ করে; পুষ্টি লাভ করে বলিয়াই সুখী হয়। অতএব, দেহের মধ্যে পূর্ব্বসঞ্চিত উপাদানই তাহার সুখের ব্যবস্থাপক। ইন্দ্রিয়জ সুখ মাত্রেই এই কথা বলা যাইতে পারে; ইহা দেহের প্রবৃত্তি। অতএব, সুখ মুখ্য পদার্থ নহে, প্রবৃত্তিই মুখ্য পদার্থ। দেহের এইরূপ উপাদান এবং তজ্জনিত এইরূপ প্রবৃত্তি না হইলে, দ্রব্যবিশেষ আহারে সুখ হইত না বা দুঃখও হইত না; অতএব সুখ দুঃখ, প্রবৃত্তির অনুকূলতা বা বিরুদ্ধাচরণ মাত্র, আর কিছুই নহে। মনোজ সুখ দুঃখও তাহাই। যে সঞ্চিত উপাদান মনকে গঠন করিয়াছে, মন তাহার অনুকূল বস্তু প্রাপ্ত হইলে সুখী হয়, প্রতিকূল বস্তুর আঘাত প্রাপ্ত হইলে দুঃখিত হয়। অতএব প্রবৃত্তির অনুসরণ করাই শরীর ও মনের ধর্ম্ম; সুখের অনুসরণ বলা যাইতে পারে না। মদ্যপায়ী, অহিফেনসেবী যে পথে যায়, তাহা অন্যের পক্ষে সুখের পথ নহে, বিষম দুঃখের পথ; প্রবৃত্তির হিসাবেই তাহা তাহাদের সুখের পথ; মাদকের প্রবৃত্তির উপযোগী উপাদান বহুকষ্টে দেহ মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছে বলিয়াই, ইহা তাহাদের সুখের পথ, ইহা তাহাদের প্রবৃত্তির অনুকূল পথ। অতএব সুখের অনুসরণ মানবের ধর্ম্ম না বলিয়া, প্রবৃত্তির অনুসরণই তাহার ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। অন্যান্য ধর্ম্ম যেমন ইচ্ছানুসারে গ্রহণ বা ত্যাগ করা যায়, স্বীকার বা অস্বীকার করা যায়, ইহা তাহা করা যায় না; এ ধর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না। আরব্য উপন্যাসের বনমানুষের ন্যায় ইহাকে স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতেই হইবে, ইহার আলিঙ্গন হইতে স্কন্ধকে উন্মুক্ত করিবার উপায় নাই; ইহাকে শুভদৃষ্টিতে দেখিতে পারিলে তাহার প্রয়োজনীয়তাও নাই।

আদিম এবং সর্ব্বপ্রধান প্রবৃত্তি হইতেছে—দেহবর্দ্ধক প্রবৃত্তি। দেহরক্ষণী প্রবৃত্তি ইহার অন্তর্গত; কারণ, দেহ রক্ষা না হইলে দেহ বর্দ্ধন

হয় না। এই প্রবৃত্তির কল্যাণেই, এই প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াই, ক্ষুদ্র কীটাণু বৃহৎ জীবে পরিণত হইয়াছে; ক্ষুদ্র দেহ বৃহৎ দেহে পরিণত হইয়াছে; ক্ষুদ্র মন বৃহৎ মনে পরিণত হইয়াছে। এই প্রবৃত্তি না থাকিলে তাহা হইত না, জীবের উন্নতি হইত না, মনের উন্নতি হইত না; কল্পনারও উন্নতি হইত না। সুখ দুঃখ এই দেহবর্দ্ধক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা বা প্রতিকূলতা মাত্র। দেহবর্দ্ধন আবার কাহাকে বলে তাহা বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। দেহ বহু উপকরণে গঠিত। ঐ সমস্ত উপকরণ আবার বহুবিধ ভাবে সজ্জিত। প্রত্যেক দেহেরই উপকরণের ও সজ্জার পার্থক্য আছে। একের শরীরে যে উপকরণ আছে, একের পক্ষে যাহা শরীরের পুষ্টি, অন্তের শরীরে সে উপকরণের অভাব থাকিলে, তাহা তাহার পুষ্টি নহে—হয়ত ক্ষয়বিধায়ক। শরীর-বিশেষের উপাদান যে ভাবে সজ্জিত আছে, বাহ্যবস্তু হইতে যে এক প্রকারের শক্তি তাহাতে আঘাত করিলে সেই সজ্জার সহায়তা হয়, সেই আঘাতও তাহার দেহ বর্দ্ধক; অন্যরূপ আঘাত সেই সজ্জার বৈপরিত্য উপস্থিত করিয়া অল্পবিস্তর দেহ ধ্বংসক হয়। মদ্য, অহিফেন, তাম্রকুট-সেবী, তাহার দেহকে এই সমস্ত উপাদানের দ্বারা আংশিক গঠিত ও সজ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। এই উপাদান না পাইলে তাহার দেহের সাময়িক ক্ষয় বা অভাবের অনুভূতি হয়। ইহা পাইলে সেই অভাব পূরণ হয়, তজ্জন্য সুখানুভব হয়। মাদকাদির উপাদান, কালে দেহের ধ্বংসবিধায়ক হইলেও আপাতত মোটের উপর, তাহা হইতেছে না। মন সম্বন্ধেও এইরূপ অবস্থা হয়। মনের ভিতর যে প্রবৃত্তির উপাদান বহুল পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে, সেই উপাদানের সংযোগই তাহার বৃদ্ধি এবং সুখ। পরাভিমুখী প্রবৃত্তি যে বহুলপরিমাণে সঞ্চিত করিয়াছে, পরের উপকারই তাহার সুখ, অন্যান্য প্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত ধ্বংস করিয়াও সুখ। কারণ, মনের ইহাই প্রধান সাময়িক উপাদান হইয়া পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে সুখদুঃখের আলোচনা বিশেষ জটীল। তাহা না করিয়া দার্শনিক হিসাবে এই আলোচনার শেষ করিতে হইবে। প্রবন্ধান্তরে সুখদুঃখ অনুভবের বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা বিশেষভাবে করা যাইবে।

এস্থলে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। জীবের প্রথম অবস্থা—ক্রিমিকীট। ইহারা তরল পদার্থের ভিতর জন্মায়। রক্তের ভিতর বহু ক্রিমিকীট আছে। এই রক্তের ভিতরই তাহাদের আহার্য্য রহিয়াছে। মনে করা যাউক, ইহার একটীকে স্থানান্তরিত করিয়া বিশুদ্ধ জলের ভিতর নিক্ষেপ করা গেল। জল তাহার আহার্য্য নহে। কিছু কাল পরেই সে আহার্য্যের অনুভব করিতে থাকিবে, তাহার দেহ ক্ষয় হইতে থাকিবে। এই জলকে ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত করিলে আরও শীঘ্র ক্ষয় হইতে থাকিবে। জলকে উত্তপ্ত না করিয়া তাহাতে রক্ত প্রক্ষেপ করিলে, এই কীটাণু তাহার আহার্য্য পাইয়া দেহপুষ্টি করিতে থাকিবে। এখন এই প্রথমাবস্থার জীবের যদি কোন সুখদুঃখ থাকে, তবে তাহা এই পুষ্টি এবং ক্ষয়ের অনুভূতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। ইহার সুখ দুঃখ নাই বলা যাইতে পারে না; কারণ, ইহারাই যখন পরবর্ত্তী জীব-সমূহের জনক; তখন ইহাদের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তাহা কোথা হইতে আসিল? আমরা দেখিয়াছি অন্য কোথাও হইতে আসিতে পারে না। এ সুখদুঃখ আদিম কীটাণুরও আছে, তবে বিকশিত অবস্থায় নাই, ক্ষীণ অবস্থায় আছে। অতএব, দেহের সুখদুঃখ দেহের উপাদানের উপর নির্ভর করে; মনের সুখদুঃখ মনের উপাদানের উপর নির্ভর করে। সুখদুঃখকে এই ভাবে দেখিলে, ইহা দেহবর্দ্ধক প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে। দেহ ও মনের ভিতর যে উপাদান পূর্ব্ব হইতে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই দেহবর্দ্ধক প্রবৃত্তিকে গঠন করিতেছে। জীব কিছু সম্বল না লইয়া জীবন যাত্রা অতিবাহনে অবতীর্ণ হয় নাই, প্রথম হইতেই কিছু পাথেয় লইয়া যাত্রা করিয়াছিল। ঐ পাথেয় সুখ নহে, জ্ঞান নহে; সেই প্রথমাবস্থায় সুখ ছিল না, জ্ঞান ছিল না। তবে কি লইয়া যাত্রা করিয়াছিল?—প্রবৃত্তি; সেই আদিম দেহবর্দ্ধক প্রবৃত্তি। সুখ ও জ্ঞান এই প্রবৃত্তির সহায়ক মনোবৃত্তি মাত্র। এই প্রবৃত্তিই মৌলিক মনোবৃত্তি। জৈবনিক (protoplasm) হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব শ্রেণীর জীবেরই ইহা মৌলিক প্রবৃত্তি।

৬। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণসম্বন্ধে স্বাধীনতা কোথায় ?

প্রবৃত্তি বহুবিধ। এখন কথা হইতেছে, কাহাকে রাখিয়া কাহার অনুসরণ করিব ; একাধিক প্রবৃত্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে কাহার অনুসরণ করিব ? প্রবৃত্তিই তাহা স্থির করিয়া দিবে ; প্রবৃত্তিকে ছাড়াইয়া স্থির করিবার সাধ্য কাহারও নাই। তবে কি কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আমাদের স্বাধীনতা নাই ? আদৌ নাই। এক বিষয়ে একটুখানি মাত্র আছে—প্রবৃত্তির অভ্যাসকল্পে। প্রবৃত্তিবিশেষের বিশেষঅভ্যাস মাত্র আমাদের আয়ত্তাধীন। "আমি স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধে যাইব না ?" প্রবৃত্তি যাইতে না দিলে তুমি কেমন করিয়া যাইবে ? ভীতিরূপ আপাতদেহরক্ষণী প্রবৃত্তির আতিশয্য হইলে কেমন করিয়া যাইবে ? তাহা না হইয়া, স্বদেশরক্ষারূপ গৌণদেহরক্ষণী প্রবৃত্তি সর্ব্বদাই যাহাতে বলবতী থাকে, তৎপক্ষে অভ্যাস মাত্র তোমার আয়ত্তাধীন। এই নির্ব্বাচন কার্য্যও আবার প্রবৃত্তির অধীন। যাহার প্রবৃত্তি নিতান্ত নীচ, সে স্বদেশপ্রীতি অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইবে না।

৭। কোন্ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে হইবে ?

অতএব আমাদের কর্ত্তব্যকার্য্য পাইলাম : যাহাতে ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে না হয়, অর্থাৎ যে প্রবৃত্তির বিপরীতপ্রবৃত্তির প্রাবল্য ভবিষ্যতে না হয়, এরূপ প্রবৃত্তির অনুশীলন। সে কোন্ প্রবৃত্তি ? পুনরায় বিধাতা, তোমার সেই প্রবৃত্তি। ঈশ্বরোপাসনা না করিলে ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে হইবে, এ প্রবৃত্তি কি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ? তবে আর ভয় নাই, তোমাকে তাহা করিতেই হইবে ; অন্যথায় তাহা করিবার যো নাই।

"কি সর্ব্বনাশ ! প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া বেড়াইতে হইবে ! তবে কি ভাল মন্দ নাই ?"

সন্দেহ, দেখা যাউক। আমি, আমার সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফকিরী লইলাম, ভাল করিলাম কি মন্দ করিলাম ? ভাল হউক আর মন্দই হউক, কল্পতরু মনের ভিতর গজাইলে ঐরূপ করিতেই হইবে, নিস্তার নাই। কিন্তু দুই দিন পরে আবার অনুতাপ উপস্থিত হইল। তবে ত

দেখা যাইতেছে ভাল মন্দ আছে। যাহাতে অনুতাপ না হয়, তাহা করিলেই ত হইত! সেই জন্যই বলা হইয়াছে, ঐরূপ প্রবৃত্তির চর্চ্চাই কর্ত্তব্য কার্য্য। কিন্তু সে প্রবৃত্তির সন্ধান, হৃদয়ের বর্ত্তমান প্রবৃত্তির নিকট হইতে না লইয়া, অন্য কোন উৎকৃষ্টতর উপদেষ্টার নিকট হইতে লওয়া যায় কি? বর্ত্তমানে যে প্রবৃত্তি প্রবল, ভবিষ্যতে তাহার বিপরীত প্রবৃত্তি প্রবল হইতে পারে। ইহার নামই অনুতাপ, ইহার নামই দুঃখ, তাহাই বর্জ্জনীয়। তবেই ত গোল! যাহা হউক, ভালমন্দ, কার্য্যের একটা সাধারণ নিয়মের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—প্রবৃত্তির স্থায়িত্ব অনুসারে তাহার উৎকৃষ্টতা।

এই স্থায়িত্বের সন্ধানও সাধারণত লোকে প্রবৃত্তির নিকট হইতে লয়; কোন্ প্রবৃত্তির স্থায়িত্ব বেশী তাহা প্রবৃত্তির নিকটেই জিজ্ঞাসা করিয়া স্থির করে। কিন্তু এই স্থায়িত্বের সন্ধান আর এক মনোভাবের সাহায্যদ্বারা লইলে যে ভাল হয়, প্রবৃত্তিই সেই সন্ধান দিতেছে। সেই মনোভাব জ্ঞান। জ্ঞান প্রবৃত্তির সহকারীমাত্র, ইহার স্বাধীন কার্য্যপ্রবর্ত্তয়িতা নাই; তবে প্রবৃত্তির সম্মুখে ইহা বেশী বিষয় উপস্থিত করিয়া তাহাকে, স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ভালরূপ দেখিয়া শুনিয়া, বাছিয়া লইবার সুযোগ দেয়। বিস্তৃততর জগতের অঙ্গ হইতে আবরণ উন্মুক্ত করিয়া প্রবৃত্তির সম্মুখে তুলিয়া ধরাই জ্ঞানের কার্য্য। ভবিষ্যতের মধ্যে দৃষ্টি অনেকদূর টানিয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সামগ্রী নির্ব্বাচনের সুবিধা করিয়া দেওয়াই জ্ঞানের কার্য্য। যে মূর্খ, সে উপস্থিতপ্রবৃত্তিরই অনুসরণ করিতে যায়; জ্ঞান তাহার সম্মুখে কি বিস্তৃততর ক্ষেত্র উপস্থিত করিতে পারে, তাহা দেখিবার অপেক্ষা করে না; অর্থাৎ প্রবৃত্তির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধানের অপেক্ষা করে না। কাজেই তাহার প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী হইয়া পড়ে। এখন এক প্রবৃত্তির প্রবলতা, পরক্ষণেই বিপরীত প্রবৃত্তির প্রবলতা তাহার সদাসর্ব্বদা হইতে দেখা যায়। জ্ঞানের দ্বারা এই ক্ষণস্থায়িত্বের বহু প্রতীকার করা যায়। আপাতশরীরপ্রণোদিত প্রবৃত্তি, যথা আহারের ইচ্ছা, ভয় ইত্যাদির স্থায়িত্ব নিতান্ত অল্প। তাহার অনুসরণ করিতে গিয়া মনোজ (emotional) প্রবৃত্তি—যাহার স্থায়িত্ব অনেক বেশী—তাহার

প্রতিকূল আচরণ করিলে ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে হইবে। তাহা হইলেই হইতেছে, প্রবৃত্তিসমূহের স্থায়িত্বানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রবৃত্তির উপদেষ্টা যে জ্ঞান, তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞান হওয়া আবশ্যক; প্রবৃত্তিবিজড়িত জ্ঞান উপদেষ্টার আসন লইতে পারে না, সংস্কারকলুষিত জ্ঞান উপদেষ্টার আসন পাইতে পারে না। এখন পূর্ব্বের ষড়বিধ প্রবৃত্তির স্থায়িত্ব নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা যাউক।

৮। ঈশ্বরাভিমুখী প্রবৃত্তি।

এই প্রবৃত্তির স্থায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই প্রবৃত্তির চর্চ্চা করিয়া গেলে, ইহার কোন বিরুদ্ধপ্রবৃত্তি যে পরে বলবতী হইয়া অনুতাপ আনয়ন করিবে, তাহার সম্ভব অল্প। ঈশ্বর জ্ঞানের বিষয় নহেন, ভক্তির বিষয়; ইহা স্মরণ রাখিয়া যিনি এই প্রবৃত্তির বিশেষ চর্চ্চা করেন, তাঁহার কার্য্য উত্তম। স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেশদেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছি। বহুদিন পরে গঙ্গাতীরে, অনাহারে মৃত স্ত্রীর সাক্ষাৎলাভ হইল। পুত্রও মৃতপ্রায়, উদরজ্বালায় মৃত মাতার শুষ্ক স্তনপান দ্বারা জীবনধারণের অযথা প্রয়াস পাইতেছে। দৃঢ় না হইলে সন্ন্যাস ছুটিয়া যাইবে, বিষম অনুতাপের জ্বালা উপস্থিত হইবে। অতএব কর্ত্তব্যকার্য্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় সাধারণ নিয়ম পাওয়া গেল :—অপেক্ষাকৃত স্থায়ী প্রবৃত্তির অনুশীলনই শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু নিম্নতর প্রবৃত্তিকে নিতান্ত লাঞ্ছিত করা উচিত নয়; করিলে সে হয়ত একদিন কঠিন প্রতিশোধ * লইবে। যাহার সে ভয় নাই, তাহার পক্ষে এই প্রবৃত্তি সম্যক অনুশীলনীয় বটে। আর একটা গোল আছে। পূর্ব্বে সঞ্চয় না করিয়া, অন্য প্রবৃত্তি বাদ দিয়া, কেবলমাত্র এই প্রবৃত্তির অনুশীলন করিতে গেলে, দেহধারণ জন্য অন্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। ভিক্ষা কাহারও পক্ষে অনুতাপের কারণ হইতে পারে; তবে

* রবীন্দ্রনাথ।

ইহা যাহাদের জাতীয় ব্যবসা, তাহাদের ঐরূপ অনুতাপের আশঙ্কা অল্প। এই প্রবৃত্তি চর্চ্চার পক্ষে তৃতীয় অসুবিধা হইতেছে: সমাজে বহুলোক ইহার চর্চ্চা করিলে সমাজ এবং তৎসহ, দেহ রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। অতএব আমরা পাইতেছি যে, সামাজিক স্বরূপে আমাদের যে কর্ত্তব্য আছে, অগ্রে তাহা পালন না করিয়া একমাত্র এই প্রবৃত্তির অনুসরণ বিপজ্জনক। বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে, ঈশ্বরাভিমুখী প্রবৃত্তির অনুসরণের সার্থকতা ঐ অনুসরণই বটে; অন্য কোন সার্থকতা, এমন কি সালোক্য সাযুজ্য ইত্যাদির কামনা করিলে, তাহা বিফল হইতে পারে। ঈশ্বরে আত্মসংযোগ এবং তজ্জনিত পরিতৃপ্তিই ইহার একমাত্র ফল। অন্য ফলের কামনার ছায়াও চিত্তে থাকিলে, তাহার পক্ষে এ পন্থা নিষিদ্ধ। পরিতৃপ্তি শব্দ এ স্থলে প্রয়োগের ঠিক উপযোগী নহে; তাহা হইতে কোন উচ্চ অবস্থার কল্পনা করিতে হইবে। তাহা যিনি না পারিবেন, তাঁহার পক্ষেও এ পন্থা নিষিদ্ধ।

৯। অন্যান্য প্রবৃত্তির স্থায়িত্ব নির্দ্দেশ।

অন্যান্য যে সমস্ত প্রবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, অন্য প্রবৃত্তি বর্জ্জন করিয়া তাহাদের একমাত্রচর্চ্চা হইতে পারে না। তবে তাহাদের কোন এক প্রবৃত্তির বিশেষচর্চ্চা করা যাইতে পারে; একের সহিত অন্যের বিরোধ উপস্থিত হইলে যাহার স্থায়িত্ব অধিক তাহাকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা কর্ত্তব্য। আর একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। যখন দুই প্রবৃত্তির সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখন একটী অন্যের পক্ষে একান্ত এবং চিরন্তন প্রতিরোধী না হইলে, উভয় প্রবৃত্তির মধ্যে যেটী প্রবল, তাহার অনুসরণ করিতেই হইবে। নিম্নলিখিত প্রবৃত্তিদ্বয়ের বিশেষচর্চ্চা করা যাইতে পারে—

নির্ম্মাতৃকী।

জ্ঞানার্জ্জনী।

অন্যান্য প্রবৃত্তির বিশেষচর্চ্চা বা অনুশীলন ব্যবস্থেয় নহে। পরাভিমুখী প্রবৃত্তির বিশেষচর্চ্চা উত্তম কার্য্য বটে, কিন্তু নিজের হানি করিয়া

পরের উপকার অনুন্নত সমাজের পক্ষে যে পরিমাণে উপযোগী, উচ্চশ্রেণীর সমাজের পক্ষে সে পরিমাণে নহে।

জ্ঞানার্জ্জনী প্রবৃত্তির একটা বিশেষত্ব আছে। ঈশ্বরমুখী প্রবৃত্তি যেমন অন্য প্রবৃত্তির ছায়াস্পর্শে মলিনতা প্রাপ্ত হয়, ইহাও তদ্রূপ হয়। সাধারণত যাহাকে জ্ঞানের অনুসরণ বলে, তাহা জ্ঞানের সাহায্যে সংস্কার-পরিপুষ্টির চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে, যে মতাবলম্বী, তাহার জ্ঞানানুসরণের উদ্দেশ্য হইতেছে, নিজের সংস্কারকে দৃঢ় করা। ইহা কিন্তু ঠিক জ্ঞানের চর্চ্চা নহে, সংস্কারের চর্চ্চা। মনকে সংস্কারবিচ্যুত করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানের অনুসরণে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা, বিশেষ অভ্যাস ভিন্ন অর্জ্জন করা যায় না। সাধারণের পক্ষে তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। যাঁহারা এই সাধানায় সিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত ঋষি। ইউরোপেও এইরূপ ঋষি দেখা যায়, কিন্তু বিরল। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে এ শ্রেণীর জীবের আর বড় সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। নিজকে, নিজের জাতিকে, নিজের সমাজকে, যে পরের সহিত এক চক্ষে দেখিতে পারে, সে এই সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারে। নিজের ও জাতীয় স্বার্থকে যে অন্যের স্বার্থের সহিত সমান দৃষ্টিতে দেখিতে পারে, সেই এই সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারে। এ সাধনা অত্যন্ত কঠোর, সংস্কার বর্জ্জন করা অত্যন্ত কঠিন; এইজন্যই কাহারও স্বার্থ বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুক্তিদ্বারা বুঝান অতি দুরূহ ব্যাপার। জ্ঞানার্জ্জনী প্রবৃত্তি যাহার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় নাই, অন্যান্য প্রবৃত্তির অধীন হইয়া রহিয়াছে, তাহার নিকট মূর্ত্তিমতী সরস্বতীকে উপস্থিত করিলেও অন্যান্য প্রবৃত্তি তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিবে।

১০। ভালমন্দ কাহাকে বলে।

ভালমন্দ বলিয়া কিছু আছে কি না, ইতিপূর্ব্বে আমরা সন্দেহ করিয়া রাখিয়াছি; এস্থলে তাহার বিশেষ বিচার করা যাউক। এই যে প্রবৃত্তিমার্গ প্রদর্শিত হইল, ইহাই ব্যক্তিগত ভালমন্দ। তুমি তোমার নিজের স্বার্থের হানি করিয়া অন্য ব্যক্তির স্বার্থের ব্যবস্থা কর, তাহার চক্ষে তুমি ভাল হইবে। তুমি নিজের স্বার্থের হানি করিয়া সমাজের

স্বার্থ উদ্ধার কর, সমাজের চক্ষে তাহা ভাল হইবে। নিরপেক্ষ ভালমন্দ কিছু থাকিতে পারে না; আপেক্ষিক ভালমন্দ যাহা, তাহাই আছে। যাহা একান্তই ভাল বা যাহা একান্তই মন্দ, প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়া যাহা ভালমন্দ, তাহা আকাশকুসুম মাত্র। একটা উদাহরণ দ্বারা এ বিষয় স্পষ্টীকৃত করা যাউক। গুপ্তচর অনেক সময় এরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, তাহার কার্য্যের ফলে একটা জাতির ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যে গুপ্তচর স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ—এবং যাহা মৃত্যু হইতেও ভয়ানক—শত্রু হস্তে ধৃত হইয়া চরমযাতনা প্রাপ্তির সম্ভাবনা তুচ্ছ করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিল, তাহাকে আমরা পরিত্রাতার আসন প্রদান করিয়া চিরকাল ইতিহাসে গুণকীর্ত্তন করি। আর অপর পক্ষের সেই গুপ্তচরকে ধৃত করিতে পারিলে ঘৃণার সহিত তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে চড়াই। গুপ্তচর একই ভাবের কার্য্য করিতেছিল, তবে এরূপ বিপরীত ব্যবস্থা করি কেন? একের দ্বারা আমাদের প্রবৃত্তির অনুকূল স্বার্থরক্ষা হইতেছিল, অপরের দ্বারা তাহার ব্যাঘাত হইতেছিল, এইজন্যই এরূপ ব্যবস্থা করি। ভাল মন্দের বিচার, প্রবৃত্তির অনুকূল অভিমতের অপেক্ষা করে। ব্যক্তি-বিশেষের প্রবৃত্তির চরিতার্থতা তাহার নিকট ভাল; অন্যের প্রবৃত্তি চরিতার্থতার সহায়তা কর, তুমি সেই অন্যের নিকট ভাল হইবে; ইহাই হইল ব্যক্তিগত ভালমন্দ। যে প্রবৃত্তির চরিতার্থতা যে পরিমাণে আজীবন সুখের কারণ হইবে, তাহা সেই পরিমাণে তোমার পক্ষে ভাল; যাহা তদ্বিপরীত হইবে তাহাই মন্দ। ভবিষ্যতে বিপরীত প্রবৃত্তির প্রাবল্য হইলে, তাহা অসুখের কারণ হয়। মনোজ সুখদুঃখ আর কিছুই নহে, ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, প্রবৃত্তির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মানবের জাতীয় জীবনের চরম লক্ষ্যস্থল, শেষ উন্নতির অবস্থা কিরূপ, তাহার কোন কল্পনা করিতে পারিলে, সেই অবস্থা লাভের অনুকূল কার্য্যকে কর্ত্তব্যকার্য্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারিত; প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়া স্বাধীন কর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইতে পারিত। কিন্তু সে অবস্থার কল্পনা করা সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে, কালের সসীম বিস্তৃতির মধ্যে সেই চরম উন্নতির অবস্থা আসিতে পারে না, অনন্ত বিস্তৃতিতে

আসিবে। হয়ত মনুষ্যজীবনও উচ্চতর জীবন নহে, কালে তাহার অপেক্ষও বহু উচ্চতর জীবন উদ্ভূত হইবে। কিম্বা যদি তাহাও না হয়, এই মনুষ্যজীবন, সুদূর ভবিষ্যতে এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে যে, তাহা সম্পূর্ণ নূতনতর জীবন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সে অবস্থায়, মানুষের চরম উন্নতির পক্ষে সহায়তা করা কর্ত্তব্যকার্য্য বলা যাইতে পারে না, মানুষ হইতে উচ্চতর জীবনের চরমোৎকর্ষলাভের পক্ষে সহায়তাকেই কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়া, নিরপেক্ষ ভালমন্দের কল্পনা সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। যদি কেহ কোন কল্পনা করিতে চান, তবে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা যাইতে পারে, তাঁহার ঐ কাল্পনিক কর্ত্তব্য অঙ্কের উপর প্রয়োগ করিবার পক্ষে বাধা দেওয়া যাইতে পারে। উচ্চতর প্রবৃত্তির অনুসরণই উৎকৃষ্টতর পন্থা; কাহারও কল্পিত মৃগতৃষ্ণিকার অনুসরণ নিতান্তই বিপজ্জনক পন্থা বলিতে হইবে।

১১। সামাজিক প্রবৃত্তি।

যেমন ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি আছে, তাহার চর্চ্চার তারতম্য আছে, তেমনি সামাজিক প্রবৃত্তি আছে, তাহারও চর্চ্চার তারতম্য অনুসারে আপেক্ষিক ভালমন্দ বিচার আছে। সামাজিক প্রবৃত্তি আর কিছুই নহে; সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সামাজিক কর্ত্তব্যবোধস্বরূপ যে প্রবৃত্তি আছে, তাহাকেই সামাজিক প্রবৃত্তি বলা যাইতেছে। ইহারও ভালমন্দ ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির ভালমন্দের অনুরূপ। সামাজিক কর্ত্তব্য অবধারণ ও প্রচার করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে, যে প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, সামাজিক জীবনে কোন দিন তাহার বিপরীত প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া, অনুতাপ বা দুঃখের সৃষ্টি করিতে পারে কি না। সামাজিক জীবন ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা অত্যন্ত দীর্ঘ। ভারতীয় হিন্দুসমাজের বয়ঃক্রম অন্তত চার হাজার বৎসর হইয়াছে, ; এখনও কতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, কে বলিতে পারে? বাঁচিয়া না থাকিলেও পরবর্ত্তী সমাজের উপর ইহা অল্প-বিস্তর কার্য্যকরী থাকিয়া যাইবে। এক সমাজ অন্য সমাজের উপর

কার্য্য করে, এই হিসাবে সমগ্র মনুষ্যসমাজকেই একটীমাত্র সমাজ বলা যাইতে পারে। এই মনুষ্যসমাজের আয়ুর গণনা করিতে পারা যায় না। সমাজের এই সুদীর্ঘ জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ নিতান্তই কঠিন বিষয়। আমি ব্যক্তিগত ভাবে যে কার্য্য করিব, তাহার ফল অনেকটা আমার জীবনের সহিত অন্তর্হিত হইবে, ভ্রমপ্রমাদ যতই করি তাহার স্থায়িত্ব বেশী হইবে না; কিন্তু সামাজিক কর্ত্তব্য বোধে সমাজের জীবনের উপর যে সমস্ত প্রক্রিয়া করিব, হয়ত সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বহুলোকে তাহার ফলভোগ করিতে বাধ্য হইবে। তাৎকালিক প্রবৃত্তি অনুসারে সমাজ ব্যবস্থাপকগণ প্রাচীন হিন্দুসমাজে যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আমরা তাহার কোনটা ভাল কোনটা মন্দ বলি। যে গুলি বর্ত্তমানে আমাদের প্রবৃত্তির অনুকূল নহে, তাহাকেই মন্দ বলি। কিন্তু তাহাতে ঋষিদের কি ক্ষতি? তাঁহারা ত তাঁহাদের প্রবৃত্তির অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া সুখে কাটাইয়া গিয়াছেন। তাহার ফল এখন যাহাই হউক, তাঁহাদের আর তাহা অভিভূত করিবে না—তাঁহারা অভিভূতির বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। তবে কি আমার সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি, আমার মাত্র জীবিতকালের শুভাশুভ ভাবিয়াই স্থির করি? নিজের মরণ অতিক্রম করিয়া সামাজিক ব্যবস্থার ভালমন্দের বিচার করিবার আবশ্যকতা কি নাই? যদিও জীবনের সহিত সমস্ত প্রবৃত্তির লোপ হইবে, প্রবৃত্তিমার্গানুপন্থীর জীবনের বাহিরে আর কোন কার্য্য থাকিতে পারে না; তবুও প্রবৃত্তি কিরূপে জীবনের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে তাহার বাহিরে ভুলাইয়া লইয়া যায়, তাহাই এস্থলে দেখিতে হইবে। আমি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া, নিজে না খাইয়া সঞ্চয় করিয়া যাইতেছি—স্ত্রীপুত্র আমার অবর্ত্তমানে সুখে থাকিবে। এইরূপ সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি যে কেবল মানুষের আছে তাহা নহে, নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে বহুবিস্তৃত, এমন কি উদ্ভিদের মধ্যে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ, নিজের প্রাণপাত করিয়া, নিজ বীজসমূহের চতুষ্পার্শ্বে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে—বীজ মানুষ হইবে। সেই উদ্ভিদজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া, মনুষ্যদেহে এই পরের জন্য সঞ্চয়ের প্রবৃত্তির উপাদান

গঠিত হইতেছে। বর্ত্তমানে তাহা কিরূপ প্রবল, যে ব্যক্তি সন্তানসন্ততির জন্য কিছু রাখিয়া যাইতে পারিল না, মৃত্যুকালে তাহার যন্ত্রণা দেখিলেই অনুভব করা যাইবে। সন্তানেরা বহুদিবস ধরিয়া যে কষ্ট পাইবে, এই মৃতপ্রায় ব্যক্তি তাহার জীবনের অবশিষ্ট কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট অনুভব করিয়া লয়। তাহার মৃত্যুর পর পরিজন তাহাদের শরীরে ও মনে দুঃখদারিদ্রতা হেতু যে কষ্ট পাইবে, তাহা এই ব্যক্তি নিজের শরীর ও মন, প্রতিভূস্বরূপ তাহাদের স্থলে স্থাপন করিয়া, তদধিক অনুভব করিয়া লয়। কিরূপে ইহা সম্ভব হইয়াছে দেখা যাউক। উদ্ভিদ্ নিজের বীজের জন্যই সঞ্চয় করে, পরের জন্য করে না, এই বীজ তাহার শরীরের একাংশ। প্রাণী তাহাদের অপত্যের জন্য সঞ্চয় করে, অপত্য তাহাদের শরীরের একাংশ ছিল। মাতা, স্তন্যে সন্তানের জন্য দুগ্ধ সঞ্চয় করে; সন্তান মাতার শরীরের একাংশ ছিল। অতএব মুমূর্ষু ব্যক্তি নিজ প্রাণে যে এই কষ্ট অনুভব করে, ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই জন্য হইতেছে যে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে অপত্য দেহ হইতে বিযুক্ত হইবার পরেও অনুভব করে। কি সূক্ষ্ম শিরার দ্বারা সন্তান মাতার সহিত চিরদিন সংযুক্ত থাকে! দেহ হইতে বিযুক্ত হইলেও, সন্তানের সাহচর্য্য জন্য মাতার শরীরের মধ্যে সহানুভূতির শৃঙ্খল গঠিত হইয়া রহিয়াছে। বহুদিন হইতে, জীবনের প্রারম্ভ হইতে এই শৃঙ্খল গঠিত হইতেছে। বর্ত্তমানে তাহা এরূপ দৃঢ়বন্ধনে বাঁধিয়া রাখে যে, কোন শিরা, মাংসপেশী তদপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর বন্ধন নহে। সন্তান হইতে ক্রমে এই শৃঙ্খল অন্যান্য ব্যক্তিতে সংযুক্ত হয়; যাহাদের সহিত সর্ব্বদা বসবাস, আদানপ্রদান করিতে হয়, তাহাদের সহিতও ঐ বন্ধন সংস্থাপিত হয়। ইহাই পরাভিমুখী প্রবৃত্তি। কি প্রকারে ইহা জীবনের গণ্ডী ছাড়াইয়া যায়, এখন তাহাই দেখিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে অবশ্যই তাহা যাইতে পারে না। শরীরের মধ্যেই যখন সেই শৃঙ্খল গঠিত হইয়াছে, শরীর না থাকিলে তাহা আর বাঁধিতে পারে না। অতএব জীবন ছাড়াইয়া যে বন্ধন, তাহা কাল্পনিক বন্ধন, জীবন ছাড়াইয়া যে প্রবৃত্তি চলিয়া যায়, তাহা, পরকালবাদীর পক্ষে ভিন্ন, কাল্পনিক স্রোত। কাল্পনিক স্রোত

হইলেও, জীবিতাবস্থায় তাহা বেগবান। আমাদের অধিকাংশ সুখদুঃখ কল্পনার অনুগ্রহেই যখন ভোগ করি, তখন কোন কাল্পনিক স্রোত যে বেগবান হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এই পরাভিমুখী প্রবৃত্তি—যাহা জীবন ছাড়াইয়া যায়—তাহাকেও চরিতার্থ করিতে আমরা বাধ্য; কারণ তিনি অগ্রেই আমাদের হৃদয়ে সুদৃঢ় আসন সংস্থাপন করিয়া বসিয়া আছেন—ইহাকে অতিপরাভিমুখী প্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে। অতএব সামাজিক কার্য্যকালে এই প্রবৃত্তি ক্লেশদায়ক না হয়, তাহা দেখিতে হইবে। ঐ ক্লেশ যদিও নিতান্ত কাল্পনিক, তাহা হইলেও উড়াইয়া দিবার যো নাই—আমাদের অধিকাংশ সুখদুঃখই কাল্পনিক। সামাজিক জীবনে, সমাজের প্রবৃত্তি ভিন্নমুখে যাইয়া ক্লেশদায়ক হইতে পারে, এ কল্পনার যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না; তবে নিতান্ত অনুন্নত মূর্খের এরূপ কল্পনা হয় না। তাহা যেমন হয় না, তেমন শিক্ষিত, উন্নত ব্যক্তির এ কল্পনা অধিক প্রবল। সহস্রবৎসর পরে সমাজ কষ্ট পাইবে, তাহাতে আমার কি? প্রবৃত্তির অনুসরণমাত্রই যখন কার্য্য, তখন প্রবৃত্তির ধ্বংস হইলে যাহা হইবে না হইবে, তাহার অনুসরণ আমার কার্য্য হইতে পারে না। এস্থলে নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তির বাস্তবতা দেখা যাইতেছে। দূরাকৃষ্ট সহানুভূতির সহিত নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তি যোগ দিয়া, সহস্র বৎসর পরের সমাজের সহিত আমাদের বন্ধন দৃঢ় করিতেছে, আমাদের চিত্তকে সমধিক আকর্ষণ করিতেছে, সেই গঠন-কার্য্যে আমাদের স্বার্থ বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছে। এই সমস্ত উচ্চ প্রবৃত্তি যাহাদের নাই বা যাহাদের বিকশিত হয় নাই, সমাজগঠনকার্য্যে তাহাদের হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তি কাল্পনিক হইলেও অতি উপাদেয় উপভোগের বিষয়। মনের মধ্যে এই প্রবৃত্তিকে যত বেশী গঠন করা যাইবে, জীবন তত সম্পূর্ণ হইবে।

সামাজিক জীবন অত্যন্ত দীর্ঘ; সমগ্র মনুষ্যজাতিকে লইয়া এক সমাজ ধরিলে ত অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে। এই দীর্ঘ জীবনের প্রবৃত্তির ভাবী ইতিহাস পাঠ করা কি আদৌ কাহার পক্ষে সম্ভব? সম্ভব নহে। তবে কি সামাজিক কর্ত্তব্য নাই, ভালমন্দ বিচার করিবার উপায় নাই?

পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, আপেক্ষিকরূপে ভালমন্দ আছে। যে প্রবৃত্তির স্রোত সমাজে যত বেশী দিন অব্যাহত থাকিবে, তাহার পরিপোষণই ভাল; তদ্ভিন্ন ভালমন্দ নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আধ্যাত্মিক বিষয়ে বেশী মনোযোগ দিয়া বাহ্যিক বিষয়ের উপেক্ষা করায় আমাদের সেরূপ বাহ্যিক উন্নতি হয় নাই। সামাজিক প্রথার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব অধিক পরিমাণে প্রবেশ করাইয়া আমাদের যে বাহ্যিক অবনতি ঘটাইয়াছেন, আধ্যাত্মিক ভাব কমিয়া যাইয়া পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের সঙ্গে পড়িয়া বাহ্যিক বিষয়ে দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট হওয়ায়, তজ্জন্য এখন আমরা তাঁহাদের নিন্দা করি। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি তাঁহারা চরিতার্থ করিয়া গিয়াছেন, আধ্যাত্মিক রীতিনীতি প্রচলন করিয়া গিয়াছেন; আমাদের বাহ্যিক প্রবৃত্তির প্রবলতাবশত, সেই সমস্ত রীতিনীতি বাহ্যিক উন্নতির প্রতিরোধক হওয়াতে, আমরা তাঁহাদের নিন্দা করি। আবার কোন কালে কোন বিষয়ে সমাজের প্রবৃত্তিস্রোত যদি ফিরিয়া যায়, তাঁহারা সুখ্যাতি পাইবেন। ইহাই সামাজিক বা জাতীয় হিসাবে ভালমন্দ।

"নিজনিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, প্রবৃত্তিকে দমন করিও না, ব্যবস্থাপকগণ এই উপদেশ দিলে মনুষ্যসমাজ এখন কিরূপ অবস্থায় থাকিত? সেই আদিম বর্ব্বরতাই রহিয়া যাইত না কি?"

সমাজের যে নিম্ন অবস্থায় প্রবৃত্তি দমনের উপদেশ দেওয়া আবশ্যক, সে অবস্থায় তাহা যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে এবং উপকারও যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় এককালীন দমন বা ধ্বংসের উপদেশ সদুপদেশ নহে, প্রবৃত্তির উন্নতি করিবার পক্ষে উপদেশই আবশ্যক হইয়াছে। এখন ধ্বংসের উপদেশ টানিয়া লইয়া বেড়াইলে, ইহা ব্যক্তিগত ও জাতীয় আলস্য ঔদাসীন্যের পরিপোষক হইয়া উন্নতির প্রতিরোধক হইবে।

১২। ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যকর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচার।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটা সাধারণ তত্ত্বের সংস্থাপন করা গিয়াছে, এইবার এই সমস্ত তত্ত্ব, আমাদের কর্ত্তব্য

সম্বন্ধে জটিলসমস্যা মীমাংসা পক্ষে কতটা উপযোগী, তাহা দেখা যাউক। *

১। রামচন্দ্র সীতাদেবীকে নির্দ্দোষী জানিয়াও পরিত্যাগ করিয়া ভাল করেন নাই। নির্দ্দোষীকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না, তাহার অধিকার হইতে তাহাকে বিচ্যুত করা যাইতে পারে না; করিলে তাহাকে দণ্ড প্রদান করা হয়। ন্যায়পরতা মানুষের মনের অতি স্থায়ী প্রবৃত্তি; অন্য প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য করিলে ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে হইবে। রামচন্দ্রের কার্য্য তৎকালের অবস্থার সহিত মিলাইয়া বিচার করিতে হইবে। রামচন্দ্র রাজা—সে কালে রাজাগিরি এস্তাফা করা চলিত না। রামচন্দ্র প্রজারঞ্জক রাজা—সে কালে রাজার কর্ত্তব্য বড় কঠোর ছিল। এমন কি একালেও আমাদের জয়পাল, শত্রুদমনরূপ রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীকে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন; এবং তাঁহার পাপ, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাপ গণ্য করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত, তুষানল অবলম্বন করিয়াছিলেন। এরূপ রাজাগিরি বহুজন্মের পাপের ফলই বলিতে হইবে। এই সমস্ত রাজা—যাঁহারাই প্রকৃত রাজা ছিলেন—তাঁহারা বাস্তবিকই আমাদের সহানুভূতির পাত্র; তাঁহাদের চরণে শতশত প্রণাম; তাঁহারা মানবজীবনের যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চ আদর্শ। রামচন্দ্র সীতাদেবীকে ত্যাগ না করিয়া ঘরে রাখিয়া দিলে রামায়ণ কাব্য হইত না, তিনিও দেবতা হইতেন না, আমাদের ন্যায় মানুষই থাকিয়া যাইতেন। কিন্তু এই মানুষের হৃদয়ে এমন একটি প্রবৃত্তি আছে যাহা দেবতাকেও পরাস্ত করিতে পারে—তাহা ন্যায়পরতা। ইহা আপনার বা পরের, একের বা বহুর, উপকার করা অপেক্ষা উচ্চতর কার্য্য; কারণ, ইহাই চরম উপকার, ইহার অনুশীলনই চরম কর্ত্তব্য। কবি ন্যায়পরতার বিনিময়ে স্বার্থত্যাগের চিত্র অঙ্কিত না করিয়া, ন্যায়পরতা বজায় রাখিয়া এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিলে আরও ভাল হইত। সীতাকে ঘরে

---

* ১৫৯ পাতা দ্রষ্টব্য।

রাখিয়া দিলে প্রজারঞ্জনী প্রবৃত্তি রামচন্দ্রকে এত ব্যথিত করিয়া তুলিত, যাহা অপেক্ষা সীতার বিরহও সহনীয়। মনের এরূপ অবস্থা না হইলে রামচন্দ্র সীতাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার পরিবর্ত্তে পরাভিমুখী প্রজারঞ্জনী প্রবৃত্তির এরূপ প্রসার, রামচন্দ্রের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু স্থায়পরতা আরও উচ্চতর প্রবৃত্তি। ইহাতে পরাভিমুখী এবং আত্মাভিমুখী প্রবৃত্তির চরম উৎকর্ষ ও উভয়ের সমন্বয় আছে। রামচন্দ্র সীতাকে পরিত্যাগ না করিলে, এই দৃষ্টান্তে সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি হইতে পারিত, তাহাতে সমাজের অকল্যাণ হইতে পারিত, ইহা যেরূপ সত্য; স্থায়বিরহিত কার্য্য করিবার পক্ষে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা তদপেক্ষা সমাজের অমঙ্গলজনক, ইহা আরও সত্য। রামচন্দ্র অন্যায় করিয়া সাধ্বী পত্নীকে তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন, তাহা উচ্চ দৃষ্টান্ত নহে। ব্যভিচার অপেক্ষাও অশুভ আছে, তাহা পীড়ন। আমাদের দেশে সাধারণ লোকের মধ্যে স্ত্রীজাতির আসন যে বেশী উচ্চে উঠে নাই, রামচন্দ্রের এই দৃষ্টান্ত তাহার জন্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে দায়ী। কাহাকেও পীড়ন করিয়া, তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রজারঞ্জক হইবার অধিকার রামচন্দ্রেরও নাই। সামাজিক হিসাবে দেখিতে গেলে এই প্রবৃত্তি প্রশংসনীয় নহে। আর রামচন্দ্র যদি তাহা জানিতেন, তবে তাঁহারও এরূপ দুর্ভোগ হইত না; ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই অধিক মঙ্গল হইত। স্মরণ রাখিতে হইবে, ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে রামচন্দ্র যে নিজের স্বার্থত্যাগ করিয়া পরের স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসনীয় দেখায়; অপরিণত বুদ্ধিতে সমাজ সেইরূপই দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু দূরদৃষ্টিতে বিপরীত রূপ দেখায়।

একটী গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হইতেছে। সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির কল্যাণের জন্য একের বা শ্রেণীবিশেষের উপর পীড়ন করা যাইতে পারে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর সামাজিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের স্থলে দেওয়া যাইবে। এখানে এইমাত্র বলিয়া রাখা যাইতেছে, কাহারও উপর পীড়ন করিয়া যে কল্যাণ, তাহা আদর্শ কল্যাণ নহে। সাময়িক

স্বার্থের জন্ত তাহা করিয়া লাভ নাই। ইহাতে সমাজে পীড়নের প্রবৃত্তি বলবতী হয়; তাহা আদৌ মঙ্গলজনক নহে। ইহাতে পরস্বাপহরণ করিয়া আত্মস্বার্থসিদ্ধির প্রবৃত্তি প্রবল হয়।

২। সত্য, সমাজবন্ধনের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় উপকরণ, মার্শ্যাল্ নে তাহা ভঙ্গ করিয়াছিলেন; সেই প্রভু, যাঁহার অধীনে শতশত যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসীর বিজয়পতাকা প্রোথিত করিয়াছিলেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে গৌবরগাথা অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া চিত্তকে প্রশমিত করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ তাঁহার কার্য্যের সমর্থন করিয়া বলিবেন: তিনি যদি নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ করিতেন, তবে অকৃতজ্ঞতা দোষে দোষী হইতেন; কৃতজ্ঞতাও সমাজের কম বন্ধন নহে। বুঁর্বো রাজার সপক্ষে প্রতিশ্রুতি করা তাঁহার ন্যায় হইয়াছিল কি অন্যায় হইয়াছিল, নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করা উচিত ছিল কি না ছিল, তাহা বিচার করিয়া কোন ফল নাই; যে ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উপরই বিচার করিতে হইবে। সমাজের পক্ষে কৃতজ্ঞতা ও সত্য তুল্যরূপে আবশ্যক; তিনি সত্যভঙ্গ করিয়া কৃতজ্ঞতা রক্ষা করিয়া ভালই করিয়াছিলেন বলিলে, তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, সত্যভঙ্গ করিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিবার অধিকার কাহারও নাই।

এই মীমাংসাস্থলে আর একটী বিষয়ের অবতারণা আবশ্যক হইয়াছে। দুইটী বিষয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ স্থলে, তাহাদের উভয়ের গুণ ও পরিমাণ দুইই দেখিতে হইবে; কেবল গুণ দেখিলে হইবে না, পরিমাণ দেখিলেও হইবে না। 'ক' হয়ত 'খ' অপেক্ষা সামান্য গুণে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু 'খ' 'ক' অপেক্ষা পরিমাণে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ; এস্থলে 'খ'কেই সামষ্টিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে হইবে। যতদিন সমাজে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে—এবং তাহা চিরকালই থাকিবে—ততদিন আপেক্ষিক ভালমন্দ ভিন্ন বিশুদ্ধ ভালমন্দ আচরণের অবকাশ অল্পই ঘটে। সত্য বজায় রাখিতে গেলে, মার্শ্যাল্ নেকে যুদ্ধ করিতে হইত, অকৃতজ্ঞ হইতে হইত। নেপোলিয়নের নিকটে তাঁহার কৃতজ্ঞতা, পরিমাণে

এত বেশী যে, তাহা ভঙ্গ করিলে সত্যভঙ্গের অপেক্ষা অধিকতর দূষণীয় কার্য্য হইত। এইরূপ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত হিসাবে ভালই করিয়াছিলেন, কারণ নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ধ্বংস করিলে, পরে অনুতাপের সীমা থাকিত না। সামাজিক হিসাবে ইহার ভালমন্দ বিশেষ কিছু নাই। ভাল করিয়াছিলেন বলিলেও, সেই মার্শ্যাল নের মনেই প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গজনিত সামান্য অনুতাপ ছিল না বলা যাইতে পারে না। সেনাপতিত্ব পরিত্যাগ ইত্যাদি উৎকৃষ্টতর পন্থা তাঁহার পক্ষে অবশ্যই উন্মুক্ত ছিল; তাহা বাদ দিয়া বিচার করিতে হইবে।

৩। উচ্চ বিচারশক্তি না থাকিলে কবি হইতে পারা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র অতি উচ্চস্থানীয় কবি। তিনি ভবানীপাঠকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের ব্যবস্থা করিলেন, লোকে ইহার ন্যায়বিচার সহজে বুঝে না। যখন অন্যায় কার্য্য করেন নাই বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তখন ভবানী-পাঠক প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্যস্ত হইলেন কেন, তাহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। তাঁহার নিজের পার্থিব কার্য্য ফুরাইয়াছিল, অবশিষ্ট ছিল পরমার্থ চিন্তা; তাহা জীবনে বা মরণে, যে কোন দ্বীপে বসিয়া সমভাবে করা যাইতে পারে। এই শেষ কার্য্যে নিজকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে, কবির, তাঁহার দ্বারা একটুখানি কার্য্য করাইয়া লইতে বাকী ছিল; তাহা—শেষ আত্মোৎসর্গ দ্বারা নিজ জীবনের কৃতকার্য্যকে ভাস্বর করিয়া তোলা। যীশুখৃষ্ট, জোয়ানঅব্‌আর্ক, প্রভৃতির শেষ আত্মোৎসর্গ যেরূপ তাঁহাদের জীবনের কার্য্যকে বহুপরিমাণে সংবর্দ্ধিত করিয়াছিল, ইহাও তদ্রূপ। ভবানীপাঠক যদি সোজা অরণ্যে মহাপ্রস্থান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার চিত্র সেরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত না, তাঁহার কৃত কার্য্যও লোকের মনে সেরূপ বিশদবর্ণে রঞ্জিত হইত না। এ প্রায়শ্চিত্তে তাঁহার ইষ্টানিষ্ট কিছুই ছিল না; তাহা থাকিলে নিষ্কাম ধর্ম্মের ব্যাখ্যা অনুসারে তাহা করণীয় কার্য্যই হইত না। সমাজের জন্য তিনি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন; সেই কার্য্য সমাজের মনে জাগরূক থাকে, সমাজ তাহা ভুলিয়া না যায়, নিষ্কাম ধর্ম্মের তাহা কর্ত্তব্য; তাহাই

তিনি করিলেন। তাহা না করিয়া বনপ্রস্থান স্বার্থপরতা মাত্র হইত।

বঙ্কিমচন্দ্র কত উচ্চশ্রেণীর কবি, তাঁহার গ্রন্থের স্তরে স্তরে কত উচ্চ গভীর ভাবরাশি লুক্কায়িত আছে, ইহা তাহার একটা উদাহরণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির ন্যায় তিনি সব কথা একশত বার করিয়া বলিয়া নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন নাই; পাঠককে নিজ হইতে বুদ্ধি খরচ করিয়া তাঁহাকে জানিতে অবসর দিয়াছেন, বুদ্ধির অনুশীলনজনিত (Intellectual exercise) সুখ অনুভবের সুবিধা দিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর কবি তাহা আদৌ দিতে চাহে না, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করে; কারণ, ক্ষুদ্র বিষয়মাত্রই তাহাদের বিশেষ সম্বল; বৃহৎ ভাব তাহাদের ভাণ্ডারে এত বেশী নাই যে, তাহা অকাতরে ছড়াইতে পারে। যে দুই একটা আছে, তাহাই টানিয়া বাড়াইয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা ভিন্ন তাহাদের উপায়ান্তর নাই। যে সকল কবির গ্রন্থে ঈষৎব্যক্ত ভাব আছে, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব এই জন্য; তাঁহাদের গ্রন্থে নিজের বুদ্ধির অনুশীলন করিবার ক্ষেত্র থাকে, তজ্জনিত সুখানুভবের সুযোগ থাকে।

আর একভাবে ভবানীপাঠকের প্রায়শ্চিত্তের বিচার করা যাইতে পারে। তাঁহার মনে এরূপ হইয়াছিল যে, তিনি ভাল কর্ম্ম বলিয়া যাহা করিলেন, রাজপুরুষেরা বা সমাজ তাহা ভাল বলে না; অতএব হয়ত তাঁহার ভ্রম হইয়া থাকিতে পারে, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক। ইহা উচ্চশ্রেণীর সমালোচনা নহে।

৪। নিজের বাপ হইলেও খুন করিয়া তাহার ফলভোগ হইতে অব্যাহতিপক্ষে সাহায্য পাইবার অধিকার নাই, এই হিসাবে পুত্র সত্য-সাক্ষ্য দিতে বাধ্য। কিন্তু কয়জন তাহা করে? কেহ করিলে সমাজ তাহাকে বিশেষ প্রশংসা করে; কারণ সে নিজের স্বার্থ, নিজের বলবতী প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সমাজের স্বার্থ রক্ষা করিল। সামাজিক হিসাবে তাহার কার্য্য উত্তম; আর যদি সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি পিতৃস্নেহ হইতে বলবতী হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিগত হিসাবেও উত্তম বলা যায়। আমাদের সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যেরূপ সাহচর্য্য আছে, সেইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও

আছে; সমাজভুক্ত বিভিন্ন পরিবারের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব বলবান থাকিতে কিন্তু পুত্রের এই কার্য্য বিশেষ উত্তম বলা যায় না; কারণ, বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে এই বৈরিতার ভাব বিশেষ বলবান থাকিতে, একই পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশেষ সাহচর্য্য থাকা আবশ্যক; অন্যথায় এই পরিবার জীবনসংগ্রামে টিকিবে না। এইজন্যই সমাজরক্ষা প্রবৃত্তি অপেক্ষা পরিবাররক্ষা প্রবৃত্তিই বর্ত্তমান অবস্থায় বলবতী; এবং তাহা থাকাও মন্দ নহে।

৫। স্বামী স্ত্রী, একে অন্যের বিরুদ্ধে সমাজকে সাহায্য করিতে পারে না; সমাজের এরূপ দাবী অন্যায়। সমাজের উপকার হইলেও পরিবারের এতই অপকার হয় যে, এস্থলে সামাজিক প্রবৃত্তি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। মাতা সম্বন্ধে ততোধিক বর্জ্জনীয়। এস্থলে পারিবারিক কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া সামাজিক কর্ত্তব্য করিতে গেলে, বিশেষঅবস্থা ভিন্ন সমাজের উপকার হয় না। পরিবারই সমাজের উপাদান, পারিবারিকসম্বন্ধ রক্ষা সমাজরক্ষার পক্ষেই প্রয়োজনীয়; পরিবার একটি ক্ষুদ্র সমাজ। এই ক্ষুদ্র সমাজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া বৃহত্তর সমাজের স্বার্থরক্ষা করিবার আবশ্যকতা যে কোন অবস্থাতেই হয় না, তাহা বলা যায় না। কর্ত্তব্য-কার্য্যনির্দ্দেশক সাধারণপ্রবন্ধে তাহার যথোচিত আলোচনা সম্ভবপর নহে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষ করিয়া দেখাইতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বাড়িয়া যায়; কর্ত্তব্যকার্য্যের সাধারণবিভাগ মাত্র করা যাইতে পারে।

৬। কৃতজ্ঞতা প্রবৃত্তিকে পরাভিমুখী না বলিয়া আত্মাভিমুখী প্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে। কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পারিলে নিজের চরম সুখবোধ হওয়া উচিত। কৃতজ্ঞতার পরিমাণ অনুসারে, ইহা অন্য সমস্ত সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠা কর্ত্তব্য। স্ত্রী পুত্র পিতা, এমন কি স্বদেশপ্রেমকেও ছাড়াইয়া উঠা আবশ্যক; কারণ, ইহার চর্চ্চায় প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। যাহার এরূপ প্রবৃত্তি নাই, সে উপকার গ্রহণের অযোগ্য; উপকার পাইবারও অযোগ্য। আত্মাভিমুখী প্রবৃত্তির মধ্যে ইহা শীর্ষস্থানীয়; পরাভিমুখী, এমন কি ঈশ্বরাভিমুখী প্রবৃত্তিও, ইহার নিকট

পরাজয় স্বীকার করিলে মন্দ হয় না; কারণ, যাহার উপকারের প্রত্যুপকার করিতে বাকী আছে, তাহার অন্য প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবার অধিকারই জন্মায় নাই। কেবলমাত্র মাতৃভক্তির নিকট কৃতজ্ঞতা পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য; কারণ, তথায় কৃতজ্ঞতারও চরম হইয়া রহিয়াছে। বিলাতী ধরণের মাতার এ দাবী নাই।

৭। কোন ব্যক্তি উপকার গ্রহণ করিলে কৃতজ্ঞ থাকিতে বাধ্য, উপকারক কৃতজ্ঞতা চাহিলেও বাধ্য, না চাহিলেও বাধ্য; না চাহিলে কৃতজ্ঞতা চলিয়া যায় না, থাকিয়াই যায়। উপকারক কৃতজ্ঞতা চাহিতে বাধ্য, এ ঋণ হইতে মুক্তি দিবার অধিকার তাহার নাই; কারণ, মুক্তি দিলেও কেহ মুক্তি লাভ করে না; বরং কৃতজ্ঞতা হইতে একজনকে অব্যাহতি দিলে সংসারে অকৃতজ্ঞতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতে পারে; তাহাতে অযোগ্য ব্যক্তি ভিন্ন, সমাজস্থ অন্য সকলেরই অপকার হয়। কৃতজ্ঞতার ঋণ হইতে অব্যাহতি দিবার প্রবৃত্তি আপাতত উচ্চশ্রেণীর প্রবৃত্তি বলিয়া মনে হইলেও, ইহা উচ্চ শ্রেণীর প্রবৃত্তি নহে। তবে যে কৃতজ্ঞতা চাহে না, তাহার দানই যে সাত্বিক দান বলিয়া শাস্ত্রকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার গূঢ় কারণ আছে। উপকারকের কার্য্যের মধ্যে কোথাও স্বার্থ লুক্কায়িত থাকিলে তাহা নিঃস্বার্থ পরোপকার হয় না। সমাজে নিঃস্বার্থ পরোপকারীর সংখ্যা অল্প। নিঃস্বার্থ পরোপকারীর আদর্শ সংস্থাপন করা সমাজব্যবস্থাপকের একটা উদ্দেশ্য। কিন্তু যে স্থলে প্রকৃতই পরোপকারকার্য্যের মধ্যে কোন স্বার্থ লুক্কায়িত নাই, কেবলমাত্র পরাভিমুখী প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে স্থলে পরোপকার করা হয়, সেই অবস্থারই আলোচনা করা যাইতেছে। সেরূপ স্থলে কৃতজ্ঞতার প্রতি যে অধিকার, তাহা ত্যাগ করা বিধেয় নহে। কারণ, ইহাতে নিজের উপকার নাই, যাহাকে উপকার করা হইয়াছে তাহার উপকার নাই, সমাজেরও উপকার নাই, বরং অপকার আছে; কারণ, ইহাতে অকৃতজ্ঞতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতে পারে। কৃতজ্ঞতাবুদ্ধি সমাজসংরক্ষণ পক্ষে একটা উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি। কেহ কাহার হইয়া কোন কার্য্য করিয়া দিল—হয়ত অযাচিত ভাবেই করিয়া দিল; যে ইহার প্রতিদান না করে,

সে সমাজের খরচায় নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লয়। এই প্রবৃত্তি প্রসারে সমাজ উৎসন্নে যায়। এ স্থলে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে, কৃতজ্ঞতার কথাই হইতেছে, প্রতিদানের কথা হইতেছে না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কার্য্যের দ্বারা এবং মনের দ্বারা হইতে পারে। আবশ্যক না থাকিলে, উপকারক কার্য্যের দ্বারা প্রদর্শিত প্রত্যুপকার প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন; মনের দ্বারা যাহা প্রদর্শিত হয়, তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না, তাহার দাবী তিনি রাখিতে বাধ্য; অন্যথায় অকৃতজ্ঞতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতে পারে। উপকারক স্বয়ং প্রত্যুপকার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেও উপকৃত ব্যক্তির দায়িত্ব যায় না, সমাজস্থ অন্য ব্যক্তিকে সেই উপকারের মূল্য অর্পণ করিতে হয়।

১৩। সামাজিক কর্ত্তব্য—ইহা নির্দ্ধারণের কাঠিন্য।

ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের এই পর্য্যন্ত সমালোচনা করিয়া এখন সামাজিক কর্ত্তব্যের বিষয় বিবেচনা করা যাউক। এই কর্ত্তব্য নির্ণয়, বিশেষ চর্চ্চা, সমধিক জ্ঞান, উচ্চতম প্রবৃত্তি অর্জ্জন সাপেক্ষ। সাধারণত আমরা তাহা জানি না। মনে করি, ভগবান সেই জ্ঞান সকলকেই বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। অথবা মনে করি, আমার বিদ্যাবুদ্ধির অতীত কি আছে? সামাজিক কর্ত্তব্য তো সামান্য কথা। আমরা যত বড়ই অভাবগ্রস্ত হই, একটি বিষয়ের অভাব বোধ করি না। শ্বাসপ্রশ্বাসের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বায়ুর অভাব অপেক্ষা প্রাচুর্য্যই যেমন উপলব্ধি হয়, তেমন এ বিষয় আবশ্যকের অতিরিক্ত পরিমাণই রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি। অর্থ সংগ্রহ করিয়া কেহ সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া ইতিহাসে ব্যক্ত নাই। বলবীর্য্য লাভ যতই করুক, তাহা যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করে না। খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্বন্ধেও ঐরূপ। কিন্তু বুদ্ধি সম্বন্ধে অপ্রাচুর্য্য বোধ অতিশয় বিরল, বরং যে যত মূর্খ, যাহার এ বিষয়ে যত অভাব, সে নিজেকে ততই প্রতিপত্তিশালী মনে করে। আমি একটী লোককে বিশেষরূপ জানিতাম, সে পরের দ্বারা প্রতারিত হইতে অদ্বিতীয় ছিল। বহু অর্থ পাঁচজনে ঠকাইয়া লইলেও কোন দিন সে বুদ্ধির অপ্রচুরতা অনুভব করে নাই; বরং আমাদিগকে

অতিরিক্ত পরিমাণে এই সামগ্রীর অধিপতি মনে করিয়াই চির জীবন কাটাইয়া গিয়াছে। অথচ এই বুদ্ধি, অন্যান্য সম্পদ হইতে অধিকতর মূল্যবান। অন্যান্য সম্পদ থাকিলে বুদ্ধিলাভ হয় না, বুদ্ধি থাকিলে অন্যান্য সম্পদ লাভ হয়। সামাজিক কর্ত্তব্য জ্ঞান বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি ও চর্চ্চা সাপেক্ষ; সমাজের জীবন অতি দীর্ঘ; তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অতি কঠিন। বাণিজ্য-ব্যবসা কৃষি ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞানের জ্ঞান যে চর্চ্চাসাপেক্ষ তাহা সহজেই স্বীকৃত হয়। যে ইহাদের চর্চ্চা করে নাই, সে নিপুণ ব্যক্তির সহিত সমকক্ষতা করিতে যায় না; কারণ, যে বৈদ্যুতিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নহে, সে কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রে হস্তক্ষেপ করিলে নিজের মূর্খতা শিরায় শিরায় অনুভব করে। কিন্তু সমাজ জড় পদার্থ নহে; ইহার উপর অযথা হস্তক্ষেপের ফল তত সহজে অনুভূত হয় না। ইহার উপর অযথা হস্তক্ষেপজনিত প্রজার উপর যে মৃদু আঘাত, মস্তিষ্কের কাঠিন্যের পরিমাণ অনুসারে তাহা অননুভূত থাকিয়াও যায়।

শরীর নিতান্তই আমাদের নিজস্ব বস্তু; তথাপি বিকৃত অবস্থায় ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাভাবিক জ্ঞানের প্রাচুর্য্যবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া নিজের ব্যবস্থা নিজে করিতে উদ্যত হই না—ডাক্তার, অর্থাৎ শরীর বিষয়ে যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছে, তাহাকে ডাকিয়া আনি। নিজেই ব্যবস্থা করে না এমন মূর্খ যে নাই তাহা নহে, তবে প্রবন্ধ মধ্যে তাদৃশ লোককে লইয়া টানাটানি করা নিষ্ঠুরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাজদ্বারে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, যদিও তাহার সহিত নিজেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহার ঘটনাবলিতে অন্যের অপেক্ষা নিজের অভিজ্ঞতা বেশী, তথাপি উকিলের দ্বারে উপস্থিত হই; কারণ, এ সমস্ত বিষয় জটিল; বিশেষ চর্চ্চা ভিন্ন ইহাতে দক্ষ হওয়া যায় না। বিষয় সহজ না হইয়া জটিল হয় কখন? যখন বিষয় বহুদিন ধরিয়া বিভিন্নরূপ অবস্থার মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।* এখন সামাজিক রহস্য, শরীরতত্ত্ব কিংবা আইনের তর্ক হইতে কি নিতান্ত কম জটিল? তাহা যে হইতে পারে না, সমাজের রহস্যের হিসাব ধরিলেই তাহা প্রতীত হইবে—আইন তো সামাজিক বিধানের

কুত্রাংশ মাত্র। অতঃপর, যাঁহারা বিবাহ বা শিক্ষা বা দান ইত্যাদি সম্বন্ধে নিজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন, পরন্তু পরের উপদেষ্টা হইতে যাইবেন, তাঁহারা এই সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কোথায় পাইলেন; তাহা পূর্ব্বে একবার খুঁজিয়া দেখিবেন। মাতৃতন্ত্রের সহিত যে এই অভিজ্ঞতা পান করা যায় না, তাহা বলাই বাহুল্য; তবে শব্দান্তর দ্বারা যেন সেই কথাই কেহ না বলেন। এ অভিজ্ঞতা চাহি না, সমাজব্যবস্থাপক হইতে চাহি না বলিলে কুলাইবে না। কেবল মন্ত্রিই সমাজব্যবস্থাপক নহেন, সমাজস্থ ব্যক্তি মাত্রই অল্পবিস্তর সমাজব্যবস্থাপক। আর ব্যবস্থাপক না হইলেও সামাজিক কার্য্য করিতে সকলেই বাধ্য, কাজেই এ অভিজ্ঞতা চাহিতেই হইবে, পুত্রকন্যার বিবাহ অনেককে নিজ ইচ্ছামত দিতে হয়, ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে হয়, শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে হয়। শুধু তাহা নহে, সামাজিক প্রথার কোনটার পোষকতা করিয়া, কোনটার নিন্দা করিয়া, সমাজে ব্যবস্থাপক হইতে হয়। ইহার উপর আবার রাজনৈতিক ব্যাপার আছে, তাহাতেও যোগ দিতে হয়। কাজেই সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি যথাসম্ভব সকলেরই অর্জ্জনীয়।

১৪। সামাজিক কর্ত্তব্য নির্ণয়।

এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ নির্ণয় আবশ্যক হইতেছে। সমাজস্থ সমস্ত বা অধিকাংশ ব্যক্তির স্থায়ী হিত যাহাতে হয়, তাহাই সমাজের কার্য্য এবং ব্যক্তিরও কার্য্য; অন্যথায় তাহা উভয়েরই বর্জ্জনীয়। ইহাই হইতেছে সম্বন্ধ। সমাজের কার্য্য বিভিন্নশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—

১। রাজনৈতিক কার্য্য।

২। ধর্ম্মাধিকরণিক কার্য্য।

৩। ব্যক্তিবর্গের উন্নতিবিধায়ক কার্য্য।

৪। যৌথব্যবসায়িক কার্য্য।

এই কর্ত্তব্য, লিখিত পর্য্যায়ক্রমে গুরু ও লঘু। ধর্ম্ম, শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা, তিনশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কার্য্য হইতেছে।

রাজনৈতিক কর্ত্তব্য।

এই কর্ত্তব্য সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। এই কর্ত্তব্যের উদ্দেশ্য—বিরুদ্ধ-স্বার্থবিশিষ্ট শত্রু হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য; কারণ, ইহা পালিত না হইলে অন্যান্য কর্ত্তব্য পালনের সুযোগ থাকে না; সমাজরক্ষামূলক কর্ত্তব্য পালন করিতে না পারিলে, সমাজরক্ষা না হইলে আর কি হইবে? সমাজরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়—বল, যুদ্ধ। অন্য উপায় আছে কি না এবং তাহার মূল্য কি, দেখা আবশ্যক। হিন্দু-সমাজের স্বাধীনতা নাই, কিন্তু স্বতন্ত্র সমাজ রহিয়াছে; অতএব বল, যুদ্ধ মাত্র, সমাজরক্ষার উপায় কি করিয়া বলা যাইতে পারে? স্বতন্ত্র সমাজ রহিয়াছে, কিন্তু বিজেতার অনুগ্রহে। সমাজরক্ষার জন্য নিজের উপযুক্ততার জন্য চেষ্টা না করিয়া পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করা শ্রেষ্ঠ, কি প্রবৃত্তিতে বলা যাইতে পারে তাহা আমার অনুমেয় নহে। অতএব সমাজের প্রথম কর্ত্তব্য—সমাজরক্ষার উপযোগী বলসঞ্চয়। ঐ বলসঞ্চয়ের অনুকূল ব্যবস্থা করিতে সমাজ বাধ্য; তাহার প্রতিকূল ব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা করিতে সম্পূর্ণরূপে নিবারিত। ঐরূপ চেষ্টা নিরতিশয় অশ্রদ্ধেয়। রাজনৈতিক দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হইতেছে, অন্যান্য সমাজ বিধ্বস্ত করিয়া নিজের সমাজের শক্তিবৃদ্ধির বিশেষ ব্যবস্থা করা। সমাজ সে ব্যবস্থা না করিলেও বিপরীত ব্যবস্থা কোন মতেই করিতে পারে না।

"সমাজরক্ষাই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, সমাজরক্ষা অপেক্ষা উচ্চতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের জীবন-রক্ষাই যেমন উচ্চতম কর্ত্তব্য নহে, জীবনপাত করিয়াও যেমন মহত্তর কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয়, তেমন সমাজরক্ষাই সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। আত্মরক্ষা অপেক্ষা আত্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ—আত্মরক্ষাকাঙ্ক্ষিত চেষ্টায় অহঙ্কারের বৃদ্ধি হয়। স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা স্বার্থত্যাগই শ্রেষ্ঠ—স্বার্থপ্রণোদিত চেষ্টায় স্বার্থপরতাই বৃদ্ধি পায়।"

এ মহত্তর কর্ত্তব্য কি?

"আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বরলাভ। ব্যক্তি বা সমাজ বাঁচিয়া থাকিল [illegible] তাহা দেখিতে হইবে না; [illegible] পারত্রিক উপযুক্ত [illegible]

কিনা তাহাই দেখিতে হইবে; তদুদ্দেশ্যেই সমাজকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টা আপাততঃ সফল হউক বা না হউক, তাহাও দেখিবার আবশ্যক নাই; সময়ে সে সফলতা আসিবেই—তাহাই চরম সফলতা।"

নিজের জীবনে আধ্যাত্মিক বা ঈশ্বরমুখী প্রবৃত্তির চর্চ্চা যেরূপ প্রশংসার্হ, পরের জীবনে তাহার ব্যবস্থা করিতে যাওয়া সেরূপ নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কোন্ প্রবৃত্তিকে শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিতে হইবে, তাহা জ্ঞানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হইবে। আধ্যাত্মিকতার কোন জ্ঞান হইতে পারে না, বিশ্বাস মাত্র হইতে পারে। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সামাজিক জীবন গঠনে হস্তক্ষেপ করা নিরাপদ নহে। জ্ঞানই প্রবৃত্তির উপদেষ্টা হইতে পারে, কাহারও বিশ্বাস সে আসনে বসিতে পারে না; শ্রেণীবিশেষের বা অধিকাংশ লোকের বিশ্বাসেরও সে অধিকার নাই। ব্যাপ্তি বিশ্বাসের অখণ্ডনীয় প্রমাণ নহে। কত কুসংস্কার পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল; তত্রাপি তাহা এখন অশ্রদ্ধেয় হইয়া গিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ নরবলি, সহমরণ প্রথার উল্লেখ করা যাইতে পারে; সর্প ও বৃক্ষের পূজার উল্লেখ করা যাইতে পারে; বঙ্গদেশে কৌলীন্য, আত্মরস প্রভৃতি জঘন্য প্রথার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"আধ্যাত্মিকতা নাই ধরিলাম, তত্রাপি পাশব বলের দ্বারা আত্মরক্ষাই সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য নহে। প্রীতিপ্রচার, সার্ব্বভৌম প্রেমপ্রতিষ্ঠা, আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত জগতের তৃপ্তিবিধান—আত্মরক্ষা করিয়া হউক আর আত্মত্যাগ করিয়াই হউক—তাহাই কর্ত্তব্য। জীবন কি? স্বার্থ কি? জলবিম্ব মাত্র, এই আছে এই নাই। একমাত্র নিত্যশাশ্বতসনাতন বস্তু হইতেছে—সেই প্রেম, তাহারই প্রতিষ্ঠা কর। যীশু আত্মরক্ষা করিলে তাহা হইত না, বুদ্ধ স্বার্থরক্ষা করিলে তাহা হইত না, ত্যাগ করিয়াই প্রীতির আসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইঁহাদের ব্যক্তিগত আদর্শ যেমন কার্য্যকর হইয়াছে, সমাজের আত্মবলির আদর্শ সেইরূপ বা তদপেক্ষা কার্য্যকর হইবে না কেন? হিন্দুসমাজ এই মহাযজ্ঞে আপনাকে আহুতি

প্রদান করিয়া ধন্য হউক। আমরা অর্থ চাহি না, সম্পদ চাহি না, গৌরব চাহি না, দিগ্বিজয় চাহি না; চাহি কেবল সকলের তৃপ্ত্যর্থে আত্মবিসর্জ্জন দিতে। ইহা অপেক্ষা মহীয়ান উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে? এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ চেষ্টা অপেক্ষা আর কি উচ্চতর কর্ত্তব্য হইতে পারে? যদি ধরিয়াই লওয়া যায়, আধ্যাত্মিকতা জ্ঞানের বিষয় নহে, বিশ্বপ্রেম এবং তাহার প্রয়োজনীয়তা জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিবার বাধা নাই। যদি বল, বিশ্বপ্রেম লইয়া আমার কি উপকার হইবে? তাহার উত্তর এই যে, ইহাই তোমার চরম উপকার। যদি এরূপ ভাবে ভাবিতে না পার, তবে ভাবিতে অভ্যাস কর; সেই অভ্যাসই তোমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। জ্ঞানের নিকটই জিজ্ঞাসা কর, ইহা সত্য কি না।"

তথাস্তু; জ্ঞানেরই নিকট জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে। আপত্তিকারক জ্ঞানের দোহাই দিয়া ভাল করেন নাই; যে হৃদয়োচ্ছ্বাসের দোহাই দিতেছিলেন, তাহাতে নিবদ্ধ থাকিলে ভাল হইত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নিজের জীবনে আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তির চর্চ্চা যেরূপ প্রশংসার্হ, পরের জীবনের উপর তাহা প্রয়োগ করিতে যাওয়া সেরূপ নহে। মনুষ্যের কর্ত্তব্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইতেছে—প্রথম, ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য; দ্বিতীয়, সামাজিক কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষার পরিবর্ত্তে প্রীতিসংস্থাপন উচ্চতর ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য হইতে পারে। এই কর্ত্তব্য সমাজে প্রচার করিবার তিনটী মাত্র উপায় আছে:—প্রচার, শিক্ষা প্রদান ও আদর্শ সংস্থাপন। এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকারে এই কর্ত্তব্য সমাজবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে, তাহা অপ্রীতিকর উপায়ের সাহায্যে প্রীতিপ্রচার করা হয়। এই অপ্রীতিকর উপায়—শাসন। সমাজশাসনের এক অংশ বিচার বিভাগ; ইহার সাহায্যে প্রীতির প্রচার হইতে পারে না, শাসন দ্বারা প্রীতির প্রচার হয় না, ন্যায়ের (Justice) প্রচার হইতে পারে। যখনই আত্মরক্ষার পরিবর্ত্তে প্রীতিপ্রতিষ্ঠা উচ্চতর ব্রত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, তখনই শাসনের সাহায্য গ্রহণ পরিহার্য্য হইয়াছে—ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য হইতে উদাহরণ দেওয়া যাউক। শত্রু তোমাকে প্রহার করিল, তুমি রাজদ্বারে যাইতে পারিবে না; প্রহারের বিনিময়ে

প্রীতি অর্পণ করিবে। রাজদণ্ডে লোকে আর প্রীতির [illegible] হইল না; কপাই মানুষের উদ্ধার তাহাতে হয় না। আততায়ীকে ক্ষমা করিয়া যখন তাহাকেও প্রেম প্রদান করিবে, তখন তাহার মনে তোমার আত্মিক বলের দ্বারা (Spiritual power) প্রেম সঞ্চারিত হইবে; তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে না—ইহাই প্রীতিবাদ। শাস্তি দিলে তাহার মনে প্রেমের উদয় হইবে না, প্রতিহিংসার উদয় হইবে। শাসনের দ্বারা প্রীতিপ্রতিষ্ঠা হয় না, তাহার বিঘ্নই হয়; অন্যথায় আত্মত্যাগের প্রয়োজনীয়তা এবং মহত্ব কোথায়? বিচারালয় যদি এরূপ হইত, বিচারক যদি এরূপ হইতেন, যে তোমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে তাহাকে লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহার সহিত তোমার রাখিবন্ধন করিয়া ছাড়িয়া দিতেন, তাহা হইলেও বা হইতে পারিত। সমাজ তাহার শাসনদণ্ড একমাত্র বিচারবিভাগের দ্বারা পরিচালন করে না; সামাজিককে স্বাধীন কার্য্য করিবার ক্ষমতা হইতে অল্প বিস্তর বঞ্চিত করিয়া, সামাজিক নিন্দা ও প্রশংসার সৃষ্টি করিয়াও শাসন সম্পাদন করে। এই শাসন অনেক স্থলে বিচারকের দণ্ড হইতে গুরুতর শাসন হইয়া থাকে; ইহার ভয়ে সর্ব্বদা ত্রাহি ত্রাহি করিতে হয়; রাজদণ্ডও ইহা অপেক্ষা লঘুদণ্ড হইয়া পড়ে। প্রীতিবাদী সমাজের শাসনদণ্ড প্রচলন পক্ষে সহায়তা আদৌ করিতে পারেন না; করিলে তাঁহার বচনের সহিত কার্য্যের অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে। বরং, সমাজে যে সমস্ত শাসন বদ্ধমূল রহিয়াছে, তাহা উন্মূলন করিয়া প্রত্যেকের স্বাধীন কার্য্য করিবার শক্তির প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি সাহায্য করিতে বাধ্য; অন্যথায় তিনি প্রকৃত প্রীতিবাদী নহেন। অতএব প্রীতিবাদরূপ ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য, সমাজে প্রচার করিতে হইলে, শাসনদণ্ডের সাহায্যে তাহা করা যাইতে পারে না, এবং সমাজে এইরূপ কোন শাসনদণ্ডের ব্যবস্থা থাকিলে, প্রীতিবাদী তাহা উন্মূলন পক্ষে সাহায্য করিতে বাধ্য, ব্যক্তিগত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সংস্থাপন পক্ষে সাহায্য করিতে বাধ্য; কারণ যখনই যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অভাব আছে, তখনই তথায় শাসনদণ্ড প্রচলিত রহিয়াছে। শাসন প্রীতি নহে, তাহার অন্তরায়।

[illegible]

আর প্রীতি একই বৃত্ত না হইলেও অন্যায় আচরণ প্রীতিপ্রতিষ্ঠার সমধিক অন্তরায়। সেইজন্য, সমধিক অন্তরায়কে নিরস্ত করিবার জন্য, ন্যায়ব্যবস্থার পোষকতা করিতে হইবে।"

তাহা হইলে এই সব শাসনব্যবস্থার পোষকতা মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, গৌণ উদ্দেশ্য; ইহা আপাত উদ্দেশ্য, চরম উদ্দেশ্য নহে। তাহা হইলেই স্বীকার করিতে হইবে, বিচার প্রতিষ্ঠা প্রীতিপ্রতিষ্ঠার সহায়ক এবং অগ্রগামী কর্ত্তব্য।

"অগ্রগামী নহে, সমসাময়িক কর্ত্তব্য।"

তাহা হইলে সাময়িক বিচার ত্যাগ করিয়া প্রীতিসংস্থাপনের দিকে যাইব কখন? সমাজ কি তাহার ব্যবস্থা করিবে?

"যতদূর সম্ভব।"

কতদূর সম্ভব তাহা কে স্থির করিবে? কার পক্ষে কতদূর সম্ভব, সমাজ তাহা স্থির করিতে পারে না। বিচার এবং প্রীতি উভয়কেই রাখিতে হইয়াছে। প্রীতি স্থাপনের পক্ষে বিচার যে স্থলে বেশী সহায়ক, সে স্থলে বিচার অবলম্বন করিতে হইবে। সমাজ, কোন স্থলে প্রীতি কোন স্থলে বিচার অবলম্বনীয়, তাহা স্থির করিয়া দিতে পারে না। তাহা হইলেই প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজের জন্য তাহা স্থির করিতে হইবে। স্থল বিশেষে বিচারই অগ্রগামী কর্ত্তব্য।

এখন আমরা পাইতেছি এই যে, প্রীতিপ্রতিষ্ঠা সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য হইলেও, তাহার একটী বিশেষ অন্তরায় আছে—তাহা ক্ষুদ্রবৃত্তি। বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র প্রীতিবাদ ভ্রমমাত্র। বিচারপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; বিচারকে একেবারে বাদ দিয়া যে পারে না, মনুষ্যসমাজের ক্রমবিকাশ দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। মানুষ যখন নরমাংসভোজী সম্প্রদায়, তখন যীশুখৃষ্টের প্রীতি প্রচারে কোন ফল নাই। পশুসমাজ হইতে মনুষ্যসমাজের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। পশুসমাজে পশুরা একমাত্র প্রীতিপ্রচার করিতে ব্যস্ত থাকে না। সেই প্রথমস্তরের মনুষ্যসমাজ হইতে অতি হিংস্র পশু-সমাজের বিশেষ শ্রেষ্ঠতা নাই। কণ্টকাকীর্ণ অবস্থা ভিন্ন এই প্রীতির

ভাবই আসিতে পারে না। ন্যায়বিচার প্রীতির অগ্রগামী। বন্যজাতির মধ্যেও কতকটা বিচারব্যবস্থা আছে। একাধিক ব্যক্তি সমবেত চেষ্টার দ্বারা কোন পশু বধ করিলে, কে কি কার্য্যের জন্য কোন অংশ পাইবে, তাহা তাহাদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে এবং সেই নির্দ্দেশ মতেই তাহারা বিভাগ করিয়া লয়—ইহা বিচার, প্রীতি নহে। সমাজের মধ্যে প্রীতির ভাবের পূর্ব্বে বিচারের ভাব উদ্ভূত হয়। ন্যায় বিচারের আদরের সঙ্গে সঙ্গে প্রীতির ভাব বৃদ্ধি পাইতে পারে, বিচারকে বাদ দিয়া পারে না; পারিলেও সমাজের মঙ্গল হয় না। সমাজের যে অবস্থায় ন্যায়া-ন্যায় বিচার বোধ অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে নিবদ্ধ, যে অবস্থায় অধিকাংশ লোক স্বার্থের জন্য পরের ক্ষতি করিতে প্রস্তুত, সে অবস্থায় প্রীতিপ্রচার কার্য্যে অধিক লোক আত্মবিসর্জ্জন করিলে সমাজের উপকার হয় না, অপকার হয়; প্রীতি প্রতিষ্ঠা হয় না, স্বার্থের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হয়। কারণ, যাহারা বিশেষ প্রীতিমান্, তাহারাই সমাজ হইতে তিরোহিত হয়, যাহারা স্বার্থপর তাহারা রহিয়া যায়। প্রীতিমান্ ব্যক্তিগণ আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া ক্রমান্বয়ে তিরোহিত হইতে থাকে এবং কালে তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না।

"তাহা নহে; এই আত্মত্যাগের আদর্শে প্রীতি বৃদ্ধি হইবে।"

কি করিয়া হইবে? অগ্রে সমাজ আদর্শ গ্রহণের উপযোগী হওয়া আবশ্যক, অন্যথায় হইবে না। কি পরিমাণে উপযোগী হইয়াছে, সমাজ তাহা স্থির করিবে না, সামাজিক স্থির করিবে।

সামাজিকআত্মত্যাগদ্বারা আদর্শস্থাপন সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। অন্যান্য সমাজ যথেষ্ট উন্নত না হইলে, এই আত্মত্যাগ আত্মহত্যা মাত্র হইবে, আদর্শ গৃহীত হইবে না। অতএব, যদিও আত্মরক্ষা অপেক্ষা প্রীতিপ্রতিষ্ঠা উচ্চতর কর্ত্তব্য হয়, তবুও সর্ব্বত্র আত্মত্যাগ করিয়া প্রীতিপ্রতিষ্ঠার স্থল নাই; স্থানবিশেষে বরং তাহাতে বিপরীত ফল হইতে পারে। পক্ষান্তরে, সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করিলে প্রীতিপ্রতিষ্ঠার সুযোগ চলিয়া যায় না; ইহা বিলম্বে স্থাপিত হইতে পারে, এইমাত্র অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা সত্ত্বেও অগ্রে আত্মরক্ষা করিয়া সমস্ত সমাজ যখন

আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে, এক সমাজ যখন সমাজান্তরের উপর পীড়ন করিতে বিরত হইবে, তখনই সামাজিক প্রীতিপ্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সময় আসিবে। সেই সময়ে প্রীতিপ্রতিষ্ঠার বিশেষ উদ্যম করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, তৎপূর্ব্বে সমাজ শুদ্ধ লোক সাগরে ঝাঁপ দেওয়া ততটা নিরাপদ নহে।

প্রীতিপ্রদান করা, সকলকে ভালবাসাই মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া যাঁহারা নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, কেন ইহা কর্ত্তব্য ?

"ইহাতেই তৃপ্তি, অন্যবিধ সুখ প্রহেলিকা মাত্র।"

তবেই হইতেছে, প্রীতিপ্রদানই মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, তৃপ্তি বা সুখ সেই মুখ্য উদ্দেশ্য। আবার দেখিতে হইবে, এই সুখ জগতের সুখ নহে, ব্যক্তিবিশেষের জীবনের তাহা উদ্দেশ্য হইতে পারে না; নিজের সুখ মাত্র তাহার লক্ষ্য স্থল হইতে পারে, অন্যের সুখদুঃখের সহিত তাহার জীবনের বা তাহার জীবনের কর্ত্তব্যের কোনই সম্বন্ধ নাই; পরের সুখের ব্যবস্থা, দুঃখের মোচন করিতে পারিলে, তৎসঙ্গে যদি নিজের সুখদুঃখ জড়িত না থাকে, তবে আর তাহা নিজের কর্ত্তব্য হয় না। জগত সুখী হইল, স্বজাতি, স্বদেশী সুখী হইল; নিজের চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা হইল। জগতে দুঃখকষ্ট রহিয়াছে, স্বদেশে দুঃখদরিদ্রতা রহিয়াছে, তাহাতে নিজের চিত্ত ব্যথিত হইতেছে; এইরূপ দুঃখকষ্ট থাকিতে সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগে রুচি হইতেছে না, মনকে শান্ত করা যাইতেছে না, কাজেই প্রীতিপ্রচার জীবনের ব্রত হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা পড়িলেও স্মরণ রাখিতে হইবে, আত্মতৃপ্তিমাত্রই কার্য্যের উৎপাদক, অন্য উৎপাদক নাই। জগতে দুঃখকষ্ট থাকিতে, বুদ্ধদেব রাজাগিরি করিয়া আপনার চিত্তকে প্রশমিত করিতে পারিলেন না, কাজেই রাজাগিরি করা হইল না; জগতের হিতার্থে বহির্গত হইতে হইল। তুমি, আমি, জঙ্গীস খাঁ, তৈমুরলঙ্গ, অর্দ্ধজগত শ্মশানে পরিণত করিয়াও রাজাগিরি করিতে সম্মত, আমরা তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকি, ব্যক্তিগত হিসাবে তাহাই আমার কর্ত্তব্য; অন্য কর্ত্তব্যের উপদেশ দিলেও, চিত্তবৃত্তির অবস্থান্তর না হওয়া পর্য্যন্ত সে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি না।

"পারা না পারার কথা হইতেছে না, পারা উচিত কি না সেই কথা হইতেছে। আত্মসুখানুসন্ধান অপেক্ষা প্রীতিদান উচ্চতর সুখের অবস্থা কি না, সেই কথাই হইতেছ। স্বীকার করিলাম, নিজের সুখানুসরণ ভিন্ন তোমার অন্ত কর্ত্তব্য নাই। তাহা হইলেও, প্রীতিদান যদি উচ্চতর সুখের অবস্থা হয়, তবে তোমার ন্তায় আত্মবাদীকেও সেইরূপ চিত্তবৃত্তি অর্জ্জনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন করিয়াও প্রীতিদান করা কর্ত্তব্য।"

ইহা উচ্চতর সুখের অবস্থা কি করিয়া জানা গেল?

"কি পাষণ্ড! নিজের পাশবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা অপেক্ষা পরহিত উচ্চতর সুখ নহে? জঙ্গিস খাঁ অপেক্ষা বুদ্ধদেব উচ্চতর ব্যক্তি নহেন!"

ব্যক্তিগত হিসাবে নহেন; ইহাই ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। তুমি, আমি, জগত, বুদ্ধদেবের নিকট ঋণী; কাজেই তাঁহাকে স্ব স্ব হৃদয়ে উচ্চস্থান দিতে বাধ্য; জঙ্গিস খাঁ সম্বন্ধে সেরূপ বাধ্য নহি। কিন্তু বুদ্ধদেব যদি নিজের ভিতরই নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, জঙ্গিস খাঁ যদি নিজের চিত্তবৃত্তির ভিতরই নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, তাহা হইলে উচ্চনীচ ভাবের স্থল থাকে না, চিত্তবৃত্তি চরিতার্থতা মাত্র থাকে।

"চিত্তবৃত্তিচরিতার্থতার কি ইতর বিশেষ নাই, সুখের কি তারতম্য নাই? বার্ত্তাকুদগ্ধ সহায়ে তণ্ডুলরাশি দ্বারা উদরপূর্ত্তি অপেক্ষা পায়স পিষ্টকের কি মধুরতা নাই?"

কথাটা নিতান্ত প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক হইয়া পড়িল। শরীর গঠনের সমধিক উপযোগিতা থাকিলে অবশ্যই আছে, অন্যথায় নাই। প্রীতির দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের শরীর কিরূপে বর্দ্ধিত হয়, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই; অবশ্যই ইহার উচ্চতর গুণ আছে: ইহা ব্যক্তিগত ভাবে শরীরবর্দ্ধক নহে, সামাজিক ভাবে শরীরবর্দ্ধক: ইহা সমাজ গঠনের সমধিক উপযোগী; তজ্জন্য ইহা বিশেষ গৌরবান্বিত চিত্তবৃত্তি, তাহাতে সন্দেহ না। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে, এই গৌরব প্রীতির নহে, সমাজ-গঠনের উপযোগিতার উপর এই গৌরব নির্ভর করে। এইখানে একটী বিশেষ তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে; যদি তাহাই হয়, তবে প্রীতি

অন্তসম্পর্কবিরহিত, স্বাধীন কর্ত্তব্য নহে, ইহা আপেক্ষিক কর্ত্তব্য মাত্র; ইহা সমাজের মঙ্গলের অপেক্ষা করে। প্রীতিদ্বারা যে পরিমাণে সেই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, সেই পরিমাণে ইহা কর্ত্তব্য, অন্যথায় প্রীতির পরিবর্ত্তে বিচারই শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য।

"ইহা সর্ব্বথা সমাজের মঙ্গলজনক।"

বিচার কাহাকে বলে? ইহা প্রীতির প্রতিপক্ষ। ক্রূর নরহন্তাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিবার পক্ষে সহায়তা করা সকলেই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। ইহা কি প্রীতিবাদ? উদ্বন্ধনরজ্জুর পরিবর্ত্তে তাহাকে প্রীতি দেওয়া হয় না কেন? যদি বলা যায়, তাহা হইলে হতব্যক্তির আত্মীয়গণের প্রতি প্রীতির অভাব প্রদর্শন করা হয়, এজন্য দেওয়া যাইতে পারে না। সে কথায় কুলাইবে না; এই আত্মীয়গণই বা প্রীতিবাদের জন্য দায়ী হইবে না কেন? তাহাদিগকেও রজ্জুর পরিবর্ত্তে প্রীতি প্রদান করিতে বাধ্য করা হইবে না কেন? তাহা হইলে সমাজ উৎসন্নে যাইবে। অতএব পুনরায় প্রমাণ হইল, প্রীতি অন্যসম্পর্কবিরহিত কর্ত্তব্য নহে, সমাজের মঙ্গলই সেই কর্ত্তব্য। সর্ব্বরূপ অবস্থাতেই প্রীতিপ্রদান সমাজের মঙ্গলজনক নহে, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

"দয়া বা প্রীতি এবং ন্যায় বিচার, ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? কোন্‌টা কোন্ অবস্থায় অবলম্বনীয়?"

দয়া পশুর মধ্যেও দেখা যায়। সমাজগঠনের পক্ষে দয়া ও প্রীতি উভয়ের উপযোগিতা আছে। যে স্থলে কুকার্য্যের প্রশ্রয় দিবার সম্ভাবনা নাই, সেইই দয়ার স্থল, অন্যথায় কদাচ দয়া বা প্রীতিপ্রদানের স্থল নাই। এই প্রসঙ্গে একটা দোষী ব্যক্তির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে মাত্র, যে স্থলে দোষের সংস্রব নাই, বিনা দোষে যে স্থলে দুঃখদারিদ্র্য বিরাজমান, সে স্থলে প্রীতির স্থান কতদূর? কতদূর তাহা পরোপকারব্রত বিচার স্থলে বলা গিয়াছে। অন্যান্য চিত্তবৃত্তির সহিত প্রীতির তুলনা করিলে দেখা যায়, মানুষের সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রয়োজনীয়তা হইতে ইহার উৎপত্তি; অন্যথায় পরের কার্য্য করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। ইহার আর একটী বিশেষত্ব আছে। সামাজিক বলের

দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে পরের কার্য্য করিতে বাধ্য করিলে, তাহাতে সেই ব্যক্তির কোন সুখ নাই, স্বপ্রণোদিত হইয়া প্রীতিদানপ্রবৃত্তির চর্চ্চাতেই সুখ। নিজের কার্য্য করিয়া যেরূপ সুখলাভ করা যাইতে পারে, এই প্রবৃত্তির সহায়ে পরের কার্য্য করিয়াও সুখলাভ করা যাইতে পারে। ইহাই যে প্রধান সুখ, তাহা বলা যাইতে পারে না; অনেক স্থলে দুষ্কৃতের দণ্ডবিধান শ্রেষ্ঠতর চরিতার্থতা। ব্যক্তিগত হিসাবে ইহার প্রাধান্য অপ্রাধান্য নাই, অনুশীলনেরও আবশ্যকতা নাই; সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার আবশ্যকতা হইতেই ইহার আবশ্যকতা উৎপন্ন হইয়াছে।

১৫। দ্বিতীয় শ্রেণীর সামাজিক কর্ত্তব্য—ধর্ম্মাধিকরণিক।

অর্থাৎ সমাজস্থ ব্যক্তিগণ, একে অন্যের উপর হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। সমাজরক্ষা কিন্তু আরও অগ্রগামী কর্ত্তব্য। তজ্জন্য ব্যক্তিবিশেষ—যথা, শাসনকর্ত্তা (Dictator), শ্রেণীবিশেষ—যথা যুদ্ধব্যবসায়ী, অন্যের স্বার্থের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে। সমাজের সাধারণ অবস্থায় পারে না, বিপন্ন অবস্থায় পারে।

১৬। তৃতীয় কর্ত্তব্য—সমাজস্থ ব্যক্তিগণের উন্নতিবিধান।

ইহাই আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। প্রথমেই স্মরণ রাখিতে হইবে, এই কর্ত্তব্য গুরুত্বে তৃতীয় স্থান অধিকার করে; সমাজরক্ষা ও সমাজস্থ ব্যক্তিগণের স্ব স্ব অধিকার রক্ষা ইহার অগ্রগামী কর্ত্তব্য; কারণ প্রথমোক্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে না পারিলে সামাজিকের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, অস্তিত্ব থাকাই সন্দেহ স্থল; আবার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য পালনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতির হেতু। অগ্রে আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা না হইলে, চোর ডাকাইতের উপদ্রব থাকিলে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর অত্যাচার করিবার সুযোগ থাকিলে, এক শ্রেণীর অন্য শ্রেণীর ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলে, সমগ্র সমাজের উন্নতি হইতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষের উন্নতি হইলেই যেমন সমাজের উন্নতি হইল-বলা যায় না; সেই ব্যক্তি, সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির অবনতি সাধন করিয়া নিজের উন্নতি করিলে যেমন সমাজের উন্নতি বলা

যায় না ; সেইরূপ শ্রেণীবিশেষের উন্নতিতেও সমগ্র সমাজের উন্নতি হয় না, উন্নতি স্থানান্তরিত হইতে পারে মাত্র ; যথা—"ক" শ্রেণীর উন্নতির কতকাংশ "খ" শ্রেণী টানিয়া লইলে, মোট উন্নতির সমষ্টি বৃদ্ধি হয় না। একমাত্র আপত্তির পথ উন্মুক্ত আছে ; "খ" বলিতে পারে যে, "ক" এর উন্নতির দশমাংশ লইয়া আমরা আমাদের উন্নতির দশগুণ বৃদ্ধি করিলাম, ইহাতে সমাজের উন্নতির মোট সমষ্টি বৃদ্ধি হইল না কি ? ঐ দশমাংশ না দিলে আমরা আমাদের এই প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারিতাম না।" উদাহরণ স্বরূপ, অন্যান্য শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণ সরবরাহ না করিলে, তাহারা নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টায় জীবন কাটাইতে বাধ্য হইলে, ভারতবর্ষে জ্ঞানের এই প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবার সুযোগ হইত না, ইহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। যখন সর্ব্ব-সমাজের প্রাথমিক অবস্থাতেই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, এক শ্রেণীর লোকের স্বোপার্জ্জিত ধনের একাংশ, অন্য শ্রেণী ছলে বলে কৌশলে হস্তগত করিয়াছে ; তখন এই তর্কের আংশিক যুক্তিযুক্ততা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বাস্তবিকই যতদিন না মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ আপাততআবশ্যকীয় খাদ্যাদি অপেক্ষা বেশী বস্তু সংগৃহীত না হইয়াছে, ততদিন শ্রেণ্যন্তর হইতে খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া জ্ঞানাদির চর্চ্চার অবকাশ সংঘটন না করিতে পারিলে জাতীয় উন্নতির সোপান প্রস্তুত হয় না। এই যুক্তিযুক্ততার মধ্য হইতেই পাওয়া যাইতেছে ; জাতির নিতান্ত দরিদ্র অবস্থাতেই সর্ব্বশ্রেণীর স্ব স্ব অধিকার-মূলক যে সাধারণ নিয়ম স্থাপন করা হইয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম করা যাইতে পারে ; এই ব্যতিক্রমের হেত্বন্তর নাই, কেহ দেখাইতেও পারেন না। এই যুক্তিযুক্ততার মধ্য হইতে আরও পাওয়া যাইতেছে : "খ" যেমন "ক"এর উপার্জ্জিত খাদ্যাদির অংশ গ্রহণ করিবেন, তেমনি উপযুক্তের অধিক মূল্য দিতে হইবে ; তবে স্বর্ণ রৌপ্য না হইয়া জ্ঞানময় মুদ্রা হইতে পারে ; সঙ্গীত, কবিতা, নাট্য, কারুকার্য্যাদি কলাবিদ্যার দ্বারা হইতে পারে ; মেকি টাকায় বা বিনামূল্যে লওয়া চলিবে না ; তাহা প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য অথবা দস্যুতা হইবে।

আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী।

দিলে চলিবে না।

(ক) অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতম্।
অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ॥

তন্ত্রসার ১ম পরিচ্ছেদ। ১৭।

দিলে চলিবে না। কংসের ঝঙ্কার ইহাতে স্পষ্ট শুনা যাইতেছে।

১৭। সামাজিকের উপকার জন্য সমাজ কি কি কার্য্য করিতে পারে।

ব্যক্তি মাত্রেরই কুপ্রবৃত্তি আছে; ইহা সমাজ রক্ষা বা ব্যক্ত্যন্তরের স্বার্থরক্ষার বিরোধী হইলে সমাজ অবশ্যই হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য। আর একস্থলেও হস্তক্ষেপ করিতে পারে: যখন ইহা ব্যক্তির নিজের স্বার্থের প্রতিকূল। এই মৌলিক তত্ত্বানুসারে, মাদকদ্রব্য ব্যবহার, দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি, নিষেধ করিতে পারে। এখন দেখা যাইতেছে, সামাজিকের যে পরিমাণে উন্নতি হইবে, এই ত্রিবিধ বিষয়ে সমাজের কার্য্য, সামাজিকের উপর হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা, সেই পরিমাণে কমিয়া যাইবে। হয়ত আর এক হাজার বৎসর পরে সমাজের শাসকরূপ মূর্ত্তি এককালীন তিরোহিত হইবে; থাকিবে কেবল চতুর্থ মূর্ত্তি। জাতি বা সমাজ তত্ত্বৎ সামাজিকের বৃহত্তম সমবায়। যে সমস্ত কার্য্য এই বৃহত্তম সমবায় ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহাই থাকিয়া যাইবে। ক্ষুদ্র সমবায়কে যৌথ-সমিতি (Joint-Stock Company) বলে। ইহা দ্বারা যে কার্য্য হইতে পারেনা, ভবিষ্যতে তাহাইমাত্র সমাজের কর্ত্তব্য থাকিবে। বর্ত্তমানে অনেক স্থলে রেলপথ, টেলিগ্রাফ, পত্রবাহন ইত্যাদি কার্য্য, আমাদের দেশে যৌথ-সমিতির সাধ্যাতীত বলিয়া ইহা রাজা বা সমাজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে। সমাজের মানসিক অবনতিই এই সমস্ত কার্য্য যৌথসমিতির সাধ্যাতীত করিতেছে। জাপানে অনেক নূতন নূতন শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত যৌথ-সমিতির সাধ্যায়ত্ত ছিল না; রাজশাসন সেই কার্য্যে অগ্রগামী হইয়া কলকারখানা স্থাপন করিয়া, প্রথমে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহা ক্রমে লাভবান করিয়া তুলিয়া, সমাজের এই চতুর্থ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে। কিন্তু যখনই লাভবান হইয়াছে, তখনই সেই কর্ত্তব্য ফুরাইয়াছে, তাহা

যৌথসমিতির হস্তে অর্পিত হইয়াছে। নিতান্ত আবশ্যক ব্যতীত রাজশাসন সমাজের উপর হস্তক্ষেপ করিলে যে কুফল হয়, তাহা ইউরোপীয় রাজনীতিশাস্ত্রে ও সর্ব্বদেশের ইতিহাসে বিশদরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে। শাসন মাত্রেই অবাঞ্ছনীয়; সামাজিকের স্বাধীনতাই বাঞ্ছনীয়; ঐ স্বাধীনতার উপর অযথা হস্তক্ষেপ কোন কালেই হিতকর হয় নাই; শাসন অপরিহার্য্য উৎপাৎ মাত্র (Necessary evil)। মিউনিসিপালিটীও আংশিক সমাজশাসন; সমাজের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত শক্তি রাজার ন্যায় ইহাতেও অর্পিত হইয়াছে। ইহার কর্ত্তব্য কতকটা বৃহৎ সমাজেরই ন্যায়। যে স্থলে, জলসরবরাহ যৌথসমিতির দ্বারা সম্ভব, সে স্থলে ইহা তাহার কর্ত্তব্য নহে; যে স্থলে সম্ভব নহে, সেই স্থলেই তাহা কর্ত্তব্য। শাসন মাত্রই যে অপরিহার্য্য উৎপাৎ, এই চতুর্থ কর্ত্তব্যও যে উন্নতি সহকারে উঠিয়া যাইতেছে, ইহাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে চতুর্থ কর্ত্তব্য, তাহা ছাড়াও শাসনসম্পর্কবিহীন যৌথকার্য্যকরী কর্ত্তব্য অসম্ভব নহে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হইতে শেষোক্ত চতুর্থ শ্রেণীর সামাজিক কর্ত্তব্যের একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রথম ত্রিবিধ শ্রেণীর কর্ত্তব্য প্রতিরোধক ((Coercive), চতুর্থ কর্ত্তব্য প্রতিপোষক (Co-operative)। বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে, উন্নতি সহকারে সমাজের প্রতিরোধক কর্ত্তব্য ক্রমশ কমিয়া যাইয়া কেবল মাত্র প্রতিপোষক কর্ত্তব্য থাকিয়া যায়। প্রতিরোধক শক্তির দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা নহে; শাসনদণ্ড প্রতিহার করিয়া যে কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

তৃতীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পুনরায় বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। মানুষ ইহকালের ক্ষণিক সুখের অনুসরণেই ব্যস্ত, পরকালের জন্য চিন্তা করে না; সমাজ পরকালের জন্য কার্য্য করাইতে বাধ্য করিতে পারে কি? পরকালের কার্য্য সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করা গিয়াছে। সমাজস্থ কোন ব্যক্তি যখন পরকালের অবস্থার সাক্ষাৎসন্ধান পায় নাই এবং পাইতে পারে না, তখন তাহার জন্য ব্যবস্থা হইতেই পারে না; তবে ইহাতে শ্রেণীবিশেষের উদরপূর্ত্তির উত্তম ব্যবস্থা

হইতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ত্তব্য ছাড়াইয়া যিনি তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিরোধক সামাজিকব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত, তাঁহাকে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এইরূপ ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে মানবজাতির সমগ্র ভবিষ্যতকে দৃষ্টির আয়ত্ত করিতে হইবে, অর্থাৎ ভগবান হইতে হইবে? কারণ তিনি অন্য ব্যক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে যাইতেছেন, তাহাদের ভাগ্যের বিধাতা হইতে যাইতেছেন, তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধির উপর নিজের বুদ্ধিকে স্থাপিত করিতে যাইতেছেন। কি সাহসে তিনি তাহা করিতে যান? মানবের ভবিষ্যতের কতটুকু অংশ তিনি দেখিতে সমর্থ? তাঁহার কৃত কার্য্য মানবসমাজের সুদীর্ঘ জীবনের উপর কিরূপ কার্য্যকর হইবে, তাহা কি তিনি ভাবিতেও পারেন? তিনি যাহা ভাল বলিয়া চালাইতে চাহেন, তাহা ভাল না হইতে পারে; যে বিদ্যাবুদ্ধি, সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া স্বজাতির উপর হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছেন, তাহা ভ্রমাত্মক হইতে পারে। আপত্তি হইবে: তবে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায়ই * বা এরূপ হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কোথা হইতে আইসে? তাহার উত্তর এই যে, উপযোগী জীবের পক্ষে জীবিত থাকা আবশ্যক, এই তত্ত্বকে মৌলিক তত্ত্ব বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। এই তত্ত্ব আর ইহা অপেক্ষা সহজবোধ্য তত্ত্বান্তর দ্বারা প্রমাণ করা যায় না; ইহাই সর্ব্বাগ্রগামী সহজবোধ্য তত্ত্ব। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ত্তব্যের উদ্দেশ্য হইতেছে এই জীবনরক্ষা। ভবিষ্যতের গর্ভে যতই অবরোহণ করা যাউক, মানবজাতি জীবিত থাকিবার আবশ্যকতা শীঘ্র চলিয়া যাইবে এরূপ নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। যখন যাইবে, তখনও সে কার্য্যে সহায়তা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত নাও হইতে পারে। কিন্তু আপাতত ধ্বংসের ব্যবস্থার জন্য ব্যগ্র না হইয়া অস্তিত্বের ব্যবস্থার জন্যই আমাদিগকে ব্যগ্র হইতে হইতেছে। আরও কথা. সমাজব্যবস্থাপক মনুষ্যসমাজেরই ব্যবস্থাপক। তাহা ছাড়াইয়া দেবত্বের পক্ষে ব্যবস্থা করিতে যাওয়া কিঞ্চিৎ বিপজ্জনক।

---

* ১৯৭ পাতা দ্রষ্টব্য।

যতদিন সমাজ বর্ত্তমান আছে, মানুষ বাঁচিয়া আছে, ততক্ষণ ব্যবস্থা সেই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

"মানবজাতি যে বর্ত্তমান আকারে জীবিত থাকিবার উপযুক্ত তাহার প্রমাণ কি?"

ইহার প্রমাণের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইবার আবশ্যকতা নাই; প্রমাণ নাও থাকিতে পারে। ইহার বিরুদ্ধেই প্রমাণের আবশ্যকতা। ব্যক্তি বিশেষের জীবনে বিরুদ্ধপ্রমাণ অনেক সময় আসিয়া পড়ে; একটা সমাজের জীবনে সেই প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং অস্তিত্বের আবশ্যকতার প্রমাণের জন্য ব্যস্ত না হইয়া তাহার বিরুদ্ধপ্রমাণের জন্যই অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহা না করিয়া সাধারণঅস্তিত্বের অনুপযোগী ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইলে তাহা অব্যবস্থা হইতে পারে। এইরূপ অব্যবস্থা, সামাজিক আত্মহত্যার ব্যবস্থাও, কিন্তু সমাজে গৃহীত হয়, ব্যবস্থাপককে তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

"সমাজের মঙ্গলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। সে মঙ্গল যেরূপে, যাহা দ্বারা সাধিত হউক তাহা মঙ্গলজনক হইলেই যথেষ্ট হইল, আর কিছুই দেখিবার আবশ্যক নাই। এক ব্যক্তি—রাজা বা বিজেতা, এক সম্প্রদায়—ব্রাহ্মণ বা শ্রমজীবী, সে যেই হউক, ছলে বলে কৌশলে যে উপায়েই হউক, সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে পারিলেই হইল। মঙ্গল সাধনের পন্থার কোন দোষ গুণ দেখিতে হইবে না; পন্থার দোষ গুণ নাই; পন্থা যাহাই হউক, মঙ্গল হইলেই তাহা সুপন্থা বলিতে হইবে।"

এই সমাজনৈতীকতত্ত্ব এত সহজ নহে। প্রথমে দেখিতে হইবে: ব্যক্তিগত মঙ্গল এবং সামাজিক মঙ্গল কাহাকে বলে। দ্বিতীয়ত: সেই মঙ্গল সাধনের পক্ষে সর্ব্বরূপ পন্থাই উপযোগী হইতে পারে কি না। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়কে মঙ্গল বলিবেন। কেহ বলিবেন আধ্যাত্মিকতা, কেহ বলিবেন পরকালের মঙ্গলই মঙ্গল, কেহ বলিবেন স্বার্থত্যাগ—পরের সেবাই মঙ্গল, কেহ বলিবেন সুখই মঙ্গল, আবার কেহ বলিবেন জীবনের বৃদ্ধিই মঙ্গল। এই সমস্ত মঙ্গলই এক ভাবের কথা নহে; ইহারা পরস্পর অল্পবিস্তর বিরোধী। অতএব

মঙ্গল কি তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করিবার উপায় নাই। যাহা আমি মঙ্গল বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা আমার বুদ্ধির উপযোগী মঙ্গল মাত্র—হয়ত প্রকৃত মঙ্গল নহে। যে অন্যরূপ মনে করিতেছে, সেই হয়ত প্রকৃত মঙ্গল স্থির করিতে পারিয়াছে। এখন আমার বুদ্ধির অনুযায়ী মঙ্গল, ছলে বলে কৌশলে সমাজের উপর প্রয়োগের আমার কি অধিকার আছে? তাহা যদি আমি করিতে যাই, সমাজ তাহাতে আপত্তি করিতে পারে না কি? ছলে বলে কৌশলে নিজের মত প্রচারের চেষ্টা হইল দ্বন্দ্বের ভাব। এক শ্রেণীর ভাবুক বলিবেন, জগতে দ্বন্দ্বই আছে, আর কিছুই নাই। আর একটা জিনিস আছে যাহা জীবনের অধিকতর উপযোগী—সাহচর্য্য। সমাজে দ্বন্দ্বের স্থলে সাহচর্য্য সংস্থাপনই সামাজিক উন্নতি। ছলবল-কৌশল সাহায্যে সমাজের মঙ্গল বিধানের দুইটী অন্তরায় আছে: ১ম। মানুষের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা; ২য়। মানুষের স্বার্থপরতা। স্বার্থপরতা আছে বলিয়া, সমাজ ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের বলপ্রকাশে বাধা জন্মাইতে বাধ্য। যদি কোন মানুষের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইত এবং তাহার স্বার্থপরতা না থাকিত, তবে সেই মানুষ ছলবলকৌশলের পন্থা অবলম্বন করিতে পারিত; তদভাবে এ পন্থা অবলম্বনীয় নহে।

আরও একটু দেখা যাইতেছে: মানুষের জ্ঞান যে বিষয়ে যে পরিমাণে আপেক্ষিক সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, সেই বিষয়ে সেই পরিমাণে বল প্রয়োগের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। মাদকদ্রব্য সেবনের খাতিরে নিজের দেহের অবনতি সাধন করা যে অনুচিত, মানুষের এ জ্ঞান প্রায় সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; এই শ্রেণীর কার্য্য হইতে বলপূর্ব্বক বিরত করিবার পক্ষে সামাজিক ব্যবস্থা স্থাপনের সময় আসিয়াছে। এই শ্রেণীর ব্যবস্থা হইল প্রতিরোধক ব্যবস্থা—"ইহা করিও না।" এখন বিচার্য্য বিষয় হইতেছে: প্রতিপোষক ব্যবস্থা, 'ইহা কর' এই ব্যবস্থা, বল প্রয়োগ দ্বারা স্থাপনের সুযোগ আছে কিনা। ইহারও সুযোগ আছে, যথা—'টীকা দাও।" অতএব প্রমাণ হইতেছে: মানুষের জ্ঞান যেখানে যে পরিমাণে সম্পূর্ণ, সেখানে সেই পরিমাণে বল প্রয়োগের স্থল আছে। যেখানে আদৌ সম্পূর্ণ নহে, সেখানে আদৌ বলপ্রয়োগের স্থান নাই।

যাহাদের জ্ঞানার্জ্জনী প্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, তাহারাই বলপ্রয়োগের ক্ষেত্র নির্দ্ধারণের উপযোগী; যাহাদের জ্ঞান যে পরিমাণে সংস্কার দ্বারা কলুষিত, তাহারা সেই পরিমাণে এ ক্ষেত্র নির্দ্ধারণের অনুপযোগী। মাদকদ্রব্য সেবনের খাতিরে নিজের দেহের অবনতি সাধন করা অনুচিত, এ জ্ঞান যেমন অনেকটা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; পরলোকের খাতিরে দেহের অবনতি সাধন করা উচিত, এ জ্ঞান কিন্তু সেরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। যদি কেহ বিশ্বাস করেন, এ জ্ঞান আরও সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং ইহার অনুকূলেও বল প্রয়োগ করা যাইতে পারে; তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একমাত্র সত্যই স্থায়ী বন্ধু; এ জ্ঞানের সত্যতা না থাকিলে এই ব্যবস্থা স্থায়ী হইবে না। সত্যতানির্দ্ধারণ বিশ্বাসের দ্বারা করা যায় না, জ্ঞানের দ্বারা করিতে হয়। যদি কেহ বলেন 'ইহা ত্রিকালজ্ঞ ঋষির জ্ঞান,' তাহাতে কুলাইবে না। স্থানান্তরে যেরূপ বলিয়াছি: ইহা ঋষির জ্ঞান হইতে পারে, আপনার পক্ষে বিশ্বাসমাত্র। যে ঋষিদের জ্ঞান, তাঁহারা এখন আর বল প্রয়োগ করিতেছেন না; আপনি বিশ্বাস মাত্র সম্বল করিয়া সেই বল প্রয়োগ বহাল রাখিতেছেন। তাহা করিবার অধিকার কাহারও নাই।

১৮। কয়েকটি সামাজিক প্রথার বিচার।

বাল্য-বিবাহ।

এখন আমরা প্রচলিত কয়েকটী সামাজিক ব্যবস্থার বিচার করিতে সমর্থ হইতেছি। আমার মতে—এ মত আমি কাহাকেও গ্রহণ করিতে বলি না—বহু সম্প্রদায় মধ্যে অপরিণত বয়সে সন্তান উৎপাদনই ভারতবর্ষের অবনতির প্রধান কারণ। বাল্যবিবাহ ইহার জন্য দায়ী। বলা যাইতে পারে যে, তাহা না হইলে জারজ সন্তানের বাহুল্য হইত। তাহার উত্তর এই যে, একটা জাতির মেরুদণ্ড জারজ সন্তান নহে। এই সামান্য বিপদপাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য মেরুদণ্ড ভগ্নের ব্যবস্থা যে করে, তাহাকে আর কি বলা যায়? আরও বলা যাইতে পারে, বেশী বয়সে বিবাহ হইলে ব্যভিচার বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ব্যভিচার অপেক্ষা

সমাজরক্ষা অধিকতর মূল্যবান। দুর্ব্বল সন্তান সমাজরক্ষাকার্য্যের পক্ষে সম্যক্ সমর্থ নহে ; অতএব অপরিণত বয়সে সন্তান উৎপাদনের সহায়ক ব্যবস্থা, উত্তম ব্যবস্থা নহে। এ সমস্ত কথা কেহ না জানেন তাহা নহে ; জানিয়াও সে প্রতিবাদ করেন, তাহার হেতু সংস্কার। সংস্কার প্রণোদিত প্রবৃত্তিকে নির্ম্মল জ্ঞানের দ্বারা সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন না, জ্ঞানকে সংস্কারমূলক প্রবৃত্তির সাহচর্য্যে নিযুক্ত করেন ; এই প্রবৃত্তির পোষকতা কিরূপে করা যায়, জ্ঞানরাজ্য মধ্যে তাহারই সন্ধান করিয়া বেড়ান। ব্যভিচার শতগুণ বৃদ্ধি পাইলেও দুর্ব্বলতা শতাংশের একাংশ বৃদ্ধি হইতে দেওয়া যাইতে পারে না। স্ত্রীর সতীত্বের অপেক্ষা স্বাধীনতার অভাব, স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে অধিক ক্লেশদায়ক। এখন, পরিণত বয়সের সংখ্যা কি ? সাধারণের তাহা বিচার্য্য নহে, বিজ্ঞানবিদের নিকট জানিতে হইবে। কিন্তু সাধারণের পক্ষে একটি উত্তম সুযোগ আছে : যখন একটা অপরিণত বয়স আছে, তখন বিবাহ, সন্তান উৎপাদনের বয়স অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে, যতদূর সম্ভব স্থগিত রাখাই নিরাপদ ; এবং তাহাই এ সম্বন্ধে বিজ্ঞতা। "হয়ত এরূপ পাত্র জুটিবে না" ইত্যাদি ব্যক্তিগত অবস্থা কোন সাধারণ প্রবন্ধেরই আলোচ্য বিষয় হইতে পারে না। স্থূল সিদ্ধান্ত এই হইতেছে : আত্মরক্ষারূপ সর্ব্বপ্রধান সামাজিক কর্ত্তব্য সম্যক্ পালন করিতে যদি প্রবৃত্তি থাকে, তবে উপরুক্ত নির্দ্দেশিত পন্থাই শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা করিবার ক্ষমতা না থাকিলে বা প্রবৃত্তি না থাকিলে, ব্যক্তিবিশেষ অবশ্যই অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন। নির্ম্মাতৃকী প্রবৃত্তিও সমাজে দুর্ব্বল, রুগ্ন ব্যক্তির বৃদ্ধির প্রতিকূল।

আর একটা কথা। পাশ্চাত্য শিক্ষার নিকট আমরা বিশেষ ঋণী ; সে ঋণ সর্ব্বথা স্বীকার করি, পরিশোধ করিতেও চেষ্টা করি। কিন্তু এই যে দরিদ্র পণপ্রথা, বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বমাত্র রক্ষাকল্পে আমরা ইহার নিকট যে কত ঋণী তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছি ? ভগবান করুন, যতদিন না আমাদের সুবুদ্ধি হয় ততদিন এই প্রথা বাঁচিয়া থাকুক, দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি হউক। এ রাক্ষসী অনেক খাইবে, অনেক স্নেহ-লতাকে ইহার মন্দিরে আত্মবলি দিতে হইবে, অনেক হৃদয়ের শোণিত

শুকাইবে, অনেক চক্ষুতে ধারা বহিবে; এই প্রবাহ না বহিলে সমাজের কলঙ্ক বিধৌত হইবে না, জাতীয় জীবন পুনরুজ্জীবিত হইবে না। যে ব্যবস্থাপকগণের ব্যবস্থার ফলে আজি বাঙ্গালার গৃহে গৃহে এই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, যাঁহারা এখন সুখে স্বচ্ছন্দে পরলোকে বসতি করিতেছেন, এ অগ্নিরাশি কি নিরপরাধ বালিকার দেহ ধ্বংস করিয়াই নির্ব্বাপিত হইবে? সেই ব্যবস্থাপকগণ যেখানেই থাকুন; তাঁহাদের হৃদয়ে এ অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে না কি?

বহু বিবাহ।

বহু বিবাহ সম্বন্ধে একটিমাত্র কথা বলিতে হইতেছে। যে যে দেশে এই প্রথা প্রচলিত আছে, তথায় রাজকীয় গৃহবিবাদ অত্যন্ত কঠোর হইতে দেখা যায়। ভারতবর্ষের ও ইউরোপের সমসাময়িক ইতিহাস পাঠ করিলে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। কত রাজবংশ এজন্য উৎসন্নে গিয়াছে, বিভীষণের ন্যায় কত গৃহশত্রু তাহাতে সহায়তা করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কত প্রদেশের, কত সমাজের বলবীর্য্য স্বাধীনতা নষ্ট হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে ব্যথিত হইতে হয়। শুভক্ষণে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল; ইহাদের জাতীয় উন্নতির ইহা একটা প্রধান কারণ। একই মাতার গর্ভজাত বহু ভ্রাতার মধ্যে যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগরূক হয়, বিভিন্ন মাতার গর্ভজাত ভ্রাতৃগণের মধ্যে কঠোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিয়া উঠে। একটি সমাজের ধ্বংসের, অবনতির, সমাজান্তরের দাসত্বের, ইহা একটি প্রধান কারণ।

চির বৈধব্য।

নিম্নলিখিত কারণে চিরবৈধব্যের ব্যবস্থা সমর্থন করা যাইতে পারে—

১। আধ্যাত্মিকতা।

২। আদর্শ বিবাহসম্বন্ধ সংস্থাপন।

৩। পরকালে উচ্চ অবস্থা সংস্থাপন।

৪। সেবা।

৫। কুমারী কন্যার বিবাহ সৌকর্য্য।

আধ্যাত্মিকতার বিষয় পূর্ব্বে যথেষ্ট বলা হইয়াছে, এখন আদর্শ বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

"স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ জীবিতকালমাত্র স্থায়ী, ইহা বিবাহের উচ্চ আদর্শ নহে। এ সম্বন্ধ দেহের নহে, আত্মার; এ সম্বন্ধ ক্ষণস্থায়ী নহে, চিরস্থায়ী।"

আত্মা কি? ইহার কি স্ত্রী পুত্র গৃহস্থালীর আবশ্যকতা থাকে? আত্মাকে কল্পনা করা ভিন্ন তাহার অনুরূপ জ্ঞান হইতে পারে না। এই কল্পনার উপাদান কোথা হইতে সংগৃহীত হয়? আত্মা, পরকাল, ইহকালেরই অনুরূপ, এমন কি ইহলোকের যে অংশ উৎকৃষ্ট তাহারও অনুরূপ, এরূপ কল্পনা শ্রেষ্ঠ কল্পনা নহে। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সম্বন্ধ নির্ণয় কি হিসাবে করা যাইতে পারে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পার্থিব হিসাবে, দৈহিক হিসাবেই তাহার অর্থ হয়; সে হিসাব বাদ দিলে তাহার অর্থ হয় না। উচ্চতর লোকবাসী শ্রেষ্ঠতর পদার্থনির্ম্মিত যে আত্মা, আমাদের হিসাবে তাহাকে গড়িয়া তুলিলে তাহা বালকের ক্রীড়ামাত্র হইয়া যায়। অজ্ঞেয়বাদ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, আমরা জ্ঞানলাভ করি দ্বিবিধ উপায়ে—লিখিয়া ও পুঁছিয়া। পরকাল সম্বন্ধেও পুঁছিয়াই জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, লিখিবার কোন বর্ণমালা পাওয়া যায় নাই। মন যে আঁচড় কাটিয়াছে, তাহা পুঁছিয়া ফেলিতে হইবে।

নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি বিশেষভাবে অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা দেখিতে হইবে এবং দার্শনিকতত্ত্ব নির্ণয়স্থলে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—

১। জগতের কতক অংশ ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে জ্ঞেয় হইতেছে। তাহাকে জ্ঞান বলে।

২। এই জ্ঞেয় অংশের কতকটা আমরা জানিয়াছি আর অনেকটা জানিতে পারি নাই, ভবিষ্যতে জানিবার সম্ভব আছে।

৩। পূর্ব্বে যে পর্য্যন্ত জানা হইয়াছিল, তাহাই জগতের পূর্ণ জ্ঞান মনে করিলে ভুল হইবে; কারণ, এখন আরও জানা গিয়াছে। পূর্ব্বকালে, বিদ্যুতের শক্তির বিষয় এখন যাহা জানা যাইতেছে, Latent heat, Capillary attraction ইত্যাদির জ্ঞান ছিল না। সুতরাং আমরা এখন যদি মনে করি, জ্ঞানের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছি, তাহা হইলে ভুল

করিব। এরূপ সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক আদৌ করিতে পারে না। নিত্যই, দণ্ডে দণ্ডে, নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে।

৪। ইহার ফলে মানুষের মনের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যজ্ঞান নিঃশেষে জানা হয় নাই এবং জানা হইতেও পারে না, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতেছে।

৫। এইরূপ মনের অবস্থার ক্রমগতি (momentum) এখানে থামিল না, আরও দূরে চলিয়া গেল। মানুষ মনে করিল, জগতে এমনও বিষয় থাকিতে পারে যাহা ইন্দ্রিয়াদির বহির্ভূত : মনকে অনন্ত, অজ্ঞেয়, অসীমের দিকে লইয়া গেল। এইরূপ মনের অবস্থাকেই পূর্ব্বে অনন্ত-মুখী প্রবৃত্তি বলা হইয়াছে।

৬। বালক যেমন নিজের মন সমস্ত বস্তুতে আরোপ করে, পুত্তলিকার সহিত বাক্যালাপ করিতে প্রয়াস পায়, নিজের স্বভাবের অতিরিক্ত কোন অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারে না ; আমরাও তাহা করিলে, সর্ব্বত্র মনুষ্যস্বভাবানুযায়ী (anthropomorphic) রূপ গুণের আরোপ করিলে, বালকের ন্যায়ই কার্য্য করিব।

৭। সেই অসীম, অনন্ত, অজ্ঞেয়ের পথে যাইয়া মন পাইয়াছে ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল। কিন্তু ইহার কাহাকেও যৎসামান্য ভাবেও জগতের বস্তুর রূপগুণান্বিত করিলে বালকের ক্রীড়া হইবে। ইহারা শুধু অজ্ঞাত নহে, অজ্ঞেয়।

পুনরায় সেই আত্মার কথা বলিতে হইতেছে। গার্হস্থ্য প্রবৃত্তি কি আমরা সঙ্গে লইয়া যাইব ? পরলোকে কি আবার স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধের আবশ্যকতা থাকিবে ? যদি থাকে, তবে তাহার প্রমাণ কোথায় ? বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করা উচিৎ নহে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আরও কথা এই যে, এই ব্যবস্থার বৈবাহিক আদর্শ যেমন উচ্চ বলিয়া মনে হয়, তেমন পরকালের আত্মার আদর্শ অসম্ভব নীচু হইয়া যায়।

আদর্শ স্বামীস্ত্রী না হইলে সমাজ জোর করিয়া চিরস্থায়ী আদর্শ বৈবাহিকসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না, করা উচিতও নহে। যে স্বামী

ভক্তি ভালবাসার অযোগ্য তাহাকে পূজা করিতে বাধ্য করা সমাজের মঙ্গলজনক নহে ; ইহাতে অযোগ্যতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। স্বার্থত্যাগ করিয়া সর্ব্বথা অযোগ্যতার প্রশ্রয় দিলে সমাজের মঙ্গল হয় না। অবস্থানুসারে কতক অংশ স্বার্থত্যাগ সমাজের মঙ্গলজনক হইলেও, জোর করিয়া কাহাকেও তাহাতে ব্রতী করাইতে সমাজের অধিকার নাই ; সমাজ এরূপ অধিকার পরিচালন করিলে সমাজেরই দূরাগত ভবিষ্যঅমঙ্গলের ভিত্তি সংস্থাপন করা হয়। স্বামীর আত্মা যদি তাহার গার্হস্থ্য স্বভাব সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে, তবে অযোগ্যতাও সঙ্গে লইয়া যাইবার বাধা নাই। তাহা যদি লইয়া যায়, তবে বিধবাকে আজীবন মৃত স্বামীর পূজা করিতে বাধ্য করিলে অযোগ্যতার চিরন্তন প্রশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। যদি বলা যায়, পরলোকে সদ্‌গুণই সঙ্গে যাইবে, অসদ্‌গুণ পড়িয়া থাকিবে ; তাহাতেও গোল আছে। সদ্‌গুণ বলিতে গেলে উচ্চতম সদ্‌গুণই বুঝায় ; কারণ, যাহা তাহা নহে তাহা আংশিক অযোগ্যতা। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ বাদ দিলে বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রেমমাত্র। ব্যক্তিবিশেষে সেই প্রেম সীমাবদ্ধ কেন হইবে ? ইন্দ্রিয়াদি যে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া যাইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা হইলে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম, পরলোকে তাহা সঙ্কীর্ণ না হইয়া ব্যাপক হইবার বাধা কি ? কাজেই বলিতে হয়, এ স্থলের ভালমন্দ সে স্থলে খাটিবে না। পরলোকের খাতিরে মৃত স্বামীকে বিশেষভাবে পূজা করিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না, কেবলমাত্র ইহলোকের খাতিরে সে আবশ্যকতা থাকিতে পারে। পরলোকের খাতিরে স্বামীস্ত্রীসম্বন্ধ পুনসংস্থাপনের জন্য একান্ত লালায়িত হইবার আবশ্যকতা দেখা যায় না, মাত্র ইহলোকের খাতিরে সে আবশ্যকতা আছে কিনা, তাহাই স্থির করিতে হইবে।

যদিও এই সম্বন্ধ পুনসংস্থাপন বিশেষ সৎকার্য্য হয়, তাহা হইলেও সমাজ হস্তক্ষেপ করিয়া ইহার ফললাভের বাধা জন্মাইতেছে বই সাহায্য করিতেছে না। উচ্চ সৎকার্য্য কাহাকে বলে ? ১ম। আমার কার্য্য আমার পক্ষে সৎ হইতে গেলে আমার স্বাধীনপ্রবৃত্তিপ্রণোদিত কার্য্য হওয়া উচিত। ২য়। অনুরূপ কার্য্য করিবার আমার সুযোগ থাকা

আবশ্যক; প্রেয় কার্য্য ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া শ্রেয় কার্য্য করিবার সুযোগ থাকা আবশ্যক। তবেই ইহা আমার সৎকার্য্য হয়, অন্যথায় আমার উচ্চ সৎকার্য্য হয় না; অন্যের—হয়ত ব্যবস্থাপকের—সৎকার্য্য হইতে পারে। তাহা হইলে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের ফলে সেই ব্যবস্থাপক বিধবার স্বামীর সহিত যুক্ত হইবেন, বিধবা স্বয়ং যুক্ত হইবে না। যে সমাজে চিরবৈধব্যই একমাত্র অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থা, সেখানে স্বপ্রণোদিত প্রবৃত্তির স্থল কোথায়? আর প্রেয়কে ছাড়িয়া শ্রেয় অবলম্বনের সুযোগই বা কোথায়? কেবলমাত্র সমাজশাসনের মূলে যে সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহার অধিকাংশ ফল সমাজ ভোগ করিতে পারে; যে সে কার্য্য করে, অতি অল্পই তাহার ভোগে আইসে; কারণ ইহাতে তাহার গুণাগুণ সামান্য। যদিও ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিয়া অন্যরূপ আচরণ করিবার পথ বিধবার পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ নহে, তথাচ সামাজিক নিন্দার ভয়ে তাহা আংশিকরূপে রুদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং এরূপ ব্রহ্মচর্য্যের ফল বিধবা পাইলেও আংশিক ফলমাত্র পাইতে পারে। স্মরণ রাখিতে হইবে, উন্নত সমাজে লোকনিন্দাভয় ভোগাদির প্রবৃত্তি অপেক্ষা বিশেষ বলবান।

"পরকালের কথা নাই হইল, ইহকালের কথাই হউক। এক শ্রেণীর লোক সমাজের সেবার জন্য থাকিলে ক্ষতি কি? সংসার লইয়া, আপনাকে লইয়া, পুত্র কলত্র লইয়া, অধিকাংশ লোকই তো ব্যস্ত রহিয়াছে; ইহাদের সেবা কে করিবে? নিজের কার্য্য তো সকলেই করিতেছে; পরের জন্য জীবন উৎসর্গ কে করিবে? স্বার্থের জন্য জীবন অতিবাহন অপেক্ষা পরার্থের জন্য জীবন উৎসর্গ কি উচ্চতর, মহত্তর কার্য্য নহে? একটি বিধবা সংসারে একটী মূর্ত্তিমতী দেবীপ্রতিমা; যে সংসারে ইহার একটি রহিয়াছে, সে সংসারে কতই সাহায্য হইতেছে! একজন আত্মস্বার্থ বলি দিয়া অপর পাঁচ জনার কতই সুখবৃদ্ধি করিতেছে! আর স্বার্থ বলিই কি? পরের সেবা কি সুখের কার্য্য নহে? ইহাতে কি উচ্চতর তৃপ্তি নাই? তবে বিধবাকে নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন কেন মনে করিব? তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য কেন ব্যস্ত হইব?"

যদি তাহাই হয়, এরূপ দেবীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা যদি সমাজের মঙ্গলজনক

হয়, তবে এই শ্রেণীর দেবদেবী সমাজে বৃদ্ধি করা হয় না কেন? হতভাগ্য বিধবার জন্যই এই সেবাব্রত ব্যবস্থিত হয় কেন? স্বামী বিয়োগই সংসারে একমাত্র দুর্দ্দৈব নহে, একমাত্র অপায় নহে; স্ত্রী বিয়োগ আছে, পুত্রকন্যা বিয়োগ আছে। সমাজ এই সমস্ত অপায়ের সদ্ব্যবহার করিয়া সমাজে সেবাব্রতের সংখ্যা বৃদ্ধি করে না কেন? আর একটি স্থল আছে, যেখানে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত উপযোগী—গুরু পুরোহিত যজমানের বিয়োগে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে না কেন?

পরের সেবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া আবশ্যক। সমাজ হাত পা বাঁধিয়া কাহাকেও এই কার্য্যে নিয়োগ করিলে তাহাতে যে সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না, প্রীতিবাদে তাহা বিস্তারিত আলোচনা করা গিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষ বলপূর্ব্বক কাহাকেও আত্মপরিচর্য্যায় নিয়োগ করিলে যেমন সমাজের ক্ষতি ভিন্ন বৃদ্ধি হয় না, তেমন সমাজ বলপূর্ব্বক শ্রেণীবিশেষকে তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলে সমাজের ক্ষতি ভিন্ন বৃদ্ধি হয় না। বিধবা কাহার সেবা করে? ব্যক্তিগণেরই সেবা করে। বিনামূল্যে বা অপর্য্যাপ্ত মূল্যে ঐ ব্যক্তিগণের কাহারও পরিচর্য্যা গ্রহণ করিবার কি অধিকার আছে? বিধবা যেন তাহার সেবা সমাজের অন্যান্য শ্রেণীকে অর্পণ করিল; তাহাদের সেই সেবা গ্রহণ করিবার অধিকার কোথায়? এই সেবাতে অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পায় মাত্র। যেমন বিধবার স্বার্থ ত্যাগ হয়, তেমন সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থ-পরতা বৃদ্ধি হয়; তাহারা যে এই সেবা লইবার অধিকারী নহে, এ ধারণা ক্রমশ তিরোহিত হইয়া যায়। প্রীতির বিনিময়ে এই সেবা লইবার অধিকার আছে, একথা বলিলে যথেষ্ট হয় না। প্রীতি শাঁকের করাত, উভয়ত কাটে। প্রীতির বিনিময়ে প্রীতি, সেবার বিনিময়ে সেবা অর্পণ করিলেই যথেষ্ঠ হয়; সেবার বিনিময়ে প্রীতি অর্পণ করিলে যথেষ্ট হয় না। রক্তমাংসের দেহ থাকিতে কেহ এই সেবা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে পারে না; এই হতভাগ্য শ্রেণীকে সেবা অর্পণ করিতেই প্রবৃত্ত হয়। যাহারা নিতান্ত স্বার্থান্ধ, সংস্কার যাহাদের হৃদয়কে নিতান্ত হীন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারাই পারে। কিন্তু তাহারা সেবার নিতান্তই অযোগ্য। বলপূর্ব্বক

সেবায় নিযুক্ত করিলে যদি সমাজের কল্যাণ হইত, তবে দাসত্বপ্রথা উঠিয়া গেল কেন? ইহাতে সমাজের হিত হইল না কেন? প্রথম কারণ: দাসগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে যে পরিমাণ কার্য্য করিত, বাধ্য হইয়া কার্য্য করিতে হইয়াছে বলিয়া তাহা করে নাই; মোটের উপর সমাজের কার্য্য কম হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ: প্রভুসম্প্রদায় নিজেরা যে পরিমাণে কার্য্য করিতে পারিত, তাহা না করিয়া দাসের উপর নির্ভর করিয়া আলস্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছে; তাহাতেও সমাজের কার্য্য যতটা হইতে পারিত তাহা অপেক্ষা কম হইয়াছে। বিধবা সম্বন্ধেও একই অবস্থা হইতেছে। মূল কথা: নিজের চেষ্টা, উদ্যম, পরিশ্রম ভিন্ন, পরের উপর নির্ভর করিয়া ব্যক্তি বা সমাজ কেহই উন্নত হয় না। কেহ যদি এরূপ সামাজিক ব্যবস্থার প্রস্তাব করে যে, মঘা নক্ষত্রে যাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারা সকলেই ৺রামকৃষ্ণ সেবাসমিতি ভুক্ত হইবে, তাহা হইলে আমরা হাঁসিব। কিন্তু বিধবার বেলায় আমাদের হাঁসি আইসে না। মঘা নক্ষত্রে জন্ম যেমন কাহারও আয়ত্তাধীন নহে, স্বামী বিয়োগেও তাহাই। ইয়োরোপীয় পরিব্রাজক বার্ণিয়ার বলিয়াছেন যে স্ত্রীগণ স্বামীকে বিষপ্রয়োগ দ্বারা হত্যা না করে, তজ্জন্যই হিন্দুরা সহমরণ প্রথা সৃষ্টি করিয়াছে। স্বামীসম্প্রদায়ের মরণ কি স্ত্রীগণ কর্তৃক সাধিত হয়?

প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ঈশ্বরাভিমুখী প্রবৃত্তির সাধনা যে কি কঠিন কার্য্য, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যে বিধবা তাহাতে সমর্থ এবং বিশ্বাস-সম্পন্ন, সে আপনা হইতেই তাহা অবলম্বন করিবে; আর যে তাহা নহে, যে বাস্তবের পরিবর্ত্তে কল্পনার অনুসরণ করিতে ব্যস্ত নহে, সমাজ-শাসন তাহাকে তাহার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে না, নিষ্ফল ক্রিয়াকাণ্ডের আচরণে জীবনাতিপাত করিতে বাধ্য করিতে পারে মাত্র।

আমাদের দেশে আরও অনেক প্রকার সামাজিক কুপ্রথা প্রচলিত আছে, যথা—অযোগ্য পাত্রে দান, সমাজবিহিত ক্রিয়াকাণ্ডে অযথা অর্থব্যয় ইত্যাদি। ইয়োরোপীয় সমাজে অনেক কুপ্রথা আছে, যথা—সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির অল্পসংখ্যক ব্যক্তির উপর অত্যাচার—

Socialism, Bolshevism ইত্যাদি; তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিবার স্থান নাই এবং আবশ্যকতাও বিশেষ নাই। যে সমস্ত মূলতত্ত্ব প্রদর্শিত হইল, তাহার সাহায্যে অনায়াসেই এই সমস্ত প্রথার যথাযথ বিচার করা যাইতে পারে।

১৩। ঈশ্বরাদিতে বিশ্বাসজনিত তৃপ্তির বিচার।

"যদি পরকাল অজ্ঞেয় হইল, ঈশ্বর অজ্ঞেয় হইলেন; তাহা হইলে আশার স্থল, আশ্রয়ের স্থল, কোথায় রহিল? চরম সান্ত্বনার স্থল কোথায় রহিল? এ জগত নশ্বর, এ জীবন ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু এই যে মন, ইহার কোন স্থলে অবিনাশী আত্মা, চিরস্থায়ী সত্তা, অনন্ত সুখশান্তি-তৃপ্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে যে বিশ্বাস লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাই তো এ ক্ষণস্থায়ী জীবনান্ধকারের মধ্যে একমাত্র ধ্রুব আলোকরশ্মি। তাহার অভাবে এ জীবন যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, ভবিষ্যৎ সে একান্তই তমসাচ্ছন্ন। এ আলোক হইতে বঞ্চিত হইলে, জীবনসংগ্রামে যে অত্যন্ত ব্যথিত, অত্যাচারে যে অযথা নিপীড়িত, নিরাশায় যে অত্যন্ত জড়ীভূত, তাহার আর শান্তি কোথায়? মৃত্যু যাহার শিয়রে বসিয়া অজানিত প্রদেশে লইয়া যাইবার জন্য অঙ্গুলি সঙ্কেত করিতেছে, তাহার অবলম্বন কোথায়? যে ব্যক্তি মৃত্যুমুখনিপতিত, জড়বাদী তাহাকে কি প্রবোধ দিতে পারে জানিতে চাই। এই প্রবোধের আবশ্যকতা একদিন তাহারও হইবে; তখন তাহাকেও সেই গঙ্গানারায়ণ, হরি হরি বলিতে হইবে। তখন আগে হইতে ইহা অভ্যাস করিয়া রাখিলে ভাল হয় না কি?

কথা নিতান্ত ঠিক। যে নিজের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, জীবনসংগ্রামের মধ্যস্থলে বা শেষ সময়ে যাহাকে আশ্রয়ের জন্য লালায়িত হইতে হয়, জড়বাদ তাহার উপযোগী নহে। জগতের কার্য্যকরণী শক্তি সাহায্য করিতে না পারিলে, তখন আর উপায় কি? জগতের বাহিরে যাইতে হইবে; ঔষধে না ধরিলে পাদোদক খাইতেই হইবে। সে কথা হইতেছে না, কোন ফল লাভ হইবে কিনা তাহাই বিচার্য্য। তাহা যদি না হয়, তবে এই বিশ্বাস আত্মপ্রতারণা মাত্র। তাহা যিনি করিতে প্রস্তুত, প্রজ্ঞাকে ছলনা করিয়াও যিনি আশ্রয়

প্রার্থী, জড়বাদ তাঁহার জন্য নহে। বাস্তবিক, জড়বাদ স্বাবলম্বন ভিন্ন অন্য কোন অবলম্বন গ্রহণের পক্ষপাতী নহে, এবং ঐ গ্রহণেচ্ছা যে উচ্চতর মানসিক অবস্থা তাহাও স্বীকার করে না। সত্তা মাত্রেই অবিনাশী ইহাতো বিজ্ঞানেরই কথা; মৃত্যুকালে তাহাতেই তৃপ্ত থাকিতে হইবে। তবে সারা জীবন ধরিয়া দৈহিক ও মানসিক যে আবর্জ্জনা সংগ্রহ করা গিয়াছে, যাহাকে প্রবৃত্তি, তৃপ্তি, আশাভরসা, মুমুক্ষা, এমন কি সেই সালোক্য সামীপ্য সাযুজ্য ইত্যাদির কামনা—কিছুই সঙ্গে লইয়া যাওয়া যাইবে না, সমস্তই ইহাদের জন্মক্ষেত্রে রাখিয়া যাইতে হইবে। এ সমস্তই পার্থিবজীবন নির্ব্বাহের অল্পবিস্তর সহায়ক, সেই জীবনের সহিতই ইহাদের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইবে। মৃত্যুর পরের যে অবস্থা বা অনবস্থা, তাহার জ্ঞান হইতে পারে না, কল্পনাও হইতে পারে না; কারণ, উপাদানের অভাব। জ্যামিতিক কবি বলিতে পারে না যে, জীবিতাবস্থা অতিক্রম করিলেই যখন পরবর্ত্তী অবস্থাতে প্রবেশ করিতে হইবে, উভয় অবস্থার মধ্যস্থলে যখন কোন ব্যবধান থাকিতে পারে না,

চিত্রিত গোলকদ্বয়ের ন্যায় উভয় অবস্থা যখন পরস্পর যুক্ত রহিয়াছে, তখন পরকালের জ্ঞান কেন হইতে পারে না? পারিবে না তাহার কারণ: যেমন যুক্ত রহিয়াছে সত্য, তেমন উভয় গোলক একই ভূমি খণ্ডকে বেষ্টন করিতেছে না, পরস্পরকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে, (Mutually exclusive) ইহাও সত্য। পরকালের কোন বিষয় ইহকালের জ্ঞানগোলকের মধ্যে আসিতে পারে না। কবিকে সান্ত্বনা করিবার জন্ত বলা যাইতে পারে: ইহকাল ও পরকাল উভয় অবস্থা যখন পরস্পর স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, তখন তাহার সেই স্পর্শজনিত যে অনুভব (?) তাহার ভাবে বিভোর হইয়া বলা যাইতে পারে যে, পরকালের

অবস্থা ধর্ম্মগ্রন্থাবলীতে বর্ণিত অবস্থাসমূহকেও অতিক্রম করিয়া যাইবে, এইরূপ কল্পনা ও মৃত্যুকালে তজ্জনিত চিত্তপ্রসাদ জড়বাদীর পক্ষেও নিষিদ্ধ নহে। বাস্তবিক, জড়বাদীর পক্ষে জীবনে বা মরণে কাল্পনিক কোন তৃপ্তি ব্যবস্থিত নহে, জীবনের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহারই ব্যবস্থা; তাহাতেই জীবনে মরণে তাহার তৃপ্তি। আত্মনির্ভরই তাহার একমাত্র নির্ভরস্থল, সে অন্যের উপর, এমন কি দেবতা বা ঈশ্বরের উপরেও নির্ভর করে না। বেদান্তবাদীর পক্ষে এইভাব নিশ্চয়ই গ্রহণীয় হইবে। চার্ব্বাক হইতে জড়বাদীর পার্থক্য এই যে, সে জড়কে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন মনে করে। সে শক্তির সামান্য অংশই আমাদের জ্ঞেয়, অন্য অংশ জ্ঞেয় নহে, জ্ঞেয় হইতেই পারে না এবং বর্ত্তমান অবস্থায় হইবার আবশ্যকতাও নাই। অবস্থান্তরে জ্ঞেয় হইতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর এই যে, জ্ঞেয় অজ্ঞেয় এই সমস্ত শব্দের অনুরূপ মনোভাব ইহকালেরই উপযোগী; পরকালে ইহার উপযোগিতা আছে কিনা, পরকালের অবস্থা যে কি, তাহা কিছুই জানিবার উপায় নাই। ধর্ম্মপুস্তকাদির সংস্পর্শে বর্দ্ধিত হইয়া আমরা সেই অবস্থান্তরের অজ্ঞেয়ত্ব সঠিক কল্পনা করিতে পারি না; তাহার সহিত জ্ঞেয় বিষয়ের অবৈধ সংমিশ্রণ করিয়া ফেলি। বহুদিন হইতে এইরূপ মিশ্রিত অবস্থান্তরের ভাব আমাদের অন্তঃকরণে এরূপ দৃঢ়নিবদ্ধ, সেই মিশ্রিত অবস্থা লাভ করিবার জন্য আগ্রহ এতই প্রবল, যে সেই মিশ্রিত বস্তুর অভাব সম্ভাবনাতে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ি; এটা মনে করিনা, যাহা অবিমিশ্র অজ্ঞেয় তাহা হয়ত নিতান্ত নিকৃষ্ট না হইতে পারে। অজ্ঞেয়বাদে চিত্তের তৃপ্তি হইতে পারে না, ইহা সংস্কারমূলক ভ্রান্তিমাত্র। ইহার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে এ পর্য্যন্ত যে মিশ্রিত জ্ঞেয়পদ স্থাপনা করা হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে বিশ্লেষ করিয়া দেখিতে গেলে, সেই মিশ্রিত অংশ বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইয়া বিশুদ্ধ অজ্ঞেয়ত্বই থাকিয়া যায়। ইহাতে যে তৃপ্তির অভাব, তাহা বহুকাল প্রচলিত সংস্কারবশতঃ। এই সংস্কারের অসারত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে, অজ্ঞেয়বাদ হইতেই আবশ্যকীয় তৃপ্তি পাইবার বাধা দেখা যায় না। যদি কল্পনার দিকেই যাইতে হয়, রহস্যের দিকেই যাইতে হয়, তবে

যাহা অবিমিশ্র অজ্ঞেয়, যাহা নিবিড় রহস্য, তাহাই কল্পনার শীর্ষস্থানীয়। যাহা আংশিক বাস্তব তাহা ত নিম্নশ্রেণীর কল্পনা; যাহার সহিত বাস্তবের সংস্রব নাই, তাহাই চরম কল্পনা। বাস্তব হইতে তৃপ্তির অভাব জন্য কল্পনার প্রয়োজনীয়তা; বাস্তবে সন্তুষ্ট থাকিয়া মানুষ দৌড়াইতে নিরস্ত না হয়, এই জন্যই কল্পনার আবশ্যকতা। ইহা অবশ্য জ্ঞেয় দৈহিক প্রয়োজনীয়তা নহে। সে প্রয়োজনীয়তা ফুরাইলেও দৌড়াইতে হইবে, অজ্ঞেয় প্রয়োজনীয়তার উদ্দেশে ধাবমান হইতে হইবে, তজ্জন্যই এই কল্পনার আবশ্যকতা; বাস্তবের সংস্পর্শবিরহিত বিশুদ্ধকল্পনাতেই এই প্রয়োজনীয়তার সার্থকতা। এই প্রয়োজনীয়তা কাহার?—কল্পনার। কেন এই প্রয়োজনীতা?—জীব গতিশীল থাকিবে এইজন্য। কেন গতিশীল থাকিবে?—স্থিতিশীলতা অপেক্ষা ইহা কল্পনার অধিকতর প্রিয় অবস্থা। জীবনের যথা সম্ভব সদ্ব্যবহার কাহাকে বলে তাহা পুনরায় বলা যাইতেছে। আমাদের কর্ত্তব্য দ্বিবিধ—ব্যক্তিগত ও সামাজিক; এরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে যে ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক জীবনে ভবিষ্যতে অনুতাপের সম্ভাবনা যতদূর সম্ভব বিদূরিত হয়; যে তাহা যে পরিমাণে সম্পন্ন করিতে পারিবে, জীবনে-মরণে তাহার সেই পরিমাণে তৃপ্তি; যে তাহা পারে নাই, সে যে পরিমাণে পারে নাই, সেই পরিমাণে তাহার অনুশোচনা অপরিহার্য্য। গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া বা হরিনাম জপ করিতে করিতে মরিলে, অথবা ইহা অপেক্ষা আধুনিক কোনরূপ প্রক্রিয়া করিলে, স্বকৃত দুষ্কার্য্য বা অকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, এরূপ ধারণা মোটের উপর চিরকালই সমাজের অমঙ্গলজনক, দুষ্কার্য্যের প্রশ্রয়দায়ক। প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা মাত্রেই এইরূপ। ধর্ম্মবিশ্বাসের এই শাখা হইতে সমাজের বিশেষ অমঙ্গল হইয়াছে এবং যাজকের উদরপূর্ত্তি হইয়াছে মাত্র। একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে অনুতাপ; তাহা হইতে নিষ্কৃতির ব্যবস্থা সমাজের কল্যাণজনক নহে।

যে প্রবৃত্তিমার্গ প্রদর্শিত হইল, আবহমান কাল জীব তাহার অনুসরণ করিয়া আসিতেছে এবং করিবে; যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল—পরকালের জন্য কর্ম্ম করিতে হয়, দেবতা বা দেবত্বের জন্য কর্ম্ম করিতে হয় এবং

তাহা পরিত্যাগ কর্ত্তব্য, এরূপ বিশ্বাসবান ব্যক্তির পক্ষে যে স্থলে বা বিবাহে তাহার কোনরূপ সন্দেহ রহিয়াছে সে স্থলেও—এই পথ অবলম্বনীয়; কারণ, পরে এই বিশ্বাস হারাইয়া অনুতাপ করিতে না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে যে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, সামাজিককর্ত্তব্য পালনের সময়ে বিশেষ সতর্ক করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ভ্রান্তবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের সমাজ যথেষ্ট পরিহার্য্য দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, ভবিষ্যতে তাহার লাঘব হয় ইহাই প্রার্থনীয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জ্ঞান কাহাকে বলে?

১। মনের ক্রিয়া বহুবিধ, তাহার বিশ্লেষ আবশ্যক।

"এই প্রবন্ধের সত্যতা জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিতেছে। একাধিক বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া আমাদের অন্তঃকরণে যে একাধিক আঘাত করে, পরস্পর তুলনাদ্বারা তাহাদের সাদৃশ্য ও বৈষম্য উপলব্ধির নামই জ্ঞান; ইহা ভিন্ন আর জ্ঞান নাই, ইন্দ্রিয়সংস্পর্শ-বিহীন কোন জ্ঞান থাকিতে পারে না, এই কথাই বলা হইতেছে। ইন্দ্রিয়াধিগম্য জগতের আকাশ, কাল পরমাণু, অনন্ত ইত্যাদির জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? ইহার কোনটাই তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। তবে ত জ্ঞানের অন্য উপায় আছে! ইন্দ্রিয়কে বাদ দিয়া মনের স্বাধীন জ্ঞান আছে, মনের সহজ জ্ঞান আছে। ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল, সেই জ্ঞানের বিষয়। সেই জ্ঞানের দ্বারা দেখিলে মানুষের কর্ত্তব্য অন্যরূপ দেখাইবে।"

মনের ক্রিয়া এক একটী করিয়া আলোচনা করা যাউক। এই ক্রিয়া পর্য্যায়ক্রমে—

১। অনুভূতি (Sensation)।

২। সুখদুঃখের বিশেষ অনুভূতি।

৩। স্মৃতি (Memory)।

৪। প্রবৃত্তি (Desire)।

৫। ইচ্ছা (will)।

৬। জ্ঞান (Perception)।

৭। চিন্তা।

৮। অনুভূত পদার্থের স্বাধীন সমাবেশ।

৯। গণিত ও ন্যায়দর্শনের জ্ঞান।

১০। আকাশ ও কালের জ্ঞান।

১১। পরমাণুর জ্ঞান।

১২। অনন্তের জ্ঞান।

১৩। পরকাল, আত্মা ও ঈশ্বরের জ্ঞান।

একটি তালিকা পাওয়া গেল, আলোচনা ফুরাইল কি? এতৎসম্বন্ধীয় আলোচনা চরম মীমাংসাতে উপস্থিত হয় নাই; এই তালিকা পাইয়াই মনের কার্য্য ফুরায় নাই। যদি না ফুরাইয়া থাকে, তবে মন আর কি চাহে এবং কেন চাহে? মন বুঝিতে চাহে, জানিতে চাহে। ইহাই জ্ঞানার্জ্জনী প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি মানুষের অতিশয় প্রবল; নিম্নশ্রেণীর জীবের, এমন কি নিম্নশ্রেণীর মানুষেরও এই প্রবৃত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাহাদের কৌতূহলের অভাব, কল্পনার অভাব; তাহারা যাহা পাইয়াছে তাহাতেই প্রায় তৃপ্ত। উচ্চশ্রেণীর মানুষের এই তৃপ্তির অভাব; কারণ, তাহার কৌতূহল ও কল্পনা বর্ত্তমান অবস্থায় থাকিয়াই চরিতার্থতা লাভ করে না; অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষভাবে লালায়িত থাকে। এই জন্যই মনের ক্রিয়ার একটি তালিকা পাইয়াই এই শ্রেণীর লোকের মন চরিতার্থতা লাভ করে না; ঐ তালিকার ভিতরে সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করিতে চাহে; তালিকা পাইয়া যে উন্নতি লাভ হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষ করিয়া বুঝিয়া আরও উন্নতি লাভ করা যায় কিনা দেখিতে চাহে। মনের এই অবস্থাকেই বৈজ্ঞানিক ভাব বলে। পক্ব ফল একটা মাটিতে পড়িল, মূর্খ তাহা কবলিত করিয়াই চরিতার্থ হইল। এই ঘটনা আর বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে না; এই ঘটনা যে আরও বিশ্লেষ করিয়া বুঝা যাইতে পারে, তাহা তাহার কল্পনায় যোগায় না। অপর পক্ষে, বৈজ্ঞানিক, জীবনের যতদূর সম্ভব স্ফুরণ চাহে। এই স্ফুরণ বা উন্নতির একমাত্র উপায়, বাহ্যবস্তু ও মনকে ভাল করিয়া জানা। ইহারা অত্যন্ত জটিল, অর্থাৎ বহু এবং বিভিন্ন উপাদানগঠিত। ভাল করিয়া জানা অর্থে, এই উপাদানের বিশ্লেষ করা, উপাদানসমূহের সংখ্যা করা। সংখ্যা করা সামষ্টিক বিশ্লেষ; অতএব ভাল করিয়া জানা অর্থে, একমাত্র বিশ্লেষ করিয়া জানা বলা যাইতে পারে। ফল পাকিলে শাখা হইতে মাটিতে

পতিত হয়, নিতান্ত শিশুর এ জ্ঞান নাই। দুরধিগম্যশাখাবিহারী ফলকে যে নিজ জীবনের সহায়তায় নিয়োগ করা যাইতে পারে, তাহা সে জানে না, কল্পনাও করে না। ক্রমান্বয়ে অভিজ্ঞতার দ্বারা, পক্ক ফল মাটিতে পড়িয়া অনায়াসলভ্য হয় দেখিয়া, এ জ্ঞান তাহার জন্মে। সাধারণ লোক তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিল এবং এখনও রহিয়াছে, কারণানুসন্ধানপথে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে চাহে না; অগ্রসর যে হওয়া যায় তাহাও জানে না। আবার যখন কোন বৈজ্ঞানিক ইহারও কারণ অনুসন্ধান, এই পক্কফল পতনের বিশ্লেষ করিয়া এই ঘটনাকে আরও সাধারণ অবস্থায় পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া কতক কৃতকার্য্য হইলেন, তখন বাহ্যবস্তুকে জীবনের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার আরও সুযোগ হইল। মাধ্যাকর্ষণের কল্পনা করিয়াও নিউটন সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই; পৃথিবী সূর্য্যের সহিত যে রজ্জুর দ্বারা সংবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা দেখিতে চাহিয়াছিলেন। ঐ রজ্জুর সন্ধান আর একটু পাইলে, জগৎকে আরও জীবনের উপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। রসায়নবিদ্যার দ্বারা আমরা অনেক জটিল দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে পারি। ঐ সমস্ত জটিল বস্তুর সরল উপাদান যাহা, তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ঐ সরল উপাদান সংগ্রহ করিয়া অনায়াসেই জটিল বস্তুকে নির্ম্মাণ করিয়া জীবনের কার্য্যে লাগাইতে পারি। বড় দুঃখের বিষয়, স্বর্ণরৌপ্য ধাত্বাদি নির্ম্মাণ করিতে পারা যাইতেছে না, ইহাদের উপাদান আর বিশ্লেষ করিতে পারা যাইতেছে না; কিন্তু সে দুঃখ বেশী দিন পাইতে হইবে না। বিভিন্ন ধাতুকে বিশ্লেষ করিয়া তাহাদের আরও সরল উপাদানের সাক্ষাৎ পাইলেই এই দুঃখের উপশম হইবে। তাহা যে পাওয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বিজ্ঞানের উন্নতি যে ভাবে হইতেছে, প্রতিদিনই নূতন নূতন বিশ্লেষ যে ভাবে সাধিত হইতেছে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় যাহার আছে, তাহার সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। জগতকে—সমেত মন—যেদিন আমরা ভাল করিয়া বিশ্লেষ করিতে পারিব, সেই দিন জীবনেরও উন্নতি ভাল করিয়া হইবে; যেদিন সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষ করিতে পারিব, সেইদিন জীবন সম্পূর্ণ হইবে। অতএব

তাহা কখন পারিব না ; তবে প্রকৃত উন্নতিসাধন করিতে পারিব। এই উন্নতি কিন্তু ওই বিশ্লেষমূলকজ্ঞান সাপেক্ষ, ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আধ্যাত্মিক উপাদান আছে কিনা, পরে দেখিতে হইবে। এখন এই বিশ্লেষণকার্য্যের একটা চরম অবস্থার কল্পনা করা যাইতে পারে : জগত পদ্ধতি যে এক জাতীয় উপাদান দ্বারা গঠিত, যাহার বিভিন্নরূপ সংযোগে বিচিত্রতার উদ্ভব হইয়াছে, সেই পদার্থে উপনীত হইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এক জাতীয় উপাদানে জগৎ গঠিত না হইতে পারে, জগদ্গঠনের মধ্যে অজ্ঞেয় উপাদান থাকিতে পারে ; তাহা লইয়া আমাদের প্রয়োজন নাই ; তাহা দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা কল্পনা করিবার উপায় নাই। কিন্তু সেই আদিম সরল উপাদানের দ্বারা যে প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা সহজ কল্পনীয় ; যে জীবন গঠিত হইতে পারে, তাহা উচ্চ বাঞ্ছনীয় ; কাজেই আমরা আদিম উপাদানের সন্ধানে ব্যস্ত থাকি ; ঐ উপাদান উদ্‌ঘাটিত করিবার শক্তিও ধারণ করি। সেই শক্তির সাহায্যে অনেক সরল উপাদান উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে ; এবং যেখানে জটিল উপাদান রহিয়াছে, তাহার ভিতরও দিন দিন সরল উপাদান উদ্‌ঘাটিত হইতেছে।—ইহাই একত্ব প্রতিপাদন ; ইহার অনুসরণই একত্বপ্রতিপাদিকা বুদ্ধি ; ইহা বিজ্ঞানের অস্থিমজ্জা। এই বুদ্ধির দ্বারা মনোভাবের বিশ্লেষ করিয়া, এই তালিকাস্থ ক্রিয়াসমূহের ভিতর সাধারণউপাদানের সন্ধান করিতে হইবে। অনুভূতি হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর, আত্মা, পরকালের জ্ঞান, মনের ক্রিয়া বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। এখন কি করা যাইবে? এইখানে অনুসন্ধানের শেষ হইল সিদ্ধান্ত করিয়া, মনের প্রতিমা (fetish) গঠন করিয়া স্রক্ চন্দনাদির দ্বারা পূজা করিয়াই তৃপ্তি লাভ করা যাইবে, না এই মনের ক্রিয়াকে এবং মনকেও বিশ্লেষ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করা যাইবে?

২। যন্ত্রবৎ বুদ্ধি।

জ্ঞানের আবশ্যকতা কি?—জীবনের সম্যধিক স্ফুরণ বা উন্নতি। অন্যথায় ইহার কোন আবশ্যকতা নাই ; একমাত্র অনুভূতি থাকিলেই

যথেষ্ট হইত; ঐ অনুভূতির তুলনারূপ ক্রিয়া সাধন করিবার কোন আবশ্যকতাই ছিল না। এই তুলনাকার্য্য, সহজ হইতে ক্রমান্বয়ে জটিল হইয়া পড়ে। তুলনার সহজকার্য্যদ্বারা লভনীয়জ্ঞান মানুষ লাভ করিয়া বসিয়া আছে। যাহা লাভ করিতে পারে নাই এবং চেষ্টা করিতেছে, তাহা জটিল। জটিল অর্থে—বহু সূক্ষ্ম উপাদান দ্বারা গঠিত। এই জটিলতা আরও বৃদ্ধির কারণ হইতেছে. এই বহু উপাদানের সকলকেই বর্ত্তমানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করিবার সুবিধা নাই। প্রমাণস্বরূপ, আধুনিক বিজ্ঞানের Radio-activity, জৈবন্ত্রিকতত্ত্ব প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু যদিও সে সুবিধা নাই, তবুও সে সুবিধা যখন আসিবে, সেই সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া না থাকিয়া, যে উপাদানসমূহ প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহার সাহায্যে তাহাদের পরস্পর তুলনার দ্বারা জ্ঞান উদ্ভাবন করা আবশ্যক হইতেছে। এই শ্রেণীর জ্ঞানকে অনুমান (Theory) বলা যাইতে পারে; পর্ব্বতোবহ্নিমানের অনুমানও এই শ্রেণীর। বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে, অধিকাংশ উপাদান যে স্থলে অজ্ঞাত, সে স্থলে অনুমানের বিশেষ মূল্য নাই; যে স্থলে বেশীর ভাগ উপাদান জানিত, সেই স্থলই অনুমানের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এই অনুমান, জ্ঞান বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক; এমন কি, উপাদানের জটিলতার স্থলে, ইহার সাহায্যগ্রহণ ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব। বস্তু মাত্রেরই উপাদান এরূপ জটিল যে, তাহা আংশিক মাত্রে জ্ঞেয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান লাভ করি, সে জ্ঞানের উপাদানসমূহ অর্থাৎ সেই জ্ঞেয় বস্তুর উপাদানসমূহ, কতক বেশী পরিমাণে জ্ঞাত। আবার ঐ ইন্দ্রিয়ের গঠনোপাদান আরও সূক্ষ্ম এবং জটিল; ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার জ্ঞান তজ্জন্য আরও অস্পষ্ট। তত্রাচ আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া লই, এই ইন্দ্রিয়ও বাহ্যবস্তুর উপাদান দ্বারা গঠিত—ইহাতে স্বতন্ত্র কোন উপাদান নাই। ইন্দ্রিয় হইতে স্নায়ুমণ্ডলের গঠনে পৌঁছাইলে, উপাদানের সূক্ষ্মতা ও জটিলতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; তত্রাচ সে স্থলেও বাহ্যবস্তুর উপাদানের ন্যায় উপাদানই কল্পনা করিয়া লই—বাহ্যজগতে, জড়জগতে, যে সমস্ত ক্রিয়া দেখিতে পাই, স্নায়ুর

আত্মকৃত ক্রিয়াও তাহার ন্যায় মনে করি। কেন করি?—উপায় নাই। এইরূপ প্রতিপন্ন করার নামই বিজ্ঞান; এই সমস্ত শারীরিক কার্য্য জড়পদার্থনির্ম্মিত যন্ত্রের ন্যায় প্রতিপন্ন করা, যন্ত্রের সহিত তাহার একতা প্রতিপন্ন করাই বিজ্ঞান। দেখা গিয়াছে, জড় এবং জড়ীয়শক্তিনির্ম্মিত পদার্থকে এরূপ ভাবে যতদূর বিশ্লেষ করা যায়, ততই তাহাকে জীবনের কার্য্যের সহায়তায় নিযুক্ত করা যায়।

আর এক উপায় আছে—বস্তুকে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা বিশ্লেষ করা; আধ্যাত্মিক উপাদান, আধ্যাত্মিক শক্তির প্রচুরতা অবোধকর করা। তাহাতে জীবনধারণের কোন সহায়তা হয় না।

"তাহা নাই হইল, এ জীবন ধারণ অপেক্ষা উচ্চতর কামনা সাধিত হয়।"

উত্তর পরে দেওয়া যাইবে। সংক্ষেপে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, সেই উচ্চতর সাধন কি, তাহা কাহার নিকট জানিতে হইবে? পুনরায় সেই বিশ্বাসের দ্বারস্থ হইতে হয়। আধ্যাত্মিক উপায় বাদ দিয়া, বৈজ্ঞানিক উপায়ে জগৎপদ্ধতির ব্যাখ্যার চেষ্টা করিলে যে ফললাভ হয় এবং হইয়াছে দেখা যাইতেছে, তাহা কিন্তু সকল বিশ্বাস অপেক্ষা দৃঢ় বিশ্বাস। যে বুদ্ধির দ্বারা এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায়, তাহাকে যন্ত্রবৎবুদ্ধি বলা যাইতে পারে। কথাটা শুনিতে নিতান্ত নীচ, আধ্যাত্মিক বুদ্ধির কথা বলিলে খুব উচ্চ রকম শুনায়। তাহা তো হইবেই, কারণ প্রথমটা বাস্তব, দ্বিতীয়টা কল্পনা। স্মরণ রাখিতে হইবে, যাহা বাস্তব তাহাই কিন্তু কল্পনার উপাদান; কল্পনা তাহা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না; তদুচ্চগগনবিহারচেষ্টা বিড়ম্বনা আত্মপ্রতারণা মাত্র। যন্ত্রদ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়া, অবশ্য এই জগদ্যন্ত্র, নিম্নশ্রেণীর ঢেঁকি যন্ত্র বা বস্ত্রবয়ন যন্ত্র মনে করিতে হইবে না। এই যন্ত্র যথেষ্ট জটিল (intricate); তবে যতই জটিল হউক, জটিলমাত্র; আর কিছু নয়। আরও দেখিতে হইবে, এই যন্ত্রের জটিলতার অংশবিশেষের পরিচয়ই আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়; ইহার ভিতর যদি এমন কিছু থাকে, যাহা জীবনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, তাহার সহিত পরিচয়ের সম্ভব হইলেও তাহা অপ্রয়োজনীয়।

ধরিয়া লওয়া যাউক, মনও একটা যন্ত্র—এই জগদযন্ত্রের একাংশ। মনো-যন্ত্র ইন্দ্রিয়ের বহির্ভূত, সুতরাং অজ্ঞেয়। এই যন্ত্রের স্বাধীন ক্রিয়া থাকুক আর নাই থাকুক, ইহার ক্রিয়া সাধারণইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না, এবং পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রবৎবুদ্ধির দ্বারা এবং সাধারণ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা অনুমান করা যায় যে, ইহার সকল ক্রিয়াই দেহকে বাদ দিয়া সম্পন্ন হয় না; মনের ক্রিয়ার সমান্তরাল (Parallel) দৈহিক ক্রিয়া দেখা যায়; মনের যে অনুভূতিক্রিয়া, তাহার আনুসঙ্গিক ইন্দ্রিয় ও স্নায়ুর ক্রিয়া দেখা যায়।

৩। মনের ইতিহাস।

মন কাহার? এ বস্তু শুদ্ধ কি আমারই আছে? অবশ্য তাহা নহে, সকলেরই আছে। এই যে সকলেরই মন আছে, এই কথার ব্যাপ্তি কতটা, তাহা সাধারণত অজ্ঞাত। এই ব্যাপ্তি মানুষের ভিতর সীমাবদ্ধ নহে। দেহ যেমন মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, মনুষ্যদেহের ইতিহাস যেমন তাহাকে ছাড়াইয়া জীবজগতে চলিয়া যায়, মনের ইতিহাসও কেবলমাত্র মানবের মন ছাড়াইয়া সমস্ত জীবের মন পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। ক্রিমিকীট হইতে এই ইতিহাসের প্রারম্ভ। ইহাদের যে মন আছে তাহা বলাই বাহুল্য। পশুর যে মন আছে, তাহা যে সর্ব্বাংশে মানুষের মনের অনুরূপ, মানুষের মনে পশুর মনের অতিরিক্ত নূতনভাব যে কিছু নাই, ধর্ম্মবাদক শ্রেণীর দার্শনিক বাদে আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা এক বাক্যে স্বীকার ও প্রতিপন্ন করিতেছেন। দয়া মায়া ভক্তি প্রীতি পর্য্যন্ত পশুর জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব, মনের যদি স্বাধীন অনুভূতি থাকে, তবে তাহা, যতই প্রচ্ছন্নভাবে হউক, ক্রিমিকীটের মনে, পশুর মনে আছে বলিতে হইবে। তাহা যে আছে, ইহাদের কার্য্যের দ্বারা তাহা আদৌ প্রতিপন্ন হয় না। কাল, আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া, পরকালের কোন ভাব ইহাদের আছে, তাহার পরিচয় কই? শরীরের দ্বারা কাল, আকাশের যে অনুভূতি তাহা অবশ্যই আছে; কিন্তু তাহার অতিরিক্ত নাই। মার্জ্জার যে ঠিক আহারের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা অবশ্যই কালের জ্ঞান। এই কালের জ্ঞান কিন্তু অর্জ্জিত; দেহের দ্বারা, স্নায়ুর দ্বারা, পুরুষানুক্রমে অর্জ্জিত; ইহা স্বাধীন জ্ঞান নহে। চক্ষু-

কর্ণাদির দ্বারা বাহ্যজগত হইতে ইহারা কালের অনুভব করে; নিজের শরীরের অবস্থা হইতে ইহারা কালের পরিমাণ করে; ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কালের অনুভব করে। জীবদেহ মধ্যেই ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় যন্ত্র অবস্থিত থাকিয়া কাল পরিমাপ করিতেছে। জীবদেহের অনেক অংশই কাল পরিমাপক যন্ত্রবিশেষ। ঋতুবিশেষে জীববিশেষের যে সংযোগেচ্ছা হয়, তাহা মনের স্বধর্ম্মজ কালের অনুভূতি নহে, দেহের অনুভূতি মাত্র।

৪। মনের ক্রিয়ার সহিত দেহের সম্বন্ধ।

মনের ক্রিয়ার সহিত দেহের আনুসঙ্গিক ক্রিয়া রহিয়াছে; ঐ ক্রিয়া বাদ দিয়া মন কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। ঐ ক্রিয়াংশই জ্ঞেয়; আর কোন অংশ থাকিলে তাহা যে জ্ঞেয় নহে, প্রতিফলিত কর্ম্ম (Reflex action) হইতে আরম্ভ করিয়া স্বতঃসাধিত কর্ম্ম (Instinctive action) ও তৎপরে বুদ্ধিচালিত কর্ম্মের বিষয় (Intelligent action) দেখিলে, তাহা বুঝা যাইবে। ক্রিমিকীটের মন তাহাদের দেহের একান্ত অধীন, তাহাদের দেহের উপর বাহ্যবস্তু আঘাত করিলে প্রত্যাঘাতমূলক ক্ষণিক ক্রিয়া মাত্র হয়। ঐ ক্রিয়ার ভিতর মনের স্বাধীন ক্রিয়ার কোন চিহ্নই দেখা যায় না। তবেই বলিতে হইবে, মনের স্বাধীনক্রিয়া একমাত্র মানুষের মনেই আছে। কিন্তু দেখা যাউক, এই মনও দেহের কিরূপ অধীন। দেহ রুগ্ন হইলে মনের ক্রিয়ার লাঘব হয়, সবল হইলে মনের ক্রিয়া বলবান হয়; কোন বস্তু একই ইন্দ্রিয়ের উপর অধিকক্ষণ ক্রিয়মান থাকিলে ঐ ইন্দ্রিয় ক্লান্ত হয়, মনের অনুভূতিও ক্লান্ত হয়। কর্ণের নিকট সঙ্গীত অনবরত বর্ষিত হইতে থাকিলে, মন কর্ণকে লইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, আর অনুভব করিতে চাহে না। ইন্দ্রিয়ের অভ্যাসের ফলে অনুভূতির ব্যতিক্রম হয়; অহিফেনসেবীর তিক্তাস্বাদ কমিয়া যায়; নিতান্ত দুর্গন্ধময় খাদ্য এমন কি অখাদ্য খাইয়া তৃপ্তি অনুভব করা যায়। অতএব বলিতে হইবে, মনের ক্রিয়া দেহের ক্রিয়ার আনুসঙ্গিক সমান্তরাল (Parallel) ক্রিয়া মাত্র। মনের ক্রিয়াকে ক্রিয়া না বলিয়া অন্যশব্দের দ্বারা অভিহিত করিলে ভাল হয়; যখনই ক্রিয়াশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তখনই মন অজ্ঞাতসারে দেহের দিকে চলিয়া গিয়াছে। আমরা

মনের দ্বারা বাহ্যবস্তুকে জানি, আবার মনকে জানিতে হইলে বাহ্যবস্তুর সাহায্য লইতে হয়—মনের দ্বারা মনকে জানা যায় না। ইতিপূর্ব্বে জ্ঞানের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা দেখিলেই, কেন জানা যায় না তাহা বুঝা যাইবে। জানা অর্থে, এক বিষয়কে বিষয়ান্তরের সহিত তুলনা করা; সুতরাং মনের সহিত আবার সেই মনের তুলনা করা যায় না, কাজেই জড়ের সহিত তুলনা করিয়া জানিতে হয়। পরে দেখা যাইবে, মনের বহুত্ব নাই; মনজগতের অভ্যন্তরে আর তুলনা কার্য্য পরিচালন করিবার সুযোগ নাই; অতএব মনের ক্রিয়ার জ্ঞেয়াংশ দেহের ক্রিয়াই বলিতে হইবে, দেহের ক্রিয়ার জ্ঞেয়াংশ আবার যন্ত্রের ন্যায় মনে করিতে হইবে; ইহা ছাড়াইয়া কোন জ্ঞান নাই। এই যন্ত্রবৎ বুদ্ধির দ্বারা অনুমানের সহায়তায় আমরা মনের ক্রিয়ার সন্ধান করিব।

৫। মনের অনুভূতিক্রিয়ার বিশ্লেষ।

মনের ক্রিয়ার প্রথম সংখ্যক বিচার্য্য বিষয় হইতেছে—অনুভূতি। কিন্তু যখন অনুভূতি বিচার্য্য বিষয় হইয়াছে, তখনই মনের ষষ্ঠ সংখ্যক ক্রিয়া, জ্ঞান, আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়িতেছে। জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন অনুভূতিরও আলোচনা করিবার উপায়ন্তর নাই—অনুভূতিই থাকিয়া যায়, আলোচনা করা হয় না। বিশ্লেষ করা জ্ঞান সাপেক্ষ। অপেক্ষাকৃত জটিল উপকরণ কি, অপেক্ষাকৃত সরল উপকরণ কি, তাহা স্থির না করিতে পারিলে তাহা বিশ্লেষ করা যায় না। জ্ঞানের দ্বারা, তুলনাদ্বারা ভিন্ন, তাহা স্থির করা যায় না। অতএব মনের জ্ঞানরূপ ক্রিয়াই সর্ব্বাগ্রে আলোচনীয় বিষয় হইয়া পড়িতেছে। এই জ্ঞান দ্বিবিধ: ইন্দ্রিয়জ ও মনের স্বধর্ম্মজ। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের ব্যাপার আগে দেখা যাউক। জ্ঞান কাহাকে বলে, পূর্ব্বে কতক বলা হইয়াছে; পুনরায় আরও কিছু বলা যাইতেছে। মনে করা যাউক, আমার মনকে কেন্দ্র করিয়া যে বাহ্য জগৎ—সমেত তাহার স্রষ্টা—বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহা এককালীন সমভাবাপন্ন অর্থাৎ একই উপাদান দ্বারা গঠিত; জ্ঞানের অবস্থা কিরূপ হইবে? সমভাবাপন্ন জগতের জ্ঞান হইবে তাহা নহে, কোন জ্ঞানই হইবে না। জ্ঞানের যেরূপ অর্থই করা যাউক, এই অবস্থ মনের জ্ঞান

হইতে পারে না ; যাহা হইবে তাহাকে জ্ঞান বলিলে, এই শব্দের উপর অন্যায় অত্যাচার করা হয় ; যাহা হইবে তাহা অনুভূতি। অনুভূতি হইতে জ্ঞান আরও একটু জটিল মনোভাব। জগতে বহুরূপ পদার্থ (Heterogeneity) না থাকিলে জ্ঞান নাই, জ্ঞানের আবশ্যকতাও নাই ; বাহ্যজগতের বিচিত্রিতা হইতে ইহার উৎপত্তি এবং আবশ্যকতা ; একাধিক বস্তুর তারতম্য করাই ইহার কার্য্য। দেখা যাউক, এই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা অনুভূতির ব্যাপার কিরূপ দেখায়, সূর্য্য হইতে আলোকরশ্মি চক্ষুর উপরে পড়িল, চক্ষু সেই রশ্মিমালা দেহাভ্যন্তরস্থ স্নায়ুকেন্দ্রে প্রেরণ করিল, ঐ কেন্দ্র আবার আরও দূরবর্ত্তী, আরও জটিল কেন্দ্রান্তরে প্রেরণ করিল ; এইরূপে এই রশ্মিদ্বারা উৎপাদিত স্নায়ুস্রোত স্নায়ুমণ্ডলের এতৎ-সংস্পৃষ্ট সমস্ত কেন্দ্র পরিভ্রমণ করিল। এই আলোকরশ্মি নয়নেন্দ্রের উপর যে ক্রিয়া উৎপন্ন করিল, তাহা বিশ্লেষ করা যায় ; ঐ ক্রিয়া জটিল। স্নায়ুর ভিতর কি ক্রিয়া উৎপন্ন করিল, বর্ত্তমানে তাহা বিশেষ জানা যায় নাই, অনুমান করা যায় মাত্র। সর্ব্বশেষে এই ক্রিয়াস্রোত কেন্দ্রস্থ স্নায়ুকেন্দ্রে, অথবা বলা যাউক, মন নামধেয় কোন জড়াতিরিক্ত পদার্থে আঘাত করিল। এই স্রোত যখন কেন্দ্রস্থ স্নায়ুতে পৌঁছিয়াছে, তখন আর অগ্রসর হইবার স্থান নাই। বাহ্যজগৎ হইতে পতিত আঘাত দ্বারা উৎপন্ন এই স্নায়ুস্রোতের নামই সূর্য্যের অনুভূতি। সূর্য্য, ইন্দ্রিয় ও স্নায়ুর মধ্য দিয়া মনের * উপর আঘাত দ্বারা যেরূপ অনুভূতি জন্মায়, চন্দ্রগ্রহনক্ষত্র, বৃক্ষ-পর্ব্বতাদি, সর্ব্বপ্রকার দৃশ্যমান বস্তুই ঐরূপ ক্রিয়া উৎপাদন করে। অনুভূতি যে আঘাতের প্রবাহ মাত্র, তাহা মানুষের উন্নত মনের অবস্থা ছাড়িয়া দিয়া যে নিম্নশ্রেণীর মন হইতে এই উন্নত মন বিকসিত হইয়াছে, তাহার অবস্থা দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই প্রবাহকে প্রত্যাঘাত বলা যাইবে। আলোকমালা কোন কীটের উপর আঘাত করিয়া যে অনুভূতি জন্মায়, ঐ অনুভূতি প্রতিফলিত কর্ম্ম (Reflex action), আঘাতের প্রত্যাঘাত মাত্র, আর কিছুই নহে।* শরীরের ক্রিয়াবাদ দিয়া মনের ক্রিয়াংশ দেখিতে

---

* সর্ব্বত্র মনশব্দের এই প্রবন্ধের অনুকূল অর্থ করিতে হইবে।

গেলে, ইহাদের মনের স্বাধীন ক্রিয়াশক্তির প্রতি আদৌ ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিস্ময়, উদ্ভূত হয় না— নিতান্ত যন্ত্রবৎ ক্রিয়া বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু যখন মানুষের মনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হই, তখন যে বিস্ময়-বিহ্বলতা আসিয়া পড়ে, তাহার কারণ, কীটের অনুভূতি ক্রিয়া অপেক্ষা মানুষের এই ক্রিয়া বিশেষ জটিল, আর কিছুই নহে। এই জটিলতার জন্য মন দায়ী নহে, দেহ দায়ী; মন উভয়েরই তুল্য অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে করিতে কোন বাধা দেখা যায় না। এক একটি স্পৃষ্ট পদার্থ ইন্দ্রিয় হইতে মন পর্য্যন্ত যে ক্রিয়া স্রোত প্রবাহিত করে, সেই স্রোতকে সূক্ষ্মরূপে দেখিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বস্তু মনের উপর যে বিভিন্নরূপ আঘাত করে, ঐ বিভিন্নতার পরিচয়, ঐ বিভিন্ন আঘাতের দ্বারা মনের গঠনের কি বিভিন্নতা হয় তাহা, জানিবার উপায় নাই; ইন্দ্রিয় এবং স্নায়ুর উপরে যে বিভিন্নতা উৎপাদন করে, তাহাই জানা যাইতে পারে। বিভিন্ন বাহ্যবস্তুর বিভিন্নরূপ আঘাতে মনের যদি কোন বিভিন্নরূপ অবস্থা হয়, তাহা অবশ্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। এ অংশে আমরা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বিচার করিতেছি, মনের স্বধর্ম্মজ জ্ঞানের বিচার করিতেছি না; কাজেই মনের যদি কোন বিভিন্ন অবস্থা হয়, তাহা অবশ্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধিগম্য নহে; ইন্দ্রিয় ও স্নায়ুতে যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া উৎপাদিত হয়, মাত্র তাহাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। দর্শনেন্দ্রিয় সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, অন্যান্য ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি সম্বন্ধে সেই একই কথা; সমস্ত ইন্দ্রিয়োত্থিত ক্রিয়াস্রোত একই ভাবে কার্য্য করে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা যে দৃষ্টি, তাহাতেই সীমাবদ্ধ হইয়া দেখিলে, ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির অবস্থা এইরূপ দেখাইবে: বাহ্যজগৎ হইতে কোন উদ্দীপনা ইন্দ্রিয়ে প্রহৃত হইয়া একটি ক্রিয়াস্রোত প্রবাহিত করে, যাহা অবশেষে হয়ত মনে রুদ্ধ হইয়া শেষ হইয়া যায়। এই ক্রিয়াস্রোতের যে অংশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যগত, তাহার জ্ঞান হইতে পারে; ইন্দ্রিয়ে যে পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে, তাহার জ্ঞান হইতে পারে; ইন্দ্রিয় হইতে স্নায়ুকেন্দ্রে যে পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে, তাহারও কথঞ্চিৎ জ্ঞান হইতে পারে; এই কেন্দ্র হইতে মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কেন্দ্রে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে, হয়ত তাহারও কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইতে

পারে। ইন্দ্রিয় হইতে এই স্রোত যতদূরে সরিয়া যাইতেছে, এই জ্ঞান ততই অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। অবশেষে এই স্রোত কোথায় যাইল?—মনে অর্থাৎ জ্ঞানের বহির্দ্দেশে। অনুভূতি কার্য্যের মনের যে ক্রিয়াংশ—যদি কোন ক্রিয়াংশ থাকে—তবে তাহার জ্ঞান হইতে পারে না। এই গেল ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের কথা, এখন মনের যদি কোন স্বাধীন জ্ঞান থাকে, তবে তাহা সর্ব্বাগ্রে বলিতেছে যে :—এই জগৎ-পদ্ধতি মধ্য হইতে কতকটামাত্র জ্ঞেয়; ইহার আদি, অন্ত, বা আত্মন্ত থাকিবার আবশ্যকতা আছে কিনা, সে আবশ্যকতা না থাকিলে তবে কি আছে, সমস্তই অজ্ঞেয়। "আছে" শব্দ দ্বারা অভিব্যক্তি করিলে তাহাতেও দোষ হয়, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। সূর্য্য হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, বৃহত্তর জ্যোতিষ্ক হইতে সূর্য্য, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর জ্যোতিষ্ক হইতে তাহা, এইরূপ সৃষ্টিকল্পনা করিতে করিতে যেমন অজ্ঞেয় রহস্যের ভিতর চলিয়া যাইতে হয়; প্রস্তরখণ্ড অণুর দ্বারা গঠিত, ঐ অণু আরও সূক্ষ্ম অণুর দ্বারা গঠিত, এইরূপে যেমন অজ্ঞেয় নির্ম্মাণরহস্যের ভিতর চলিয়া যাইতে হয়; মানুষের অনুভূতি সম্বন্ধেও সেইরূপ, ইন্দ্রিয়, স্নায়ু, তথা হইতে স্নায়ুকেন্দ্র, তথা হইতে সেই অজ্ঞেয়ের দ্বারে উপনীত হইতে হয়। ঈশ্বর, পরমাণু মন, এই অজ্ঞেয়ের সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র।—ইহাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি।"

"ইহা যদি হইল বিজ্ঞান, তবে অজ্ঞতা কাহাকে বলে? ইহা অপেক্ষা দর্শনে যা হা বলে, ধর্ম্মে যাহা বলে, তাহার মধ্যে বরং জ্ঞান রহিয়াছে; তোমার এ বিজ্ঞান চাহি না।"

সত্যের অনুরোধে চাহিতে হইবে। বিজ্ঞান যাহা বলিতেছে, তাহার সত্যতা কতকাংশে নির্ণেয়; অন্যরূপ কল্পনার সত্যতা আরও অনিশ্চিত।

ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির আলোচনা শেষ করিয়া এইবার মনের স্বধর্ম্মজ অনুভূতির আলোচনা করা যাউক। পুনরায় সেই গোল উপস্থিত হইতেছে—জ্ঞানের দ্বারা আলোচনা করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা মনের স্বধর্ম্মজ অনুভূতির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না।

ইন্দ্রিয় অধিকাংশ জীবেরই আছে, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানও আছে। যদি বলা যায়, মনের স্বধর্ম্মজ জ্ঞানও অনেকের আছে, তাহাতে আমি বলিব: আবার অনেকের নাই, অনেকে ইহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেও প্রস্তুত নহে। মনের স্বধর্ম্মজ জ্ঞানের অস্তিত্ব যাহারা অস্বীকার করে, অধ্যাত্মবাদীর তাহাদের নিকট বলিবার কি আছে?—বিশ্বাসের দোহাই মাত্র আছে। জড়বাদীর অধ্যাত্মবাদীর নিকট বলিবার কি আছে? উত্তর অতি সহজ—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের ব্যাপার। এই জ্ঞান একালীন কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

"মনের স্বাধীন অনুভূতি এবং সেই অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে জ্ঞান, তাহার তাহাই প্রমাণ, প্রমাণান্তর নাই। যাহারা মনের ভিতর এই অনুভব, এই জ্ঞানের সন্ধান পায় না; তাহাদের মন হয় সংস্কারমলিন, না হয় তাহাদের দুরদৃষ্ট।"

উপরুক্ত মনভাবের সহিত আমাদের দুই কারণে বিবাদ। প্রথম কারণ—যাহা তোমরা স্বাধীন জ্ঞান বলিতেছ, তাহার অনেক জ্ঞান যে স্বাধীন জ্ঞান নহে, তাহা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা দেখান যাইতে পারে। দ্বিতীয় কারণ—তোমাদের এই বিশ্বাসমূলে অপরের, সমাজের, ব্যবস্থা করিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না; কারণ, তোমাদের এই বিশ্বাস ধ্রুব সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পার না; কোন প্রমাণই তোমাদের নাই এবং থাকিতে পারে না। ক্রমান্বয়ে এই দুই কারণের বিচার করা যাইবে। মনের স্বভাবজ জ্ঞান অনেকে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন; ঐ যুক্তির ভিতর ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের কোন কথা থাকিলে, এরূপ চেষ্টা নিতান্ত অসঙ্গত; কারণ, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা মনের স্বভাবজ জ্ঞান প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে গেলে, স্বভাবজ জ্ঞান নাই ইহা প্রতিপন্ন হইয়া যায়; অথবা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন স্বভাবজ জ্ঞান প্রতিপন্ন করা যায় না, ইহা প্রতিপন্ন হইয়া যায়।

"যে ব্যক্তির মন অন্তর্দিকে রহিয়াছে, সে অনুভব করে না; এমন কি যুদ্ধমান সৈনিক অস্ত্রাঘাত পর্য্যন্ত অনুভব করে না; অতএব অনুভূতি দেহের ক্রিয়া নহে—কেবল মাত্র মনের ক্রিয়া।"

অস্ত্রাঘাত যে অনুভব করে না, তাহার কারণ : উত্তেজনারূপ প্রবলতর স্রোত স্নায়ুমণ্ডলে প্রবাহিত থাকে ; সেই উত্তেজনাই অনুভব করে, অস্ত্রাঘাত অনুভব করে না। এই উত্তেজনা যে মনের স্বাধীন ক্রিয়া নহে, তাহা ক্রমশ স্পষ্টীকৃত করা যাইবে।

৬। সুখদুঃখের বিশেষঅনুভূতির বিশ্লেষ।

সাধারণ অনুভূতি সম্বন্ধে বলা হইল, এখন যন্ত্রবৎ বুদ্ধির সহায়ে সুখ-দুঃখের বিশেষ অনুভূতির বিশ্লেষ করিতে হইবে। এই বিশেষ অনুভূতির স্নায়বিক ক্রিয়াংশ অজ্ঞাত রহিয়াছে ; তবে অনুমানের দ্বারা কতকটা জানা যায়। এই বিশেষ অনুভূতির ইতিহাস, আবার ক্রিমিকীট হইতে পাঠ করিতে আরম্ভ করা যাউক। ইহাদের যদি কোন সুখদুঃখ থাকে, তবে উদরপূর্ত্তির সহিতই তাহা একান্ত সংবদ্ধ ; যে ক্রিয়া দ্বারা দেহ গঠিত হইতেছে, তাহার অনুকূল স্নায়বিক ক্রিয়া, ইহাদের সুখ ; আর যাহা আংশিক দেহধ্বংসের আনুসঙ্গিক ক্রিয়া, তাহা দুঃখ ; ইহাদের অন্যরূপ সুখদুঃখের কল্পনা করা যায় না। সেই একত্বপ্রতিপাদিকাবুদ্ধির দ্বারা দেখিলে মানুষের সর্ব্বরূপ সুখদুঃখই দেহসংগঠনজনিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এ বিষয়ের সবিস্তার বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবার সুযোগ নাই, বাঙ্গলা ভাষাতে তাহা করিবার সময়ও উপস্থিত হয় নাই; লৌকিকভাবের দুই চারিটা কথা বলিব। যে ব্যক্তি নিজের উদরকে বঞ্চনা করিয়া ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্রের উদরপূর্ত্তি করাইয়া সমধিক তৃপ্তি লাভ করিল, কি করিয়া বলা যাইতে পারে যে, তাহার সুখ এই শ্রেণীর ? এই কার্য্যের দ্বারা যে উদরকে বঞ্চিত করিয়া প্রবৃত্তিকে অর্থাৎ স্নায়ুর কোন অবস্থাকে পোষণ করিল, ইহাও সেই পূর্ত্তিজনিত সুখ, তবে উদরের না হইয়া প্রবৃত্তির। সৌন্দর্য্যের উপভোগজনিত সুখও তাহাই, ধর্ম্মানুচরিত সুখও তাহাই ; অন্য কিছু বলিয়া, অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কোনও লাভ নাই, জ্ঞানের কোনও বৃদ্ধি নাই, বরং ক্ষতি আছে। দেহের ভিতরে, স্নায়ুর ভিতরে, কি ভাবে এই প্রবৃত্তিসমূহ লুকায়িত আছে, যে ভাবে তাহাদের পুষ্টি হইতেছে, অনুসন্ধান দ্বারা তাহার আবিষ্কার করাই জ্ঞান। যদি স্নায়ু ভিন্ন অন্য কোন সূক্ষ্মতর অজ্ঞাত দৈহিক

পদার্থের ভিতর লুকায়িত থাকে, তবে তাহারই অনুসন্ধান—জ্ঞান; তদ্ভিন্ন ইহা মনের ক্রিয়া, ইহা ঈশ্বরের লীলা খেলা বলিলে, কুসংস্কারের পথ পরিষ্কার করা ভিন্ন জ্ঞানের পথ উন্মোচন করা হয় না। ঐ সমস্ত কথা বলাও যা, আর অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় বলাও তাই। অজ্ঞাততা, অজ্ঞেয়ত্ব, আমরা তো স্বীকারই করিতেছি; তবে অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়ের অবৈধ জ্ঞান অস্বীকার করিতে চাই, অবৈধ পন্থার অনুসরণের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করিতে চাই।

৭। স্মৃতি।

ইহা কি করিয়া দেহের কার্য্য হইতে পারে? কি করিয়া পারে, তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইবে; দেহাতিরিক্ত, জড়াতিরিক্ত, ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত পদার্থে ইহার কারণ আরোপ করিয়া কি হইবে? যিনি জড়ের শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষে বুঝিয়া লইয়াছেন, জড়াতিরিক্ত পদার্থে ইহার কারণ আরোপ করিবার অধিকার কেবলমাত্র তাঁহার জন্মিতে পারে। তাহা যতদিন না লইতেছেন, ততদিন জড়ীয়শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করিতে, জড়কে ছাড়াইয়া কল্পিত অজ্ঞাত পদার্থের দিকে ধাবমান হইতে, তিনি বারিত। যদিও জড় * বহুপরিমাণে অজ্ঞাত, আংশিক পরিমাণে জ্ঞানিত, তবুও তাহা ফেলিয়া দিয়া যাহা এককালীন অজ্ঞাত এবং সম্ভবত অজ্ঞেয়, তাহার দিকে ধাবমান হওয়া দুর্ব্বুদ্ধি মাত্র। আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি যে অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়, তাহা না বুঝিয়া, সেই অজ্ঞাত বিষয়দ্বারা জ্ঞাত বিষয়কে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা, বিশেষত সেই রূপান্তরিত অবস্থা অন্যের উপর, সমাজের উপর প্রয়োগ করিবার চেষ্টা, শুধু দুর্ব্বুদ্ধি নহে—পাপ।

দর্পনের উপর পতিত প্রতিবিম্বের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। ঐ প্রতিবিম্ব দর্পনের ভিতর কোন স্থায়ী পরিবর্ত্তন ঘটায় না; সুতরাং সেই প্রতিবিম্ব পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। মনের উপর পতিত প্রতিবিম্ব কিন্তু

* অনেক স্থলে, জড় এবং জড়ীয়শক্তি, উভয়কেই জড়শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হইতেছে।

চলিয়া যায় না। কেন চলিয়া যায় না, তাহার কারণ নির্দেশ করিবার একমাত্র উপায় আছে—প্রতিবিম্ব মাত্রই মনের উপর অপেক্ষাকৃত কোন স্থায়ী পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন ঘটায়। এখন মনের উপর কি ঘটায়, তাহা কোন কালেই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বিষয় হইবে না; স্নায়ুর উপর, এমন কি ইহাও স্বীকার করা যাইতে পারে যে, স্নায়ু অপেক্ষা অজ্ঞাত সূক্ষ্ম দেহাংশের উপর যে ক্রিয়া উৎপন্ন করে, তাহাই জ্ঞেয় হইতে পারে; কিন্তু মনের উপর যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা তাহা কোন কালে জ্ঞেয় হইতে পারে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। মানুষের জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে অনুমান মাত্র করা যাইতে পারে যে, প্রতিফলিত বস্তুমাত্রই স্নায়ুমণ্ডলের কোন স্থানে একটি বা একাধিক স্নায়ুকণা (Nerve-cell) নির্ম্মাণ করে। ঐ স্নায়ুকণাই সেই বস্তুর প্রতিরূপ; তাহার সহিত স্নায়ুর অন্যান্য অংশের সংযোগবিশেষই, সেই বস্তুর স্মৃতি।

৮। প্রবৃত্তি।

বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া স্নায়ুকেন্দ্রে আঘাত করে। এই কেন্দ্রে যে আঘাত পৌঁছায়, তাহা অত্যন্ত ক্ষীণ। সূচিভেদ্য অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া বহুদূরাগত ক্ষুদ্র আলোকরশ্মি এই স্নায়ুকেন্দ্রের উপর পতিত হইয়া যে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে, তাহা হয়ত বিশাল; ঐ ক্ষুদ্র আলোক-রশ্মির ক্ষুদ্র আঘাত হৃদয়ে যে ভাবস্রোত প্রবাহিত করিল, তাহা হয়ত অত্যন্ত প্রবল ও বহুক্ষণস্থায়ী। হয়ত ঐ আলোকরশ্মি আশ্রয়হতাশ জলমগ্নপ্রায় সন্তরণকারীর মনে যে আশার সঞ্চার করিল, তাহার বলে সেই ব্যক্তি জীবন রক্ষার জন্য কঠোর দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ হইল—আরও বহু চেষ্টা করিয়া নিজের দেহকে ভাসমান রাখিল; যে বাহু আর সঞ্চালিত হইতেছিল না, তাহাতে নূতন বল সঞ্চারিত হইল; যে কণ্ঠ আর ধ্বনিত হইতেছিল না, তাহা দিগন্ত কম্পিত করিয়া সাহায্য ভিক্ষা করিল। এই সামান্য আলোকরশ্মি দেহ ও মনের উপর কি করিয়া এরূপ প্রবল ক্রিয়া উৎপন্ন করে? প্রাথমিক ক্ষুদ্র আঘাতের এইরূপ পরিবর্দ্ধিত প্রত্যাঘাত কি করিয়া সংঘটিত হয়? হার্বার্ট স্পেন্সার একটা

স্নায়ুকেন্দ্রকে একটা বিস্ফোরকস্তূপের (Powder Magazine) সহিত তুলনা করিয়াছেন। এক একটা স্নায়ুপ্রণালী ইন্দ্রিয়কে দেহমধ্যস্থ স্নায়ুকেন্দ্রের সহিত যুক্ত করিয়াছে। ইন্দ্রিয়ে যে আঘাত পতিত হয়, স্নায়ুপ্রণালী তাহা বহন করিয়া লইয়া গিয়া স্নায়ুকেন্দ্রে উপস্থিত করে। স্নায়ুকেন্দ্রকে যেমন বিস্ফোরকস্তূপের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, এই স্নায়ুপ্রণালীকে বিস্ফোরকস্তূপের সহিত সংযুক্ত সূত্রাকার বারুদের রেখার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ঐ রেখা ইন্দ্রিয় হইতে স্নায়ুকেন্দ্রে পৌঁছিয়া উভয়কে সংযুক্ত রাখিয়াছে। যেমন বারুদের রেখার দূরবর্ত্তী প্রান্তে অগ্নিসংযোগ করিলে প্রথমে সামান্যই ক্রিয়া উৎপন্ন হয়; ক্রমান্বয়ে বারুদের রেখা পুড়িতে পুড়িতে যখন বিস্ফোরকস্তূপে—অর্থাৎ স্নায়ুকেন্দ্রে—উপস্থিত হয়, তখন ভীষণ সংঘাত উৎপন্ন হয়। আবার দেহের মধ্যে এই স্নায়ুকেন্দ্র একটী নহে—অসংখ্য ; একরূপের নহে—ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ, তাহা হইতে বৃহত্তর। এইরূপ, ইন্দ্রিয় হইতে স্নায়ুপ্রণালী যতই মস্তিষ্কের দিকে অগ্রসর হয়, ততই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর স্নায়ুকেন্দ্রে উপস্থিত হয়। পূর্ব্বকথিত প্রাথমিক বিস্ফোরক স্তূপে—অর্থাৎ স্নায়ুকেন্দ্রে, যে সংঘাত উপস্থিত হয়, তাহা আবার বৃহত্তর স্তূপে যাইয়া বৃহত্তর সংঘাত উৎপন্ন করে। এইরূপে ইন্দ্রিয়ের উপর সামান্য আঘাতের ফল সংবর্দ্ধিত হইয়া দেহমনের ভিতর ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এইরূপ সংবর্দ্ধিত ক্রিয়া উৎপন্ন করিতে হইলে, দেহকে কিন্তু সর্ব্বদা স্নায়ুকেন্দ্রে স্নায়বিক বিস্ফোরক প্রস্তুত করিতে হয়। যেমন এক ধারের স্নায়ুকেন্দ্র সমূহে সংঘাত উৎপন্ন হয়, তেমন তাহাদের ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যায় ; পুনরায় পূরণ না করিলে আর সেরূপ প্রবল ক্রিয়া উৎপন্ন হইবে না। এইজন্য দেহ সর্ব্বদা এই স্নায়বিক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া স্নায়ুকেন্দ্র সমূহে সঞ্চয় করিতেছে। ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে অসংখ্য স্নায়ুপ্রণালী অসংখ্য স্নায়ুকেন্দ্রে অসংখ্য দিক দিয়া সংযুক্ত রহিয়াছে।* ইন্দ্রিয়ের উপর কোন একটা আঘাত পতিত হইলে, তাহা সর্ব্ব স্নায়ুকেন্দ্রের ভিতর সমভাবে প্রতিধ্বনিত হয় না—এক দিক দিয়া চলিয়া যায়,

---

* ২৩৯ পাতার চিত্র দ্রষ্টব্য।

অন্তরিকের স্নায়ুকেন্দ্রসমূহ স্নায়বিক পদার্থে পরিপূর্ণ থাকে। যদিও সমভাবে প্রতিধ্বনিত হয় না, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয়ের উপর পতিত সকল আঘাতেরই অল্প বিস্তর প্রতিধ্বনি বহু স্নায়ুকেন্দ্র ব্যাপিয়া ধ্বনিত হইতে থাকে। মনে করা যাউক, স্নায়ুমণ্ডলের এক অংশের উপর পুনঃপুন আঘাত হইতেছে; তাহার ফল ইহাই হইবে যে, সেই অংশের স্নায়ুকেন্দ্রসমূহের সঞ্চিত পদার্থ ফুরাইয়া যাইবে; যে সমস্ত কেন্দ্র সেই অংশে অবস্থিত তাহার আর বিশেষ ক্রিয়া হইবে না, অন্যাংশে স্নায়বিক পদার্থ বহুপরিমাণে সঞ্চিত থাকা বশত প্রবল ক্রিয়া হইতে থাকিবে—ইহাই প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি, মনের ভিতর লুকায়িত কোন অজ্ঞাত পদার্থ, মনে করিবার আবশ্যক নাই। বহুক্ষণ কাহাকেও অন্ধকারে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলে দেখিবার প্রবৃত্তি তাহার অত্যন্ত বলবতী হয়; তাহার কারণ, স্নায়ুমণ্ডলের যে অংশ দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত গ্রথিত, তাহার ক্রিয়া না হওয়াতে তাহাতে স্নায়বিক পদার্থ প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে। এই পদার্থ যে সামান্য আঘাতেই বিস্ফারিত হয়, তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। স্নায়ুর যে কোন স্থানে, যে কোন আঘাত পতিত হইতেছে, তাহাই এখানে উপস্থিত হইয়া সঙ্ঘাত উৎপন্ন করিতেছে। অন্ধকারময় কারাগৃহে আবদ্ধ ব্যক্তির চক্ষুর ভিতর দিয়া আঘাত আসিয়া এই স্নায়বিক পদার্থের বিস্ফোরণ করিলে তাহার প্রবৃত্তি হইত না, তাহা অনুভূতি হইত; কিন্তু যে স্থলে তাহা হইবার সুযোগ নাই, সে স্থলে তাহা দেহ বা মনের প্রবৃত্তিরূপে ক্রিয়াশীল হয়, অর্থাৎ দেখিবার ইচ্ছা হয়। আবার ইহার বিপরীত ঘটনা পর্য্যালোচনা করা যাউক। অন্ধকারে না রাখিয়া এই ব্যক্তিকে দিবারাত্র আলোর মধ্যে রাখিয়া দিলে সে অন্ধকার খুজিবে; আলোক আর কাম্যবস্তু না হইয়া অসহ্য হইয়া উঠিবে। স্নায়ুর এইরূপ ক্ষয় ও সঞ্চয়ের অবস্থা আছে বলিয়াই নিদ্রার প্রয়োজন। দীর্ঘকাল অনিদ্রায় থাকিয়া স্নায়ুর কার্য্য করিতে হইলে, মানুষ পাগল হইয়া উঠে।

প্রবৃত্তি ঈশ্বরমুখী হয় কেন? স্নায়ুর ভিতরে এই প্রবৃত্তির উপযোগী উপাদান সংগৃহীত হইয়া বহুল পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে, ইহাই কারণ।

পুরুষানুক্রমে এই উপাদান সঞ্চিত হইতেছে, তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। যে সমাজে ধর্ম্মভাব বেশী, পিতা মাতা বা পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মভাব বেশী, সাধারণত সেই স্থলেই ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলবতী হয়। অন্যান্য প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মভাবের স্নায়বিক উপাদান কি, তাহা অবশ্য জানা যায় নাই; তবে এইভাবে জানিবার চেষ্টাই যে একমাত্র গতি, যন্ত্রবৎ বুদ্ধির অবতারণা করিয়া তাহা ইতিপূর্ব্বে বুঝাইবার চেষ্টা করা গিয়াছে। বংশগত গুণাগুণের উত্তরাধিকার সরল ভাবে সংক্রামিত হয় না, জটিলভাবে সংক্রামিত হয়, তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। ধার্ম্মিক পিতার পুত্র ধার্ম্মিক হইল না, পৌত্র ধার্ম্মিক হইল না, হয়ত দৌহিত্র বিশেষ ধার্ম্মিক হইল, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা যাউক।
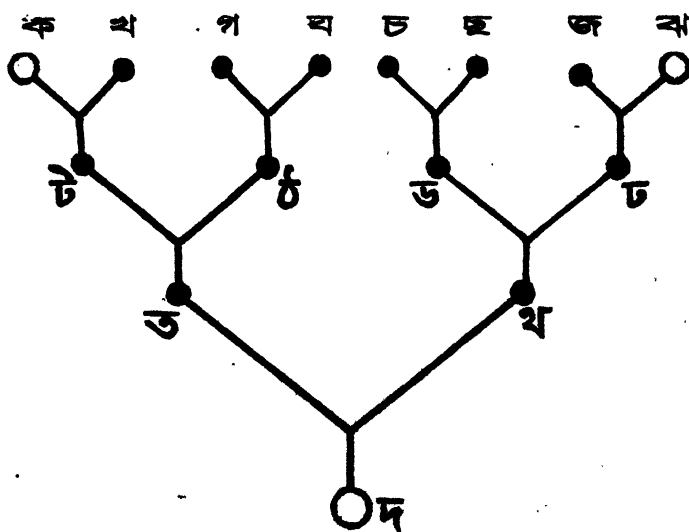
ক……ঝএর সন্তান ট……ঢ। ট……ঢএর সন্তান ত থ। তাহার সন্তান দ। O গোলক ধর্ম্মভাবের চিহ্ন হইতেছে। ক এবং ঝএর এই ধর্ম্মভাব রহিয়াছে। কয়েক পুরুষ ধরিয়া ঐ ধর্ম্মভাব আদৌ

স্ফুরিত হইল না। পুত্রোৎপাদন সময়ের দেহ ও মনের অবস্থার উপর ও অন্যান্য বহুবিধ কারণের উপর এই স্ফুরণ নির্ভর করে। কিন্তু যখন ক এর বংশ, অন্যান্য কারণের অনুকূল অবস্থায়, জএর বংশের সহিত মিলিত হইয়া ম উৎপন্ন হইল, তখন এই ধর্ম্মভাব বিশেষরূপে স্ফুরিত হইল।

এখন একটা উপমা দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলে প্রবৃত্তির উৎপাদন স্পষ্টীকৃত করা যাউক। পিয়ানোযন্ত্রের কোন একটি তারে আঘাত করিলে কেবল যে সেই তারটী ধ্বনিত হয়, তাহা নহে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও বহুতর তারে অল্পাধিক প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হয়। স্নায়ুর উপর বাহ্যজগত হইতে আঘাত দ্বারা যে মূল ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাকে অনুভূতি বলা যাইতে পারে; আর স্নায়ুমণ্ডলের অন্যান্য কেন্দ্রে যে প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে। যদি মধ্যস্থানীয় ষড়জ ধ্বনিত করা যায়, তবে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী খাদের ষড়জ প্রতিধ্বনিত হইবে। তবে বাজিবে না কখন? যখন এই খাদের তার বেসুরো অবস্থায় থাকে। তারের বেসুরো অবস্থার সহিত স্নায়ুকেন্দ্রের বিস্ফোরকশূন্য অবস্থার কল্পনা করিতে হইবে। এই ষড়জকে ধ্বনিত করিলে, ইহার নিকটস্থ যে সমস্ত সূত্র স্বাভাবিক পর্য্যায়ক্রমে ইহার সহিত প্রতিধ্বনিত হইতে বাধ্য, তাহারা সকলেই সুরবিহীন অবস্থায় থাকিলে তাহাদের একটীও প্রতিধ্বনিত হইবে না, কিন্তু দূরবর্ত্তী কোন সূত্র—যাহা ধ্বনিত ষড়জের সহিত কোন-রূপ সুর বিশিষ্ট আছে—তাহাতে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হইবে। দূরবর্ত্তী স্নায়ুকেন্দ্রের এই প্রতিধ্বনিই প্রবৃত্তি। ধ্বনিত ষড়জের সহিত যে সমস্ত সূত্র বিশেষ সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং যাহারা তাহার ধ্বনির সহিত প্রবলতর প্রতিধ্বনি করিতে বাধ্য, তাহাদের সুরের অভাবে কোন ধ্বনি শ্রুত হইল না, কাজেই দূরবর্ত্তী তারে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। এই ক্ষীণ প্রতিধ্বনিই প্রবৃত্তি। যে মূল সূত্রে আঘাত লাগিয়াছে এবং তাহার সহিত যে সমস্ত সূত্র প্রবলতর প্রতিধ্বনি করিবার জন্য নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের যদি সুর থাকিত, তাহারা যদি প্রবল প্রতিধ্বনি উৎপন্ন করিতে পারিত, তাহা হইলে দূরবর্ত্তী সূত্রের এই

ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ডুবিয়া যাইত—অর্থাৎ প্রবৃত্তির উদ্রেক হইত না। আর একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; পিয়ানোযন্ত্রের সূত্রে হইতে স্নায়ুর তারের বিশেষ পার্থক্য আছে। পিয়ানোর তারের বেসুরো অবস্থা মাত্র হইতে পারে; সুরের অবস্থা থাকিলে; তাহার সর্ব্ব সূত্রমধ্যস্থ প্রতিধ্বনি একই ভাবে হইবে; কিন্তু স্নায়ুর মধ্যে আরও বিচিত্র প্রতিধ্বনির ব্যবস্থা রহিয়াছে। স্নায়ুর যে কেন্দ্রসমষ্টিতে আঘাত পড়িয়াছে, তাহাতে স্নায়বিক বিস্ফোরকপদার্থ সঞ্চিত থাকিলেও, স্বাভাব বশত দূরস্থ কেন্দ্রসমষ্টিতে হয়ত এত বেশী পরিমাণে বিস্ফোরক পদার্থ সঞ্চিত হইয়াছে যে, সেই দূরস্থ কেন্দ্রমালা সমূহে তজ্জন্য প্রবলতম ক্রিয়া উৎপন্ন হইবে। স্নায়ুর এইরূপ অবস্থাকেই প্রবৃত্তির উদ্রেক বলা যাইতে পারে।

৯। জ্ঞান।

কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের কথাই এস্থলে বলা যাইবে। একাধিক অনুভূতির, একাধিক স্মৃতির, কিম্বা অনুভূতির সহিত স্মৃতির তুলনা দ্বারা উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈষম্য অনুভবের নাম জ্ঞান। এই তুলনা কে করে? ইহা কি মনের স্বাধীন ক্রিয়া নয়? সাদৃশ্য ও বৈষম্য অনুভবই বা কে করে? ইহাও কি মনের স্বাধীন ক্রিয়া নয়?

স্নায়ু তুলনা করিবার বাধা দেখা যায় না। এই স্নায়ু একটী মাত্র নহে—বহু শাখাপ্রশাখা, কেন্দ্রউপকেন্দ্র বিশিষ্ট একটী বিশেষ জটিল যন্ত্র। এই যন্ত্রের প্রত্যেক অংশই আবার ইহার অন্যান্য অংশের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধবিশিষ্ট। কোন এক স্থানে বা বহুস্থানে আঘাত লাগিলে, প্রত্যেক আহত স্থানই তাহাদের অনুভূতি পরস্পর বিনিময় করে—অর্থাৎ একের অনুভূতি অন্যের নিকট প্রেরণ করে। কেবল তাহাই নহে, আহত স্থানসমূহ স্নায়ুর উচ্চতর কেন্দ্রসমূহে যুক্ত রহিয়াছে; সেই উচ্চতর কেন্দ্রসমূহ আবার তদপেক্ষা উচ্চতর কেন্দ্রসমূহে যুক্ত রহিয়াছে; চিত্রের দ্বারা ইহা স্পষ্টীকৃত করা যাউক।
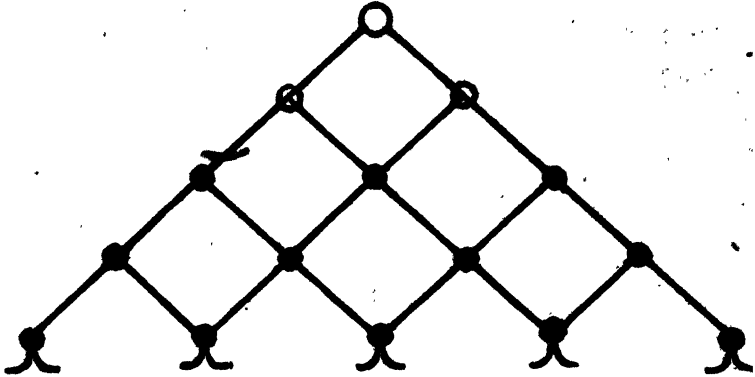
ইহা ঠিক বৃক্ষের ন্যায়। প্রত্যেক পল্লবই যেমন শাখাউপশাখাক্রমে মূল বৃক্ষস্তম্ভে সংযুক্ত রহিয়াছে, স্নায়ুর অবস্থাও তদ্রূপ। ইন্দ্রিয়ের উপর আঘাত এবং তাহার সহিত যুক্ত হইয়া স্মৃতিনিবদ্ধ স্নায়ুকণা যে আঘাত করে, উচ্চতর স্নায়ুকেন্দ্রে ঐ উভয় আঘাতের সম্মিলিত যে প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই তুলনালব্ধ জ্ঞান, তাহাই তুলনার অনুভূতি।

এই তুলনা এবং তজ্জনিত জ্ঞানের উপলব্ধি যদি মনের স্বাধীন ক্রিয়া হয়, তবে স্নায়ুর অবস্থার উপর তাহা নির্ভর করে কেন? স্নায়ুর অংশ-বিশেষের অভাবে বা বিকৃতিতে অনুভূতির অভাব বা বিকৃতি জন্মায় কেন? পাগলকে তাহার সহজ অবস্থার পরিচিত রামকে শ্যাম এবং শ্যামকে রাম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে দেখা যায়; এ বিপরীত জ্ঞান তাহার কিছুতেই দূর করা যায় না, এরূপ দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বলা বাহুল্য যে, যদিও সাধারণত ইহাকে মানসিক ব্যাধি বলা হয়, তবুও দার্শনিক সহজেই স্বীকার করিবেন যে, পাগলের মন কখন পাগল হয় না, বিকৃত হয় না, তাহার দেহের অংশবিশেষই বিকৃত হয়। আমরা সর্বদা দেহের যে সূক্ষ্মাংশের ক্রিয়াকে মনের ক্রিয়া বলিয়া ভুল করি, ইহা তাহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দেহের স্থূল অংশের ক্রিয়া—যাহার পরিচয় সহজেই

পাওয়া যায়—তাহাকে দেহের ক্রিয়া বলি ; আর দেহের যে ক্রিয়ার সন্ধান সহজে পাওয়া যায় না, যাহা বিশেষ জ্ঞান (Expert knowledge) ও অনুমান সাপেক্ষ, তাহাকে মনের ক্রিয়া বা অবস্থা বলি। এই ভাবে দেখিলে, মনের ক্রিয়া আর দেহের অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় অংশের ক্রিয়া একই হইয়া পড়ে—মনের ক্রিয়া বলাও যা, আর এই ক্রিয়ার অবস্থা অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলাও তাই।

সহজ জ্ঞানও জ্ঞান, জটিল জ্ঞানও জ্ঞান। উভয় প্রকার মানসিক ক্রিয়াই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। রামকে রাম বলিয়া জানা, বৃক্ষকে বৃক্ষ বলিয়া জানা, পদ্মপুষ্প জবা নহে, তাহাকে পদ্মপুষ্প বলিয়া জানা, হইল সহজ জ্ঞান। রামকে যেমন অন্যান্য মনুষ্য এবং মনুষ্যান্তর পদার্থের সহিত তুলনা করিয়া জানি, সেইরূপ জ্যামিতির কোন কঠিন প্রতিপাদ্য বিষয়ও রেখা, কোণ ইত্যাদির তুলনা দ্বারা জানি ; জ্যামিতির এই জ্ঞান কিন্তু জটিল। ব্যাধিক্ষীণ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত সহজ জ্ঞানের ক্রিয়া করিতে পারিবে—রামকে রাম বলিয়া চিনিতে পারিবে ; কিন্তু শেষোক্ত জটিল জ্ঞানের ক্রিয়া করিতে পারিবে না। কেন ? এই ক্রিয়ার কোন প্রধান অংশ যদি মনের ক্রিয়া হয় ; তবে দেহের নিকট এই অধীনতা কেন ? মন অবশ্য ব্যাধিগ্রস্থ হয় না। শরীরকে বাদ দিয়া এস্থলে মন স্বাধীনভাবে জ্ঞানের ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া জ্যামিতির প্রশ্নোদ্ধার করে না কেন ? তুলনা দ্বারা জ্ঞান নিকাষণ কার্য্য যদি মনেরই কার্য্য হয়, তবে রাম যেরূপ ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত আছে, জ্যামিতির প্রশ্নের উপকরণও তেমনি উপস্থিত আছে ; তবে মন এ ক্রিয়া সম্পন্ন করে না কেন ?

১০। মন এক বা বহু উপাদানগঠিত।

মন এক উপাদান দ্বারা গঠিত না বহু উপাদান দ্বারা গঠিত ? অর্থাৎ মন একইরূপ না বহুরূপ ? শরীর যেরূপ প্রত্যেকরই বিভিন্নরূপ ; মনও কি তাহাই ? শরীর যেমন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, মনও কি তাহাই হইতেছে ?—না, মন একত্বাপন্ন, অপরিবর্ত্তনীয়, অভিন্ন পদার্থ ? একত্বাপন্ন বস্তুর পরিবর্ত্তন নাই ; পরিবর্ত্তন থাকিলে তাহা বহুরূপী হইবে। পরিবর্ত্তনের ভাব কি জড় পদার্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে ?

ইহা কি জড়েরই বিশেষ গুণ!—না, ইহা মনেরও গুণ—মনেরও পরিবর্ত্তন আছে? প্রথমে ধরা যাউক, মন একভাবাপন্ন। ইহার ক্রিয়া তাহা হইলে সর্ব্বত্র একরূপ হইবে, দ্বিবিধ বা বহুবিধ ক্রিয়া হইতে পারিবে না; কারণ, একভাবাপন্ন বস্তুর—সে বস্তু মন হইলেও—তাহার বহুরূপ ক্রিয়ার কল্পনা করা যায় না। যদি তাহাই হয়, তবে মনের একটী মাত্র ক্রিয়া থাকিবে। ঐ ক্রিয়া কি?—অনুভব করা, না স্মরণ করিয়া রাখা, না তুলনা করা? অনুভব করা নহে, স্মরণ করিয়া রাখা নহে; এ সমস্ত দেহের কার্য্য বলিয়া একমাত্র তুলনা করাই মনের কার্য্য বলিতে পারা যায়; অথবা অনুভব করা মনের কার্য্য বলিতে পারা যায়। এই উভয়বিধ ক্রিয়ার যে কোন ক্রিয়া মনের ক্রিয়া বলিলে আরও বলিতে হয় যে, কোন অবস্থাতেই এই অনুভূতি বা জ্ঞানের বিকৃতি বা একরূপ ভিন্ন রূপান্তর হইতে পারে না —উন্মত্ত অবস্থাতেও নহে, রোগের অবস্থাতেও নহে। কিন্তু পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে, ঐরূপ বিকৃতি হয়, মনের বহুরূপ ক্রিয়া হয়। যদি বলা যায়, উন্মাদের মনের প্রকৃত অবস্থা থাকে না, অতএব তাহার মন থাকে না; রোগীরও কি মন থাকে না? মনের সাহায্য ব্যতিরেকে বাতুল এবং রোগী যদি কার্য্য করিতে পারে, তবে মনের কল্পনার কোন আবশ্যকই নাই; সহজ ব্যক্তিরও তাহা পারা উচিত। সহজ ব্যক্তির কার্য্য, আর ইহাদের কার্য্যের মৌলিক পার্থক্য কেহ দেখাইতে পারেন কি? আরও দেখিতে হইবে যে, মনের যদি সেই অনুভূতি বা জ্ঞানরূপ একটী মাত্র ক্রিয়া থাকে, তবে তাহা কি? ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল, অনন্তের জ্ঞান?—না আকাশ, কাল, পরমাণুর জ্ঞান; না চিন্তা, না কার্য্যে প্রবর্ত্তক ক্রিয়া, না অনুভূত পদার্থের স্বাধীন সমাবেশ? এ সমস্ত যে একই প্রকার ক্রিয়া, কেহ তাহা বলিতে সাহস করিবেন কি? তাহা বলিলে আর শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। মায়াবাদ আদৌ দার্শনিক তত্ত্ব নহে; ইহা নিতান্ত বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির পলায়নের চেষ্টা মাত্র। ইহাতে যে অবস্থায় মনের তৃপ্তি জন্মায়, সে অবস্থায় মনের নিকট কোন যুক্তি উপস্থিত করিয়া ফল নাই; এই মায়াবাদ সর্ব্বাপেক্ষা অযৌক্তিক। ইহার অযৌক্তিকতা, ইহার অপেক্ষা সরল অযৌক্তিকতায়

দ্বারা দেখান যাইতে পারে না—ইহাই আদিম, মৌলিক যুক্তিপ্রলয়। সেই মায়াবাদ ত্যাগ করিয়া যদি ঐ সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকে একই শ্রেণীর ক্রিয়া বলিতে হয়, তবে অজ্ঞেয় ক্রিয়ারহস্য বলিলে চলিতে পারে। আর মাত্র শব্দান্তর—ঈশ্বর, আধ্যাত্মিকতা; চতুর্থ শব্দ নাই। ঈশ্বর বলিলে কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদান দ্বারা গঠিত ঈশ্বরে কুলাইতে পারে না; সেই অজ্ঞেয়ের উপর আরূঢ় যিনি, তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

আরও কথা: মনের ক্রিয়া একটী মাত্র মনে করিলে পদার্থের জাতিগত ও ব্যক্তিগত ক্রিয়ার বিভিন্নতা অস্বীকার করিতে হয়। মন শুদ্ধ মানুষের আছে তাহা বলা যায় না, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের ও আছে; সুতরাং ইহাদের সকলের মানসিক ক্রিয়াই তুল্যরূপ বলিতে হয়। উদ্ভিদেরও মন আছে, অন্যথায় তাহারা দেহপরিপুষ্টির উপযোগী আহার্য্য বস্তু বাছিয়া লইতে পারে না। অতএব এই বিভিন্ন পদার্থের জাতিগত মনের ক্রিয়াও একরূপ ক্রিয়া বলিতে হয়; শিশুর, বালকের, যুবকের ও বৃদ্ধের মনের ক্রিয়াও একই ক্রিয়া বলিতে হয়। তাহা বলিতে গেলে মায়াবাদেও কুলায় কিনা সন্দেহ। বটবৃক্ষের কি অনন্তের অনুভূতি আছে? —না, শিশুর আত্মার অনুভূতি আছে? যদি না থাকে, আর জ্ঞানী ব্যক্তির যদি থাকে, তবে একইরূপ ক্রিয়া কি করিয়া হইল?

"স্ফুরিত অবস্থায় নাই, কূটস্থ অবস্থায় আছে।"

আপত্তি শুনিয়া অনেকে মনে করিবেন, ইহার আর উত্তর নাই। উত্তর অতি সহজ। একভাবাপন্ন বস্তুর কূটস্থ ও স্ফুরিত, দ্বিবিধ অবস্থা থাকিতে পারে না। যখন কূটস্থ অবস্থা বলা হইয়াছে, তখনই মন বহুরূপী হইয়া গিয়াছে—অন্যথায় স্ফুরণ হইবে কাহার? যদি বলা যায়, একেরই স্ফুরণ। একের স্ফুরণ দুই; ইহা সামাষ্টিক বহুত্ব, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তবে আর মনকে একভাবাপন্ন বলা যায় না, বহুভাবাপন্ন বলিতে হয়। মনের যদি স্ফুরণ থাকে, মন যদি বহুভাবাপন্ন হয়, তবে [illegible]ন ক্রমে দেহের নিকটে চলিয়া আসিতেছে। ক্রমশ নিকটবর্ত্তী হইয়া দেহের সহিত যাহাতে মিশিয়া না যায়, তৎপক্ষে চৈতন্য-বাদীকে (Idealist) এখন হইতে সতর্ক হইতে হইবে।

এই বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই, সর্ব্বদেশে মনের অভ্যন্তরে আবার একটা আত্মার কল্পনা করিতে হইয়াছে—একত্ব, নিত্যত্ব, মুক্তত্ব, সেই আত্মাতে আরোপ করিতে হইয়াছে। মন তাহা হইলে দেহেরই ন্যায় গুণবিশিষ্ট ; দেহের সহিতই ইহার ধ্বংস হয়। এখন আমরা মনে করিতে পারি না কি যে, ইহার ক্রিয়া শরীরেরই অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় ক্রিয়াংশ মাত্র—আর কিছুই নহে। কারণ, মনকে যখন অনিত্যের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইল, তখনই তাহার পূজনীয় অলঙ্কার অপহরণ করা হইল ; কল্পনাকে চরিতার্থ করিবার পক্ষে মনের আর উপযোগিতা বা আবশ্যকতা রহিল না ; কারণ, আমরা আত্মাকে পাইয়াছি। দেহের যে অজ্ঞাত ক্রিয়া তাহার নামকরণ করিলাম—মন। তাহাতেও কুলায় না, এই মনের সাধারণ ক্রিয়াতে কুলায় না ; ইহার যে অজ্ঞাত ক্রিয়া তাহার জন্য আবার নূতন নাম করণের আবশ্যকতা আসিয়া পড়িতেছে। আমরা যাইতেছি কোথায় ?—সেই অজ্ঞেয়ের দিকে।

এখন মনকে বহুভাবাপন্ন অবশ্যই বলা যায়। তাহা যেমন প্রমাণ করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না। তবে মনকে বহুভাবাপন্ন বলিলে ইহাই দোষ হয় যে, ইহার আধ্যাত্মিকতা চলিয়া যায়, ইহার নিত্যত্ব চলিয়া যায়, দেহের সহিত তুলনায় ইহার শ্রেষ্ঠত্ব চলিয়া যায় ; ইহার প্রতিমা গঠন করিয়া পূজা করিবার সুযোগ চলিয়া যায়। মনের কোন জ্ঞান হইতে পারে না—ইহা দেহের অজ্ঞেয়াংশ মাত্র।

১১। মনের জ্ঞান কাহাকে বলে ?

"মনের জ্ঞান যদি হইতে না পারে, তবে মনশব্দের অনুরূপ মনোভাব কোথা হইতে আসিল ?"

তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দেহের দ্বারা, পদার্থের মধ্যগত তাপাদি শক্তির দ্বারা, জীবনের যে সমস্ত ক্রিয়ার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহার কারণ নির্দ্দেশক শক্তিকেই মন বলে। ইহা ভাববাচক জ্ঞান নহে, অভাব-বাচক জ্ঞান। ইহাকে ভাববাচক জ্ঞানের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়াই গোল বাধান হইয়াছে।

"ইহা ভাববাচক হউক, আর নাই হউক, ইহাতো কাহারও অনুভূতি? যদি সত্তা না থাকে, তবে ইহার অনুভূতি হইতে পারে না।"

'সত্তা না থাকে' যখন বলা হইয়াছে, তখনই অন্যরূপ অনুভূতি আছে, তাহা স্বীকার করা হইয়াছে—অভাবের অনুভূতি। গাভী যে তাহার বৎসের অভাবের অনুভূতি করিয়া থাকে, সেই অভাব জনিত অনুভূতি যে হইতেছে, তাহা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে; এ সেইরূপ অনুভূতি।

"যে প্রকারের অনুভূতিই হউক, জড়ের কি প্রকারে অনুভূতি হইতে পারে? অনুভূতিই তো মনের সত্তার এবং কার্য্যকারিতার পরিচয়।"

মুদ্গর দ্বারা প্রস্তরখণ্ডের উপর আঘাত করিলে তাহাতে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহাকে যদি অনুভূতি বলা যায়; তবে জড়ের বা পদার্থের অনুভূতি হইবার বাধা নাই। মনুষ্যদেহের উপর যে আঘাত পতিত হয়, তাহার প্রত্যাঘাত করা ভিন্ন দেহ বা মনের আর ক্রিয়া নাই। ইহা জড়েরই অনুরূপ ক্রিয়া; জড়ের এ ক্রিয়া হইবার বাধা নাই। তবে ঐ প্রহৃত প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ অংশ যেমন অজ্ঞাত—অংশ-বিশেষ যেমন অজ্ঞেয়ও হইবে, তেমন দেহের উপর, বা যাহা একই কথা, মনের উপর আঘাতজনিত পরিবর্ত্তনও মাত্র আংশিকরূপে জ্ঞাত এবং জ্ঞেয়। মন বা দেহ অবশ্য প্রস্তরখণ্ড অপেক্ষা বহুল পরিমাণে জটিলতর; ইহার উপর যে আঘাত পতিত হয়, তাহার প্রত্যাঘাতও অত্যন্ত জটিল। এই জটিলতা সর্ব্বাংশে বিশ্লেষ করিয়া দেখাইবার উপায় না থাকিলেও, দেহ ও মনের আপেক্ষিক জ্ঞেয়ত্ব ও অজ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধে তত্ত্ব অবধারণের পথ রুদ্ধ নহে; যে পরিমাণে জানা হইয়াছে, তাহাতে দেহের ক্রিয়াংশই জ্ঞেয়, মনের কোন ক্রিয়াংশ থাকিলে তাহা অজ্ঞেয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। আরও বিশেষ কথা এই যে, এরূপ সিদ্ধান্ত যতই অপর্য্যাপ্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হউক, অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে ভিত্তির নিতান্ত অভাব।

১২। জানিতে চাই কেন?

ইহা জানিবার পূর্ব্বে জানিতে চাহিয়াছি কেন, তাহা অনুসন্ধান

করিতে হইবে। কীটাণু হইতে পশু পক্ষী উদরপূর্ত্তির সহায়তা হইবে বলিয়া জানিতে চাহিয়াছে, অসভ্যাবস্থার ও অপরিণতাবস্থার মানুষও সেইজন্য জানিতে চাহে; অন্য উদ্দেশ্য নাই। উন্নত মনুষ্যের পক্ষে উদর-পূর্ত্তির উপযোগিতা জ্ঞানের প্রধান উপযোগিতা হইলেও, তাহার আরও দ্বিবিধ উদ্দেশ্য থাকিতে দেখা যায়। এই ত্রিবিধ অবস্থা হইতেছে—

১ম। উদরপূর্ত্তি—অর্থাৎ দেহ বা মনের পরিপুষ্টি।

২য়। উদরপূর্ত্তি ছাড়াইয়া উচ্চতর অবস্থাপ্রাপ্তি।

৩য়। জ্ঞানমাত্রই জ্ঞানের উদ্দেশ্য।

দেহ ও মনের জ্ঞেয়ত্ব ও অজ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে তত্ত্ব স্থিরীকৃত করা হইয়াছে, যাহাকে যন্ত্রবৎবুদ্ধি বলা হইয়াছে, এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে তাহাই শ্রেষ্ঠ উপায়, সংস্কারপ্রণোদিত তত্ত্বান্তরের অনুসরণ আদৌ উপায় নহে। প্রথম উদ্দেশ্য যে উদরপূর্ত্তি, তাহা কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করে না, মনের স্বাধীন জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না, ইহার আর একটা দৃঢ়তর ভিত্তি আছে, তাহা দেহজ অনুভূতি। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কেবল মনের স্বাধীন জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, না ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ দ্বারা সংগৃহীত উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া যে কল্পনা গঠিত হয়, তাহার উপর নির্ভর করে? কেবলমাত্র মনের স্বাধীন জ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে ভালই; অন্যথায় এই দেহের পুষ্টির সঙ্কীর্ণ অর্থ না করিয়া উদার অর্থ করিলে, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রথম উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। তাহাতে যিনি অস্বীকৃত, মনের স্বাধীন জ্ঞানদ্বারা একটা উদ্দেশ্য গঠিত করিতে যিনি ব্যস্ত, তিনি এই স্বাধীন জ্ঞানের পোষকতায় কোন স্বাধীন যুক্তি, স্বাধীন কল্পনা, এমন কি কোন স্বাধীন শব্দও প্রয়োগ করিতে পারিবেন না; সমস্তই দেহজ জ্ঞানের নিকট হইতে ধার করিতে হইবে। যদি কেহ বলেন 'প্রমাণ দিব'। তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত। প্রমাণশব্দ ও সেই শব্দের অনুরূপ মনোভাব, দেহজ জ্ঞানের ভাষা এবং ভাব। স্বাধীন যে জ্ঞান, তাহার এ সমস্তের আবশ্যকতা নাই। যিনি প্রমাণ দিতে চাহেন, তিনি স্বাধীন জ্ঞানের স্বাধীনতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; এখনও দেহজ জ্ঞানের অধীন হইয়া রহিয়াছেন। স্বাধীন জ্ঞান দেহজ

জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়া আবশ্যক। যদি তাহা হয়, তবে তাহা লইয়া যুক্তি তর্ক মীমাংসা চলে না। এ সমস্ত শব্দ এবং এই সমস্ত ভাব, দৈহিক জ্ঞানের ভাব; স্বাধীন জ্ঞান যুক্তি তর্ক মীমাংসার বাধার দ্বারা বারিত নহে। স্বাধীন জ্ঞানকে যিনি এই ভাবে দেখিবেন, এইভাবে ব্যবহার করিবেন, তাঁহার আচরণ কতকটা যুক্তিযুক্ত। স্বাধীন জ্ঞান যিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চাহিবেন, তাঁহার ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নহে।

১৩। চিন্তা কে করে?

"গঙ্গাস্রোতে, চন্দ্রের ক্ষীণ আলোকে ঈষৎ অভিব্যক্ত, ভাসমান মৃতদেহ হইতে প্রতিফলিত সামান্য আলোকের আঘাত, তটোপবিষ্ট ভাবুকের মনে দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করাইল। ইহার কারণ এই সামান্য আঘাত, অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রের কঠিন আঘাত আদৌ অনুভূত হইল না। এই উভয়বিধ কার্য্য যদি যন্ত্রের কার্য্য হয়, তাহা হইলে এই যন্ত্র কিরূপ, তাহার পরিচয় নিতান্ত আবশ্যক।"

সামান্য আঘাতে বহুলক্রিয়া মনুষ্যকৃত যন্ত্রেই দেখা যায়; ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। অস্ত্রাঘাত যে অনুভূত হয় না, তাহার কারণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। কোনও প্রবলতর আঘাতের প্রত্যাঘাত তখন স্নায়ুমণ্ডলকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে, অন্য আঘাত স্নায়ুমণ্ডলে কোন স্রোত প্রবাহিত করিতে পারিতেছে না, ইহাই কারণ। সৈনিক পুরুষের কর্ণপটহে শত্রুর আগমনঘোষণারূপ যে আঘাত প্রদত্ত হইল, স্নায়ুমণ্ডলে বংশানুক্রমে সঞ্চিত ও পরিবর্দ্ধিত যুদ্ধপ্রবৃত্তিরূপ যে উপাদান প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে প্রবলস্রোত বাহিত করিল; এই প্রবল স্রোত অন্যান্য ক্ষুদ্র স্নায়ুস্রোতকে প্রতিহত করিল।—ইহাই কারণ। প্রবল স্রোত দেহের অন্যান্য উপাদান দ্বারা অনবরত নিজের উপাদান গঠন করে, অন্য উপাদানকে নিজের উপাদানে রূপান্তরিত ও ব্যয়িত করিতে সমর্থ হয়, এরূপও মনে করা যাইতে পারে। তজ্জন্য শরীর বহুল পরিমাণে ক্ষয় হইয়া গেলেও এই প্রবৃত্তিস্রোত তখনও বেগবান্ থাকে।

১৪। কার্য্য কে করায় ?

"মন যদি কার্য্য না করে, তবে দেহকে কে আদৌ কার্য্য করায় ?"

দেহ-নিজে অগ্রবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে পারে না, কেহ ইহাকে কার্য্যে নিয়োগ না করিলে কার্য্য করিতে পারে না; মৃতদেহ যে কার্য্য করে না, তাহাই তাহার প্রমাণ। যদি বলা যায়, যন্ত্র যেরূপ ভগ্ন হইলে সচল থাকে না, দেহযন্ত্রেরও তদবস্থা হয়। কিন্তু যন্ত্র স্বয়ং কখনই চলে না, কাহাকেও চালাইয়া দিতে হয়। কে চালাইয়া দেয় ? আভ্যন্তরীণ শক্তি বলিলে মনকেই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা আমরা বলি না, বাহ্যশক্তিকেই যন্ত্রের চালক বলি; বাহ্য জগৎ দেহের উপর যে আঘাত করে তাহার প্রত্যাঘাতের নামই কার্য্য। বাহ্যজগৎ বহুক্ষণ আঘাত না করিলেও যে আমরা মানসিক কার্য্য করিয়া যাই, তাহা জটিলযন্ত্রে একবার আঘাত করিলে বহুক্ষণ স্থায়ী স্পন্দনের ন্যায় কার্য্য। বাহ্য জগতের দুই একটা আঘাত হয়ত কেহ তাহার নিজের জীবনে এমন কি তাহার জাতীয় জীবনেও প্রাপ্ত হয় নাই। সেই আঘাত তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী। জীবন, প্রথম অবস্থায় সেই আঘাত পাইয়াছে এবং তাহার স্পন্দন এখনও প্রাণিজগতের ভিতর চলিতেছে। জৈবনিক হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, দেহ পরিপুষ্টির জন্য যে কার্য্য করে, হয়ত বাহ্যবস্তুর সেই প্রথম আঘাতের ইহাই প্রত্যাঘাত; ইহাই হয়ত আদি প্রত্যাঘাতমূলক ক্রিয়া (Reflex action); নহিলে বৃক্ষলতাদি, জৈবনিক মাত্রই এ চেষ্টা করিবে কেন ? মনকে ঐ আঘাতের কর্ত্তা বলিলে ইহাই বিশেষ দোষ হয় যে, ঐ কর্ত্তা অজ্ঞেয় থাকিয়া যায়, কোনকালেই জ্ঞেয় হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বাহ্যবস্তুকে কর্ত্তা বলিলে, সেই কর্ত্তার এবং সেই আঘাতের যে প্রত্যাঘাত হয়, তাহার জ্ঞান আরও প্রশস্ত হইতে পারে। জ্ঞানের ক্ষেত্র যতদূর সম্ভব বিস্তৃত রাখিতে হইবে। তাহাকে মনের কল্পনার দ্বারা বা অন্য কোন কর্ত্তার কল্পনার দ্বারা, অযথা সীমাবদ্ধ করা চলে না; সেরূপ করিলে জীবনের সহায়তা হয় না। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মনকে চালক বলাও যা, আর সেই চালকের অজ্ঞেয়ত্ব স্বীকার করাও তাহাই। মনের কোন জ্ঞান হইতে পারে না; তবে জীবনীশক্তিকে

চালক বলা যাইতে পারে; কিন্তু ঐ জীবনীশক্তি জ্ঞেয় শক্তি হইতে হইলে, জড়ীয় শক্তিরই জটিলতর সমাবেশ হইতে হইবে, অন্যথায় ইহা বলিয়াও সেই চালকশক্তির অজ্ঞেয়ত্বই স্বীকার করা হইয়া পড়ে। আরও বিশেষ কথা এই যে, যে নিজে অজ্ঞেয় তাহার সাহায্যে স্বাধীন জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে না। অতঃপর যে সমস্ত জ্ঞানের বিষয় বলা যাইবে, তাহা বিশেষরূপে মনের স্বাধীন জ্ঞান স্বরূপে আদৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা আমাদের মনের ক্রিয়ার তান্ত্রিকার আট হইতে বার সংখ্যক বিষয়।

১৫। অনুভূত পদার্থের স্বাধীন সমাবেশ কে করে?

কোন বাঙ্গালা দার্শনিক গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম: ষট্পদ অশ্ব দেখিতে পাই না, তবে ইহার কল্পনা কে করে? এই ত মনের সকর্ম্মক ক্রিয়া! অশ্বের দেহের কোন অংশ মনের সকর্ম্মক ক্রিয়ালব্ধ না হইলেও, ইহার নূতনতর সমাবেশ মনের ভিন্ন আর কাহারও ক্রিয়া হইতে পারে না। কেন পারিবে না? যন্ত্র কি বস্ত্রবয়ন করে না? ইহাতে যে কার্পাস দেওয়া হয়, সূতা দেওয়া হয়, যন্ত্র কি তাহার বিভিন্ন সমাবেশ করে না?

"করিতে পারে, কিন্তু যন্ত্রের পশ্চাতে কোন নির্ম্মাতৃক মন থাকা চাই; যন্ত্র সেই মনের আদেশ পালন করে মাত্র।"

এই মনের স্থলে আমি বাহ্যজগত হইতে প্রাপ্ত আঘাতকে স্থাপন করিব: ষট্পদ অশ্বের কল্পনা সেই আঘাতের প্রত্যাঘাত মাত্র। এইরূপ বিভিন্ন সমাবেশক্রিয়ার অভ্যন্তরে আধ্যাত্মিকতা কিছুই নাই। দৃষ্ট, শ্রুত ইত্যাদি, ইন্দ্রিয়ের নিকট সাক্ষাৎকারউপস্থিত বস্তুর, অর্থাৎ বাহ্যজগৎ হইতে আগত আঘাতের সহিত স্মৃত বস্তুর সংযোগ আমাদিগকে সর্ব্বদাই করিতে হইতেছে। বাঘ্র পিঞ্জর দর্শন করিল, তদভ্যন্তরে সংরক্ষিত আহার্য্যের প্রলোভনে প্রবেশ করিল; তাহার ফলে তাহাকে বিশেষ নিগৃহীত হইতে হইল, প্রাণমাত্র বাঁচাইয়া পলায়নে সমর্থ হইল। পুনরায় সে পিঞ্জরদর্শনের সহিত তাহার আনুসঙ্গিক স্মৃতির সংযোগ, সেই ব্যাঘ্রকে করিতেই হয়। এই স্মৃতির সংযোগ করিতে না পারিলে জীব শিক্ষালাভ করে না; ইহা শিক্ষার একমাত্র উপায়; ইহাকেই শিক্ষা বলে। অনেক

শিক্ষা—যথা, ব্যাঘ্রের দর্শনমাত্র হরিণ-শাবকের পলায়ন—তাহারা নিজের জীবনে লাভ করে নাই, জাতীয় জীবনে লাভ করিয়াছে; কিন্তু নিজের জীবনের স্মৃতির সহিত দৃষ্ট বস্তুর সমাবেশ করিতে না পারিলে ব্যক্তিগত জ্ঞান হয় না, জাতীয় জ্ঞানও হয় না। এই যে চতুষ্পদ অশ্ব দেখিয়া তাহার পদাবলীর নূতনতর সংযোজনা করিলাম, ইহা এই শ্রেণীর ক্রিয়া। জিজ্ঞাস্য হইবে: দেহযন্ত্র বা মনোযন্ত্র এ কার্য্য করে কেন? হরিণের স্থলে না হয় উদ্দেশ্য হইতেছে, সেই বাহ্য বস্তুর প্রথম আঘাতের আত্মরক্ষা-মূলক প্রত্যাঘাত; কিন্তু এস্থলে উদ্দেশ্য কোথায়? অন্য উদ্দেশ্যের উল্লেখ না করিয়া যদি বলি "তর্ক করা উদ্দেশ্য, নিজের মত সংস্থাপন করা উদ্দেশ্য" তাহাতেই যথেষ্ট হইবে। এই কার্য্যও দেহরক্ষার অন্যতম কার্য্য, যাহা হইতেছে দেহপরিপুষ্টি। যশোলিপ্সার পরিপুষ্টিও যে দেহ পরিপুষ্টি, তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে। যদি বলা যায়, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল? ইহা ত মনের স্বাধীন প্রবৃত্তি বলিতে হইবে? তাহার উত্তর এই যে, ইহাকে মনের স্বাধীন প্রবৃত্তি না বলিয়া, জৈবনিকের দেহের মৌলিক প্রবৃত্তি বলিলেই উত্তম হয়; মনের উপর এই প্রবৃত্তি আরোপ করাও যা, কোন অজ্ঞেয় বস্তুর উপর আরোপ করাও তাহাই। অন্যস্থানে এ সম্বন্ধে আরও বিশেষভাবে বলা যাইবে।

১৬। গণিত ও ন্যায়দর্শনের জ্ঞান।

চতুষ্কোণ গোলকের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এই অস্তিত্ব বাহ্য জগতে কোথায়ও দৃষ্ট হয় না, ইহাই কি এই জ্ঞানের হেতু? ইহা কি মনের স্বাধীন জ্ঞান নহে? এই জ্ঞানের অর্থ হইতেছে: কোথাও চতুষ্কোণ গোলকের অস্তিত্ব নাই শুধু তাহা নহে, এরূপ অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। "দেখা যায় না" ইহার অতিরিক্ত এই যে "থাকিতে পারে না" জ্ঞান, ইহা কোন ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান? ইহা কি মনের সহজ জ্ঞান নহে? এস্থলে একটু কথা আছে; স্বধর্ম্মজ জ্ঞানের সহিত ইহার কোন সংস্রবই নাই। যখন গোলক বলা হইতেছে, তখনই চতুষ্কোণত্ব অস্বীকার করা হইতেছে। যেমন, বলা হইতেছে, এস্, পি, সিন্‌হা, বুঝাইতেছে সত্যেন্দ্র

প্রসন্ন সিংহ, যেমন প্রথমোক্ত কয়েকটী শব্দের সহিত অনেকগুলি শব্দ জড়িত রহিয়াছে, তেমন গোলক শব্দের সহিত যে অনেকগুলি ভাব একত্র গ্রথিত রহিয়াছে, সেই ভাবসমষ্টিকেই গোলক শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হইতেছে। গোলক শব্দ, এমন কি সমস্ত শব্দই, এস, পি, সিন্‌হার অনুরূপ অল্পবিস্তর সংক্ষেপোক্তি। প্রশ্ন দ্বারা চতুষ্কোণত্ব অস্বীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তজ্জন্যই চতুষ্কোণ গোলক, অথবা একই বস্তুর একই অবস্থায় তাহার ভাব ও অভাব উভয়ই হইতে পারে, এরূপ বলিলে অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। ইহাই মাত্র যে কারণ, সাধারণত লোকে তাহা কেন বুঝে না, তাহার কারণ দেখা যাউক। একটী বৃত্তের ৯৯টা ব্যাসার্দ্ধ (Radius) পরস্পর সমান, কিন্তু একটি ব্যাসার্দ্ধ দৈর্ঘ্যে কিঞ্চিৎ বেশী, ইহা বলিলে যে জ্যামিতি পাঠ করিয়াছে সে অত্যন্ত অসঙ্গত বোধ করিবে ; কিন্তু নিরক্ষর মূর্খের নিকট সেরূপ বোধ হইবে না, তাহার মনের স্বভাবজ জ্ঞান চমৎকৃত হইবে না। যে অল্প জ্যামিতি পাঠ করিয়াছে, তাহার নিকট উচ্চ জ্যামিতিতে প্রমাণিত বিষয় বিকৃত আকারে উপস্থিত করিলেও তাহার স্বভাবজ জ্ঞান বিশেষ আপত্তি করিবে না। বিশুদ্ধ গণিতের ন্যায় মিশ্র গণিতের তত্ত্বসমূহ একই প্রকারের অলঙ্ঘনীয় সত্য—প্রকৃতি তাহারও অন্যথাচরণ করিতে পারে না। তবে এই সমস্ত তত্ত্বইবা মনের সহজ জ্ঞান হয় না কেন? তাহা হওয়া দূরে থাকুক, কয়জন লোকের এই জ্ঞান আছে? বিজ্ঞানও এই জ্ঞান শেষ করিতে পারিয়াছে কি? মিশ্রগণিতের জ্ঞান যে মনের সহজ জ্ঞান নহে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপে তরল পদার্থের গতিবিষয়ক জ্ঞানের (Hydromechanics) উল্লেখ করা যাইতে পারে। তরল পদার্থের পেষণের তত্ত্ব বুঝিতে অনেক উচ্চশিক্ষার্থীকে হিমসিম খাইতে হয়। কেবল গণিতাদি কেন? ভাল করিয়া দেখিলে বিজ্ঞানাদির সমস্ত তত্ত্বই অলঙ্ঘনীয় সত্য বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হইবে। যাহা সত্য, যাহা সত্যজ্ঞান, যে বিষয়েরই জ্ঞান হউক তাহা অলঙ্ঘনীয়। চতুষ্পদ অশ্বের জ্ঞানও গণিতের জ্ঞানের ন্যায় অনিবার্য্য সত্য। ইহারও ব্যতিক্রম হইতে পারে না। যে মুহূর্ত্তে যে অশ্ব চতুষ্পদ রহিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে তাহাই থাকিবে, অন্য-

রূপ হইতে পারে না। তবে কি এই স্বভাবজ জ্ঞান অর্জ্জিত! যদি কেহ বলেন, অর্জ্জিত নহে মার্জ্জিত মাত্র, তাহার উত্তর পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মনের ক্রিয়ার স্নায়বিক অংশই জ্ঞেয়, অন্য কোন অংশ থাকিলে তাহা অজ্ঞেয়। এই মনের অদ্ভুত ক্রিয়ার সর্ব্বাংশ যন্ত্রমাত্রের ন্যায় প্রতিপন্ন কি প্রকারে করা যায়, যাঁহারা মনোবিজ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চা করেন নাই, তাঁহাদিগকে তাহা বুঝাইবার উপায় নাই। যদি কিছু প্রতিপন্ন করা না যায়, ভবিষ্যতে ঐ পথে যাইয়া তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে—পথান্তরের কোন রেখাই দৃষ্ট হইতেছে না; এবং পথান্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত, এই পথে গমনই নিরাপদ; অন্য পথ বিপদসঙ্কুল, কুসংস্কারপঙ্কিল অন্ধকারময় গভীর গহ্বর পরিপূর্ণ।

১৭। আকাশ ও কালের জ্ঞান।

আকাশের জ্ঞান মনের স্বাধীন জ্ঞান নহে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে বালকের মন আছে বলিয়া, তাহারও সাধারণআকাশের (Idea of space) জ্ঞান আছে বলিতে হইবে; পশুর মন আছে, তাহারও এই জ্ঞান আছে বলিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের সাধারণআকাশের জ্ঞান আছে বলা যায় না। তাহাদের যে আকাশের জ্ঞান, তাহা যে খণ্ডাকার আকাশ—ঘটাকাশ পটাকাশের জ্ঞান—তাহা নিজের বাল্যজীবনের এই জ্ঞানের উন্মেষ ও বিকাশের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি করিলেই বুঝা যাইবে। হস্তপদের সাহায্যে খণ্ডাকাশের জ্ঞান হয়; কোন বস্তু গ্রহণ করিতে হস্তপদের মাংসপেশীর অল্প এবং অন্য কোন বস্তু পাইতে অধিক আয়াসের প্রয়োজন হয়, ইহাই দূরত্ববোধ; এই দূরত্ববোধের নামই আকাশের জ্ঞান। হস্তপদাদি অপেক্ষা চক্ষুর দ্বারা এই দূরত্ববোধ অনেক দূর বিস্তারিত হয়, আকাশের কলেবর অনেক বাড়িয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই যখন এই জ্ঞানলাভ করিতে হয়, তখন ইহা মনের স্বাধীন, ইন্দ্রিয়বহির্ভূত জ্ঞান কি করিয়া বলা যায়? যিনি ভাবুক, নিজের বাল্যজীবনে এই জ্ঞানের ক্রমবিকাশ নিরপেক্ষভাবে দৃষ্টি করিবেন, তিনি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন; তবে যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা এবং অভ্যাস নাই, অথচ

পূর্ব্বগঠিত্ বদ্ধমূল সংস্কার রহিয়াছে, তাঁহাকে ইহা কিছুতেই বুঝান যাইতে পারে না। ইহা যদি মনের স্বধর্ম্মজ জ্ঞান হয়, তবে ইন্দ্রিয়ঘটিত অবস্থার সাহায্য ভিন্নও ইহার কল্পনা সম্ভব হওয়া উচিত; কিন্তু মনোবিজ্ঞানবিদ্ বলিতেছেন, বর্ণ বাদ দিয়া বিশুদ্ধ আকাশের কল্পনা করা যায় না—ইচ্ছা করিলে যে কেহ চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। মনের অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিবার অভ্যাস যাঁহাদের আছে, তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, বর্ণ বাদ দিয়া আকাশের কল্পনা করা যায় না, ঈষৎ ধূসর বর্ণে রঞ্জিত করিতে হয়। তবেই যখন ইন্দ্রিয়লব্ধ উপাদান বাদ দিলে ইহার কল্পনা হয় না, তখন ইহাকে মনের স্বাধীন জ্ঞান বলা যাইতে পারে না। যদি ইহা স্বাধীন জ্ঞানই হয়, তবে এই পরাধীনতা কেন? আকাশের জ্ঞান একটা বিশ্লেষ (Abstraction) মাত্র। পদার্থের অন্যান্য গুণ বাদ দিয়া কেবলমাত্র বিস্তৃতিগুণ রাখিয়া দিলে, পদার্থের বিস্তৃতির ভাব অনুভূত হয়; এই ভাবকে আরও বিশ্লেষ করিয়া, পদার্থকে বাদ দিয়া, কেবলমাত্র বিস্তৃতির ভাব মনের অভ্যন্তরে রাখিয়া দিলে, তাহাকেই আকাশের জ্ঞান বলে। কালের জ্ঞানও যে ইন্দ্রিয়লব্ধ তাহা দেখান যাইতে পারে। ইংরাজি মনোবিজ্ঞান দ্রষ্টব্য।

১৮। পরমাণুর জ্ঞান।

পরমাণুর জ্ঞানও একটা বিশ্লেষমাত্র। আকাশের জ্ঞানে পদার্থের অন্যান্য গুণ বাদ দিয়া যেমন কেবলমাত্র বিস্তৃতি বোধ রাখিয়া দেওয়া হয়, পরমাণুর জ্ঞানে ঐ বিস্তৃতির ভাবের অভাব কল্পনা করা হয়। পরমাণু যে আছে বা থাকিবার আবশ্যকতা আছে, এই জ্ঞান যে সত্য, তাহার প্রমাণ নাই। যদি ইহা মনের স্বাধীন জ্ঞান হয় এবং সত্য জ্ঞান হয়—স্বাধীন জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে সত্য জ্ঞান হইতে হইবে, স্বাধীন জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান হইলে চলিবে না—তবে সে জ্ঞান বলিতেছে যে, পরমাণুর জ্ঞান অজ্ঞেয় অবস্থার কল্পনামাত্র। এ জ্ঞান স্বাধীন জ্ঞানই হউক আর অধীন জ্ঞানই হউক, ইহা প্রতিপাদক জ্ঞান নহে, জ্ঞানের অভাব বোধ (Negation of knowledge)। ইংরাজিতে পরমাণু, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগৎ যে মৌলিক পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাকে বলে

(Noumenon) আর এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে বলে (Phenomenon)। এই উভয়ের কল্পনা না করিলে, এই দুয়ের কাহারও জাতিবোধক কল্পনা করা যায় না। পরিদৃশ্যমান জগৎ একটি জাতিবোধক সংজ্ঞা। কোন সংজ্ঞা দিতে হইলে তাহার বিপরীত ভাব থাকা আবশ্যক, অন্যথায় সংজ্ঞা দেওয়া চলে না; মানুষ বলিলে মানুষ ভিন্ন অন্য কোন কিছু থাকা আবশ্যক; যদি মানুষ ভিন্ন আর কিছু না থাকে, তবে মানুষ সংজ্ঞার বা সেই সংজ্ঞার অনুরূপ মনোভাবের আবশ্যকতা হয় না; তবে মানুষ ভিন্ন আর সত্তা না থাকিলেও, মানুষের জাতিবোধক জ্ঞান সংস্থাপন করিতে হইলে, অভাববাচক সংজ্ঞার দ্বারা তাহা করিতে হয়, যথা—মানুষ এবং যাহা মানুষ নয়। যদি মানুষ ভিন্ন আর সত্তা না থাকে, তবে এই বিপরীত সংজ্ঞার কোন সত্তা নাই, ইহা কেবলমাত্র অভাববাচক সংজ্ঞা। অতএব পরমাণু হইতেছে, দৃশ্যমান জগতের জাতিবোধক জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান; অর্থাৎ দৃশ্যমান হইবার পক্ষে গুণবিশিষ্ট যে জগৎ, ইহা তাহা নহে; ঐ সমস্ত গুণ ইহাতে নাই। তাহা হইলে পরমাণু অজ্ঞেয় হইল। পরমাণুর জ্ঞান, অস্তিত্বপ্রতিপাদক জ্ঞান নহে, শূন্যতাপ্রতিপাদক জ্ঞান মাত্র। মনুষ্যের অতিরিক্ত সত্তা থাকিলে, মনুষ্যের জ্ঞান এবং মনুষ্যের বিপরীত জ্ঞান, উভয় জ্ঞানই বাস্তবের (Realities) জ্ঞান হইবার বাধা নাই। কিন্তু এমন স্থল আছে, যেখানে বিপরীতবাচক সংজ্ঞাদ্বয়ের উভয়েরই সত্তা না থাকিতে পারে—একটার আছে, আর একটার নাই। পরমাণুর বাস্তবতা থাকিতে পারে না; থাকিলে আর তাহা পরমাণু থাকিবে না, স্থূলতা প্রাপ্ত হইবে। পাশ্চাত্য রসায়ণের এটম্‌কে যেমন আইয়োনের প্রাদুর্ভাবে পরমাণুত্ব ত্যাগ করিতে হইয়াছে, আমাদের পরমাণুকেও তাহাই করিতে হইবে। বাস্তব শব্দ দৃশ্যমান জগতের ভাষার অভিধানের শব্দ। যে শব্দ এই ভাষার অভিধানের মধ্যে আছে, তাহারই বাস্তবতা আছে। বাস্তব বলিলেই, তাহা আমাদের জ্ঞেয় পদার্থ বলা হয়; এতএব যাহা বাস্তব নহে, যাহা বাস্তবের অতিরিক্ত, তাহাই পরমাণু—তাহার জ্ঞানই পরমাণুর জ্ঞান। বাস্তবতা শব্দের অর্থে জ্ঞেয় বাস্তবতা বুঝিতে হইবে।

১৯। অনন্তের জ্ঞান।

সর্ব্বশেষে অনন্তের জ্ঞানের বিচার করিতে হইতেছে। এই অনন্তের সন্ধান যখন কোন ইন্দ্রিয়ের নিকট পাওয়া যাইতেছে না, তখন ইহা মনের স্বাধীন জ্ঞান বলিয়া অবশ্যই সন্দেহ করা যাইতে পারে। অনন্তের জ্ঞান দ্বিবিধ: অনন্ত বিস্তার এবং অনন্ত কাল। বিস্তৃতি এবং কালের সহিতই অনন্তের জ্ঞান সংযুক্ত হইতে পারে, অন্য কাহারও সহিত হইতে পারে না। আর একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, কেবল মাত্র বিস্তৃতির সহিতই এইভাব সংযুক্ত হইতে পারে, কালের সহিত নহে। কালকে আকাশে পরিণত না করিলে, তাহাকে পরিমাপ করা যায় না—তাহা অনন্তকালই হউক, আর সান্তকালই হউক। ঘটিকাযন্ত্রে যে কাল পরিমাপিত হয়, তাহা কালের দ্বারা নহে; আকাশের, অর্থাৎ আকাশস্থ বস্তু সমূহের, দ্বারা কালের পরিমাপ। আকাশকেই খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া কালকে মাপিতে হয়, অন্যথায় তাহাকে মাপা যায় না। অনন্তকালের ধারণা করিতে হইলে, তাহাকে অনন্তবিস্তৃত কালস্রোতরূপে দেখিতে হয়; অন্যথায় ধারণা হয় না। এই অনন্তবিস্তৃতির ধারণা সান্তবিস্তৃতির ধারণার বিপরীত ভাব মাত্র (Antinomy)—একের অভাবে অন্যের জাতিবোধক (Generalised) জ্ঞান হয় না। অনন্তের কল্পনা ব্যতীত সান্তেরও কল্পনা হইতে পারে না। এখন, দুইটা বিপরীত জ্ঞানের উভয়েরই অস্তিত্ব নাও থাকিতে পারে—একটার মাত্র অস্তিত্ব আছে, অপরটা তাহার বিপরীত ভাব মাত্র—তাহার অস্তিত্ব নাই। সান্তের যে জ্ঞান, তাহা অস্তিত্ববোধক (Positive), আর অনন্তের জ্ঞান অভাববাচক। ইহা জ্ঞান নহে, ইহা অস্তিত্ববোধক অনুভূতিও নহে; পদার্থ, ইন্দ্রিয়ের নিকট যে গুণ উপস্থিত করিয়া, সান্তের অনুভব জন্মাইতেছে, ইহা তাহার অভাবমাত্র বোধক। এই অনন্তের জ্ঞানের আরও একটু রহস্য আছে—এই জ্ঞান দুইটি জ্ঞানের সমাবেশ হইতে লব্ধ: চক্ষুর অধিগম্য বিস্তৃতির সহিত আরও বিস্তৃতির সমাবেশ করা হইতেছে; এবং এই বিস্তৃতির সীমানির্দ্দেশক যে গুণ (Attribute), তাহা তিরোহিত করা হইতেছে। অনন্তের জ্ঞান যে অভাববাচক জ্ঞান,

সে সম্বন্ধে আরও একটা কথা পাওয়া যাইতেছে। ভাষার দ্বারা জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়; ঐ ভাষার নিকট হইতে অনন্তের জ্ঞানের কোন ভাববাচক পরিচয় পাওয়া যায় না। অনন্ত, অসীম, অভাববাচক শব্দ—ভাববাচক শব্দ নহে। তবেই, আমরা মনে করিতে পারি নাকি যে, এই জ্ঞান অভাব-প্রতিপাদক জ্ঞান মাত্র? ইংরাজিতেও সেই—Eternal, Infinite, Illimitable. বাস্তবিকই যদি ইহা ভাববাচক জ্ঞান হয়, তবে তৎপ্রতি-পাদক সংজ্ঞা এখনও আবিষ্কৃত হইল না কেন? এখনও চেষ্টা করিয়া ভাববাচক সংজ্ঞা সৃষ্টি করিতে পারি না কেন?

২০। পদার্থের দ্বারা একত্বপ্রতিপাদন।

সর্ব্বরূপ জাগতিক সত্তাকে আমরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি:—ব্রহ্ম, মন—সমেত আত্মা, শক্তি, জড়। পঞ্চবিধ সত্তার আর কল্পনা করা যায় না। যখন এই চতুর্ব্বিধ সত্তার কল্পনা করা হইতেছে, তখনই বলিতে হইবে যে, ইহারা সকলেই পৃথক এবং স্বাধীন—একটা আর একটার বিকৃতি বা বিকাশ হইতে পারে না। ব্রহ্মের বিকৃতি মন, শক্তি বা জড়, এ কল্পনা দুষ্ট। জগৎ কি প্রকারে ব্রহ্মের বিকৃতি হইতে পারে, তাহা কল্পনা করা যায় না। বিকৃতি এবং বিকাশ জগতের ভাষা; ইহার ভাব জগতের ভাব; এই ভাব জগতের এক বস্তুর সহিত জগতের আর এক বস্তুর সম্বন্ধ নির্ণয় করে; জগতের বস্তুর সহিত জগতের বাহিরের বস্তুর সম্বন্ধ নির্ণয় করে না। সেরূপ চেষ্টা করিলে, তাহা আত্মপ্রতারণা হইয়া পড়ে। দুগ্ধের বিকার দধি; কোরকের বিকাশ পুষ্প; বিকার বা বিকাশের সহিত জড়িত মনভাব এইরূপ ঘটনার অনুরূপ। এই মনভাব, এই শব্দ, কি করিয়া ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারে? জগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়া এই সম্বন্ধ নির্ণয়-পক্ষে পুনঃপুন বহুতর উপমা উপস্থিত করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু কার্য্যে কিছুই হইবে না। ব্রহ্মা কিরূপে বিকৃত হইলেন, কে তাঁহাকে বিকৃত করিল? অন্নরস তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন?—তাহা কিছুই স্থির করা যায় না। যদি বলা যায়, তাঁহার নিজের দেহতেই সব রহিয়াছে, তথা হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন; তবে কি জগৎ তাঁহার

দেহ? সে কথা যে বলা যায় না, পূর্ব্বে তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। তাঁহার যদি অন্য কোনরূপ দেহ থাকে এবং তাহা হইতে অন্নরস সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তবে আরও গোল উপস্থিত হয়—তিনি বহু উপাদান দ্বারা গঠিত বলিতে হয়। যদি তাহাই হয়, তবে সে বহু উপাদানের আবার আর একজন সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনার পথ রুদ্ধ হয় না। একরূপী সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা আর বহুরূপী ঈশ্বরের কল্পনার বিশেষ প্রভেদ আছে। চরম একত্বকেই ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে; একত্বের অভাব হইলে আর তাহাকে ব্রহ্ম বলা যায় না—সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা নিরস্ত হয় না। সেই একত্বের অভাব পূরণার্থ, সেই বহুরূপের অভ্যন্তরে একরূপের সন্দর্শন জন্য মন ধাবিত হয়।
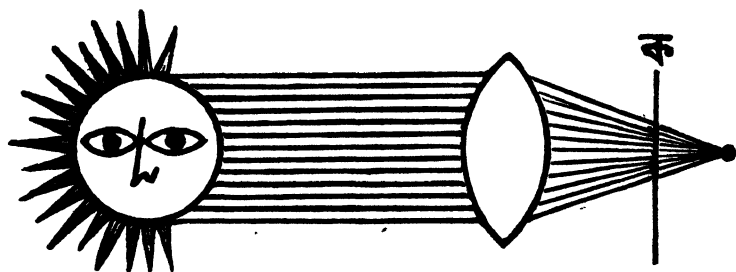
উপরোক্ত দৃষ্টান্তদ্বারা আমাদের যুক্তি স্পষ্টীকৃত করা যাউক। সূর্য্যমণ্ডলকে সমস্ত সত্তার সহিত তুলনা করা যাউক। ঐ সূর্য্যমণ্ডল হইতে রশ্মিমালা আসিতেছে; তাহা কোথাও প্রতিরুদ্ধ হইয়া প্রতিফলিত হইতেছে। যাহা দ্বারা প্রতিফলিত হইতেছে, সেই ঈষৎবর্ত্তুল কাঁচখণ্ডই একত্বপ্রতিপাদিকা বুদ্ধি। সত্তার জগৎ হইতে উত্থিত ক্রিয়াস্রোতকে বিশিষ্টরূপে কেন্দ্রীভূত করা ইহার কার্য্য। যতক্ষণ না এই জগৎ হইতে উত্থিত ক্রিয়াস্রোত সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত হইতেছে, ততক্ষণ ইহার কার্য্য শেষ হইতেছে না, 'ক' চিহ্নিত স্থানে, অর্দ্ধ পথে, এই প্রবৃত্তি শমিত হইতে পারে না। যেখানে গিয়া স্থির হইবে, সেই চরম কেন্দ্রস্থল ব্রহ্মের কল্পনা বলিতে হইবে। সেই স্থলে একটী মাত্র বিন্দু বই দ্বিতীয় বিন্দু নাই; ব্রহ্মে একমাত্র পদার্থ ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' যে পদার্থ, তাহা অবশ্য জগতের কোন পদার্থ হইতে পারে না।

আবার জগৎকে ব্রহ্মের বিকার বা বিকাশ না বলিয়া, ব্রহ্মে জগতের উপাদান সূক্ষ্মরূপে রহিয়াছে বলিলে কোন লাভ হয় না—ইহাতে স্থূল জগৎ হইতে আর একটা সূক্ষ্মজগৎ সৃষ্টি করা হয় মাত্র, সৃষ্টিকর্ত্তাকে সৃষ্টি করা হয় না। এই সূক্ষ্মজগৎকে সূক্ষ্মরূপে দেখিলে দেখা যাইবে যে, ইহা সর্ব্বাংশে এই জগতেরই অনুরূপ জগৎ—পার্থক্যের মধ্যে কেবল বিস্তারের পার্থক্য। সৃষ্টিকর্ত্তাতে এবং সৃষ্ট জগতে কেবল কি বিস্তারের পার্থক্য? ব্রহ্মতে জগতের উপাদান সূক্ষ্মরূপে রহিয়াছে না বলিয়া, ব্রহ্মের উপাদান এরূপ আশ্চর্য্য যে, তাহা জগতের সর্ব্বরূপ উপাদানের কারণ স্বরূপ, বলিলে কি হয়?—অজ্ঞেয়বাদ হয়। এরূপ উপাদান অজ্ঞেয়; কারণ, উপাদান ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া এই অজ্ঞেয়বাদকে রঞ্জিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে বটে; কিন্তু সে রঞ্জন অস্থায়ী, সে চেষ্টা অবৈধ। জগতের ভাষায়, জগতের ভাবে তাঁহাকে দেখিতে গেলে চলে না। একত্ব-প্রতিপাদিকা বুদ্ধি এই ব্রহ্মে যে ভাবে চরম একত্ব সংস্থাপনের চেষ্টা বহুদিন হইতে করিতেছে, তাহার ভিতর বিশেষ দোষ আছে। জ্ঞেয় পদার্থ কখন সম্পূর্ণ একরূপী হইতে পারে না; বহুরূপী না হইলে জ্ঞান হয় না। জগতের জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মকে কলুষিত করিয়া একত্ব সংস্থাপন করিতে গিয়াছে বলিয়াই ঐরূপ চেষ্টাতে দোষ বর্ত্তিয়াছে। এই চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ চেষ্টা করিলে একত্বপ্রতিপাদিকা বুদ্ধির চরম সফলতা হইতে পারে। সে পথ কি? পাঠক, উত্তর অনুভব করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখিতে হইবে, তাহাই একত্বপ্রতিপাদনের একমাত্র পথ কিনা। এ প্রকারেও যদি সফলতা হয়, তবে এই বুদ্ধি একেবারে নিষ্ফল হয় না। ব্রহ্ম ও জগতের একত্ব সম্পাদন করিতে হইলেও, এই বুদ্ধিকে অজ্ঞেয়ের রাজ্যে যাইতে হইবে, সেই রাজ্যে গিয়া একত্ব সংস্থাপন করিতে হইবে। অবশ্য যথায় জ্ঞেয় একত্ব সংস্থাপন করা সম্ভব, তথায় অজ্ঞেয় একত্বের দিকে যাওয়া চলে না।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সত্তাকে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখিতে পারি; এই বুদ্ধিকে আর বেশী অগ্রসর না হইতে অনুরোধ করিতে পারি; কিম্বা ইহাদের মধ্যেও একাধিক সত্তার মৌলিক একত্ব দেখাইয়া ইহাদের সামষ্টিক

বহুত্বের লাঘব করিতে চেষ্টা করিতে পারি। প্রথমে ব্রহ্ম হইতে নিম্নমুখে আসিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ একত্ব সংস্থাপন করা গিয়াছে; এখন নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে যাইবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নের সহিত যে একত্ব সংস্থাপন করা সম্ভবপর, তাহা অজ্ঞেয় হইতে জ্ঞেয়ের দিকে আসিয়া একত্ব সংস্থাপন; আর এখন আমরা যে পথ অবলম্বন করিব, তাহা জ্ঞেয় হইতে অজ্ঞেয়ের দিকে যাইয়া সেই একত্ব সংস্থাপন।

কোনরূপ জ্ঞেয় উপায়ে জড় ও শক্তির মধ্যে একত্ব সংস্থাপন করা যায় না। এই উভয়কে একটী সংজ্ঞাদ্বারা ব্যক্ত করা যাইবে—পদার্থ। এই উভয়ের সম্মিলিত অবস্থার—অর্থাৎ পদার্থের—ক্রিয়া আছে। ক্রিয়া আছে বলিয়াই ইহা ব্যক্ত, অনুভূত এবং জ্ঞেয়; অন্যথায় অজ্ঞেয়। পূর্ব্ব-বর্ণিত চতুঃসংখ্যক সত্তার তৃতীয় সংখ্যক সত্তা হইতেছে—মন, সমেত আত্মা। এই মনের কিন্তু পৃথক ক্রিয়া আছে এরূপ কল্পনা না করিয়া, ইহার ক্রিয়াকে পদার্থের ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পদার্থকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: ১। জড়ীয় পদার্থ, ২। জীবিত পদার্থ। এই উভয় পদার্থের ক্রিয়ার মধ্যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়; জীবিত পদার্থের সমস্ত ক্রিয়া যে জড়ীয় পদার্থের ক্রিয়ার অনুরূপ, ইহা সর্ব্বাংশে দেখান যায় না। যে অংশে দেখান যায় না, মনকে সেই ক্রিয়াংশের কর্ত্তাস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়া থাকে। তাহা না করিয়া জড়ীয় পদার্থের যে ক্রিয়াংশ বর্ত্তমানে অজ্ঞাত রহিয়াছে, তাহাকেই কারণস্বরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জড়ীয় পদার্থের ক্রিয়ার যৎসামান্য অংশই পূর্ব্বে আমরা জানিয়াছিলাম, এখন আরও কিছু জানিয়াছি যথা—Molecular energy, power of X' Rays ইত্যাদি। ভবিষ্যতে যে আরও জানা যাইবে, হয়ত কোন কালেই ইহাকে সম্পূর্ণরূপে জানা যাইবে না, ইহাই সিদ্ধান্ত; ইহাই সিদ্ধান্ত না হইয়া পারে না। মনের সত্তা সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়াও, কেবল মাত্র ইহার ক্রিয়ার আলোচনা করিয়া, আমরা একত্বপ্রতিপাদকা বুদ্ধির বিস্তার করিতে পারি: পদার্থই জ্ঞেয়; মন, ব্রহ্ম, অজ্ঞেয়—অর্থাৎ পদার্থের ক্রিয়াই জ্ঞেয়, ইহাদের ক্রিয়া অজ্ঞেয়। বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ক্রিয়াবিহীন যে সত্তা, তাহা জ্ঞেয়

হইতে পারে না, ক্রিয়ার দ্বারাই জ্ঞেয় হয়। একমাত্র পদার্থের ক্রিয়াকে জ্ঞেয় রাখিয়া, অন্য সমস্ত অজ্ঞেয় রাখা যাইতে পারে। পদার্থের শক্তি যখন জানিতে যথেষ্ট বাকী রহিয়াছে, তখন এই শক্তির দ্বারা দেহের সংসৃষ্ট সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, ইহা মনে করিবার বাধা কি আছে? এখন, জড়পদার্থের অজ্ঞেয় অংশকে অজ্ঞেয় ক্রিয়া, জীবিত পদার্থের অজ্ঞেয় অংশকে মনের ক্রিয়া এবং সৃষ্টিপদ্ধতির অজ্ঞেয় অংশকে ঈশ্বরের ক্রিয়া বলা যাইতে পারে। এই সমস্তই অজ্ঞেয়ের বিভিন্ন নামকরণ মাত্র। বিভিন্নরূপ নামকরণ করিলেও তদ্দ্বারা ইহারা কেহ জ্ঞেয় হইবে না। তবে ঐরূপ নামকরণের বিশেষ অপায় আছে—ইহাতে কুসংস্কারের পথ উন্মুক্ত থাকিয়া যায়, অজ্ঞেয়ের দ্বারা জ্ঞেয়কে কলুষিত করিবার পথ উন্মুক্ত থাকিয়া যায়।

"তাহা হইলে জড় হইতে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় রহিল?"

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভাব আমাদের বড়ই প্রিয়। কেহ ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছেন, শূদ্র অপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠ; কেহ জৈবনিক, জড় অপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্ব বংশানুগত বই, কার্য্যের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে কই? জৈবনিক জড়ের উপর আধিপত্য করিতেছে, ইহাই কি শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ? আধিপত্য যে করিতেছে তাহার প্রমাণ কোথায়? যেখানে এক প্রাণী, অন্য প্রাণীকে তাহার জীবনের হানি করিয়া, নিজের জীবনের পোষকতা করিতে বাধ্য করে, সেই স্থলে আধিপত্য করা হয়। এ ভাব জীবের সহিত জীবের সম্বন্ধজ্ঞাপক, জড়ের সহিত জীবের সম্বন্ধজ্ঞাপক ভাব নহে। জড়ের নিজের কোন স্বার্থের হানি করিয়া জীব যে তাহাকে জীবের পোষকতা করিতে বাধ্য করিতেছে, ইহার প্রমাণ কোথায়? অতএব জড় হইতে যে আমরা শ্রেষ্ঠ, এ ভাব ভিত্তিহীন, সংস্কারমূলক; ইহা একটা অহঙ্কার, মাৎসর্য্য। এরূপ শ্রেষ্ঠতার দাবীদাওয়া না রাখাই ভাল; রাখিতে গেলেই বা তাহার বাস্তবিকতা কোথায়? কল্পনাদ্বারা কোন শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ আসন গঠন করিলে, তাহার বাস্তবতা আইসে না। এই মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়াই, পূর্ব্বলিখিত মত মনের উদ্দেশে আমরা একটা প্রতিমা (Fetish) গঠন করিয়া পূজা করিয়া থাকি; এই শ্রেষ্ঠতার মোহে

এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি যে এখন তাহার সারশূন্যতা বুঝিতে যতদূর সম্ভব আপত্তি করি।

"জড়কে আমরা আমাদের ইচ্ছামত গঠিত করিতেছি; ইহাই শ্রেষ্ঠত্ব।"

জড় যে ইচ্ছা সমেত তোমাকে ধ্বংস করিতেছে! শ্রেষ্ঠতা কাহার?

"মনের স্বতন্ত্র ক্রিয়া না রাখিয়া জড়ের বা দেহের ক্রিয়াই মনের ক্রিয়া বলিলে, কি লাভ?"

১ম। লাভ : একত্বপ্রতিপাদিকা বুদ্ধির অধিকতর তৃপ্তি।

২য়। লাভ : মনের ক্রিয়া আর ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জানা যায় না, মনের দ্বারাই জানিতে হয়। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে পদার্থকে জানা যায়, মনের ক্রিয়া সেই পদার্থের ক্রিয়া হইলে, তাহা আরও বোধসুলভ হয়; কেবল মনের দ্বারা মনকে গঠন না করিয়া দেহের উপাদানের দ্বারা মনকে উচ্চভাবে গঠন করা যায়। মনকে এইভাবে লইলে, স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ইত্যাদি—বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; ইহাদের ব্যতিক্রম হইলে মানসিক ঔষধের উপর আবার শারীরিক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিকার করা যাইতে পারে। এমনও দিন আসিতে পারে, বহু আয়াসসাপেক্ষ চিত্তবৃত্তিনিরোধ প্রভৃতি মানসিক অবস্থা, শারীরিক ক্রিয়ার দ্বারা, বৈজ্ঞানিক উপায়ের দ্বারা, সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

৩য়। লাভ: মনের ক্রিয়াকে স্বতন্ত্র আসন দিয়া যে সমস্ত কুসংস্কারের পথ মুক্ত করা হইয়াছে, তাহা রুদ্ধ করা যাইতে পারে।

৪র্থ। লাভ : মনের ক্রিয়াকে এইরূপ স্বতন্ত্রতা দেওয়া বাহুল্য মাত্র—অনাবশ্যক। ইহা না দিলে কোন ক্ষতি নাই, বুঝিবার কোন ব্যাঘাত নাই; আর দিলে বুঝিবার সৌকর্য্য কিছুই হয় না। বাহুল্য বস্তু, বাহুল্য কারণ, ত্যাগ করাই ন্যায়দর্শনের ব্যবস্থা। মনের যে সকল ক্রিয়া দেহের ক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্ত করা যাইতেছে না, তাহা আংশিক জ্ঞেয় এবং আংশিক অজ্ঞেয়। স্মরণ রাখিতে হইবে, অজ্ঞেয়ের ভিন্ন নামকরণ করিয়া তাহার অজ্ঞেয়তা তিরোহিত করা যায় না; অজ্ঞেয় ক্রিয়াকে মনের ক্রিয়া বলিলে কোনও ফল লাভ হয় না। মনের ক্রিয়া যদি পদার্থেরই

কোন জটিলতম সমাবেশের ক্রিয়া হয়, তবেই তাহা বিশ্লেষ করা যাইবে, তাহার জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে; অন্যথায় তাহা পদার্থ নহে, পদার্থ ছাড়া অন্য কিছু, এইমাত্র জ্ঞান থাকিয়া যাইবে; কোন কালে তাহার আর বৃদ্ধি করা যাইবে না।

এখন মনের দ্বারা একত্বসম্পাদনের চেষ্টার ফল দেখা যাউক। মনই আদিম মৌলিক সত্তা, পদার্থের সত্তা নাই; ইহা মনেরই সৃষ্টি, কিম্বা যদি কোন সত্তা থাকে, তাহা অজ্ঞেয়। মন যেরূপ দেখাইতেছে সেইরূপ দেখিতেছি, যেরূপ শুনাইতেছে সেইরূপ শুনিতেছি, যেরূপ অনুভব করিতেছে সেইরূপ অনুভব করিতেছি; সমস্তই মনের ক্রিয়া, বাহ্যজগৎ বা দেহের ক্রিয়া নাই। মনের দ্বারাই যখন বাহ্যবস্তু এবং দেহের জ্ঞান হইতেছে, মন ব্যতীত যখন কিছুরই জ্ঞান নাই, তখন যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, করিতেছি, সব মনের ক্রিয়া। পদার্থ মন হইতে বিক্ষিপ্ত বস্তু মাত্র।

এরূপ ভাবিয়া কি লাভ করিলাম? এইরূপ ভাবিবার পক্ষে প্রথম অন্তরায়: যে অজ্ঞেয়ত্ব মনের উপর অর্পিত হইতেছিল, তাহা তথা হইতে তুলিয়া লইয়া দেহ, পদার্থ, বাহ্য জগতের উপর নিক্ষেপ করা হইল মাত্র। যাহা পদার্থের ক্রিয়া বলিয়া ব্যক্ত, তাহা তাহার ক্রিয়া না বলিয়া মনের ক্রিয়া বলিলেও, সেই মনকে মানসিক পদার্থের চক্ষে দেখা, জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। পদার্থকে মানসিক পদার্থ বলিলে, কিম্বা পদার্থিক মন বলিলেও, পদার্থকে পদার্থের ন্যায়ই ব্যবহার করিতে হইবে। জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে—ইহা অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ উচ্চতর জীবনলাভ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই উচ্চজীবন অর্থে- চাঞ্চল্যের বৃদ্ধি। মনের স্বতন্ত্র ক্রিয়া নির্দ্দেশ করিয়া জ্ঞান লাভের সহায়তা কিরূপে হইতেছে? মনের কোন ক্রিয়া থাকিলে, তাহার জেয় কোন স্বাধীন ক্রিয়া থাকিলে, ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া যায় বটে। বলা যাইতে পারে, তাঁহাতেই উচ্চতর জীবনলাভ হয়—জড়বাদে তাহা হয় না। ইহার বিচার পরে করা যাইবে। এখন মনের দ্বারা, একত্বপ্রতিপাদনের দ্বিতীয় অন্তরায় অগ্রে বিচার্য্য হইতেছে। সবই যখন মনের ক্রিয়া, আমার

মন যে পদার্থের কেন্দ্রে নিহিত রহিয়াছে, তাহা যখন আমার মনেরই বিক্ষিপ্ত বস্তু, তখন আমার মনের অভাবে এই জগতের অস্তিত্বের অভাব হইবে, এরূপ মনে করিতে পারা উচিত। কিন্তু তাহা পারি না কেন? বরং আমার মনের অভাবেও জগতের অস্তিত্ব থাকিবে, সেই মনের দ্বারাই এইরূপ ধারণা করিতে বাধ্য হই কেন?

"উত্তর—দ্বিবিধঃ : ১ম। মনের অস্তিত্ব নষ্ট হয় না—ইহা নিত্য; ২য়। ইহার অস্তিত্ব না থাকিলে, অন্য অস্তিত্ব থাকিবে না, ইহা মনে করিতে রুদ্ধ নহি।"

প্রথম আপত্তি মিমাংসার চেষ্টা করা যাউক। এইরূপ আপত্তি হইবে বলিয়াই আমি 'মনের অস্তিত্বের অভাব' বলি নাই, 'মনের অভাবে জগতের অস্তিত্বের অভাব' বলিয়াছি। মনের অভাব দ্বিবিধ, মনের অস্তিত্বের অভাব ও স্থায়িত্বের অভাব। স্থায়িত্বের অভাব অর্থে, একই ভাবে স্থায়িত্বের অভাব, অর্থাৎ পরিবর্ত্তন। বাস্তবিক পক্ষে মনের ধ্বংস না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার মন ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, ঐরূপ কল্পনা করা কি নিতান্ত অসম্ভব? যদি অসম্ভব না হয়, আমার মনের ধ্বংসের সহিত জগৎ অন্তর্হিত হইবে, ঐরূপ কল্পনা কিন্তু অসম্ভব। আমার মনের পরিবর্ত্তনে জগৎ পরিবর্ত্তিত হয়, না জগতের পরিবর্ত্তনে আমার মন পরিবর্ত্তিত হয়? জগতের পরিবর্ত্তনের যে অনুভূতি, তাহাই মনের পরিবর্ত্তন। কাহার চিত্রপটে কে চিত্রিত হইতেছে? এই মন, এক না বহু রূপ? প্রথমে মনে করা যাউক—বহু; প্রত্যেক মনুষ্যের, পশুপক্ষীর, কীটপতঙ্গের স্বতন্ত্র, ভিন্নপ্রকৃতির মন আছে। মনসমূহ স্বতন্ত্র হইলেও, তাহাদের চিত্রন কার্য্য কিন্তু একইরূপ। বাহ্যজগৎকে যে সকলে একই ভাবে চিত্র করে, তাহা আমার ও অন্যের মনের অভিব্যক্তির দ্বারা জানিতে পারি। কেবল মাত্র ভাষার দ্বারাই অভিব্যক্তি হয় না, কার্য্যের দ্বারাও হয়। পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, জগৎকে যে আমারই ন্যায় দেখে, তাহার আর বিশেষ প্রমাণ দিবার আবশ্যক দেখা যায় না। ত্রিভুজ ভূমিখণ্ডের এক বাহু অন্য বাহুদ্বয় অপেক্ষা কম দীর্ঘ, সেই ভূমিখণ্ড বেষ্টন করিতে হইলে, তাহার দুই বাহুকে বেষ্টন না করিয়া এক বাহুকে বেষ্টন

করাই যে সুবিধা, পশু পক্ষীও তাহা অবগত আছে। বাহ্যজগৎ মধ্যে গণিতের প্রাবল্য কীট পতঙ্গের নিকটও নিতান্ত অপরিচিত নহে। অর্থাৎ কীট হইতে মনুষ্যের মন যে জগৎ চিত্রিত করিতেছে, তাহার ভিতর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য অলঙ্ঘনীয়; মন তাহা বাদ দিয়া ভিন্নরূপে অঙ্কিত করিতে পারে না। এই সাদৃশ্য দর্শনের নামই জ্ঞান। বিভিন্ন ব্যক্তির মনের চিত্র যে বিভিন্ন নহে; সেই বিভিন্নতা যে ভ্রান্তি মাত্র; সকলের মনের চিত্র যে একইরূপ, সকলে একইরূপে যাহাতে চিত্রিত করিতে পারে; বর্ত্তমানে এই চিত্রনে যে বৈষম্য হইতেছে, সঙ্ঘর্ষ হইতেছে, যুদ্ধ বিগ্রহ হইতেছে, তাহা দূরীভূত হইয়া সকলেই আপনার বাহিরে যে জগৎ তাহাকে অন্যের বাহিরের জগতের সর্ব্বাংশে অনুরূপভাবে চিত্রিত করিতে পারে; ইহাই জ্ঞানের কার্য্য। তাহা হইলে জগৎকে, যাহার মন যে ভাবে ইচ্ছা সেইভাবে চিত্রিত করিতে পারে না। জগতের নিজেরই শরীর রহিয়াছে।

"মনের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে, তজ্জন্যই বিভিন্ন মনের অঙ্কিত চিত্রের সাদৃশ্য হয়—জড়ের শরীর আছে বলিয়া নহে।"

ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, মনের কয়েকটা সাধারণ নিয়ম আছে, মাত্র তাহা নহে, মন সম্পূর্ণরূপে এই সাধারণ নিয়মের অধীন—নিজে এক বিন্দুও চিত্রিত করিতে পারে না, সাধারণ নিয়মই চিত্র করায়। মনের বা মনের সাধারণ নিয়মের কর্ত্তৃত্ব চলিয়া গেল। ইহা মনের সাধারণ নিয়ম নহে, মনের অতিরিক্ত সাধারণ নিয়ম।

"মনের কর্ত্তৃত্ব গেল না। মনেরই সাধারণ নিয়ম—জড়ের নহে।"

তাহাই যদি হয়, তবে এই যে জগৎ ইন্দ্রিয়ের সমক্ষে বিস্তৃত রহিয়াছে, ইহাকে অন্য ভাবে গঠিত করিতে পারি না কেন? চক্ষের সম্মুখে যে জগৎ বিস্তৃত রহিয়াছে, মনের মধ্যে তাহার কোন অংশ ত্যাগ বা কোন অংশ নূতন করিয়া গঠিত করিলে, মনোজগতের গঠিত মূর্ত্তির সহিত ইন্দ্রিয়ের সমক্ষে স্থাপিত বাহ্যমূর্ত্তির বৈলক্ষণ্য হয় কেন? ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে স্থাপিত মূর্ত্তিও মনের মধ্যে গঠিত মূর্ত্তির অবয়ব ধারণ করে না কেন? মনের মধ্যে গঠিত জগৎকেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ বলিয়া ব্যবহার

করিলে, সাধারণত তাহাকে মনের শক্তি না বলিয়া বাতুলতা, অর্থাৎ মনের বিকৃত অবস্থা বলে কেন? অতি সুন্দর স্বাভাবিক দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাতে কতশত বৃক্ষলতা ফলপুষ্প পশুপক্ষী সজ্জিত রহিয়াছে; কিন্তু এই দৃশ্যের মধ্যস্থলে এক গলিত শবদেহ পতিত থাকিয়া সৌন্দর্য্য উপভোগের বাধা জন্মাইতেছে। মন এই শবকে বাদ দিয়া এই দৃশ্য গঠিত করিতে পারে কি? হস্তপদের সাহায্যে স্থানান্তরিত করা যায়, কিন্তু মন পারে না কেন? মনই যখন নির্ম্মাতা, তখন পারে না কেন? মনই যদি জগৎকে গঠন করে, তবে মনের অপ্রীতিকর পদার্থকে বাদ দিয়া গঠন করে না কেন? দ্বিবিধ উত্তর হইতে পারে; ১ম। মনের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে, যাহা বাদ দিয়া মন গঠন কার্য্য করিতে পারে না। ২য়। স্বাধীনভাবে গঠন করিতে পারে—যোগবলে।

প্রথম আপত্তির খণ্ডন অগ্রে করা যাউক। মন তাহা হইলে নির্ম্মাতা নহে, সেই সাধারণ নিয়মই নির্ম্মাতা। কীট পতঙ্গের মন, শিশুর মন যে জগচ্চিত্র চিত্রিত করে, বয়ঃপ্রাপ্ত শিক্ষিত মনুষ্য তাহা হইতে অনেক সূক্ষ্ম বিচিত্রতাপূর্ণ চিত্র চিত্রিত করিতে সমর্থ হয়। এই সামর্থ্য আবার জগতের সহিত পরিচয়ের ফল; অতএব ইহা অনুমান করা অধিকতর সঙ্গত নয় কি যে, জগতের শরীর আছে—মন তাহারই ছায়াচিত্র গ্রহণ করে। তবে যে অনুভবের বৈলক্ষণ্য হয়, বর্ণান্ধ ব্যক্তিবিশেষ যে হরিৎ বর্ণকে শ্বেত বর্ণের ন্যায় দেখে, তাহার কারণ যে মন নহে, দেহের বৈলক্ষণ্য, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় আপত্তির আর প্রত্যুত্তর অনাবশ্যক, বহুবার দেওয়া হইয়াছে। চৈতন্যবাদ শুনিতে বেশ উচ্চ ধরণের কথা; কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে, ইহা নিতান্ত অসার কথা। চৈতন্যবাদের দ্বারা একত্বসংস্থাপন হইতে পারে না, অথচ ইহাও এই বুদ্ধির ভ্রান্ত অভিব্যক্তি।

এ পর্য্যন্ত প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করা গিয়াছে যে—

১। জ্ঞানের উদ্দেশ্য, উচ্চতর জীবন লাভ।

২। বিশ্লেষ করিতে করিতে, যে সমস্ত মৌলিক উপাদানে সত্তা গঠিত, তাহাতে পৌঁছান জ্ঞান—একত্বে পৌঁছান চরম জ্ঞান।

৩। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গ্রাহ্য বস্তুকে জ্ঞেয় বস্তু বলা যায়।

৪। অজ্ঞেয় হইতে জ্ঞেয়ের দিকে আসা যাইতে পারে না; কারণ অজ্ঞেয় বলিলেই অগ্রে কিছু জ্ঞেয় হইয়াছে বুঝায়। জ্ঞেয় হইতে ক্রমে অজ্ঞেয়ের দিকে যাইতে হয়। অজ্ঞেয়ত্বের যে মনভাব, তাহা বিশেষ জ্ঞানসাপেক্ষ। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ হইতে অসভ্য মূর্খের জ্ঞেয়ত্বের উপযোগী মনভাব আছে, অজ্ঞেয়ের উপযোগী মনভাব নাই; অজ্ঞাতের উপযোগী মনভাব আছে মাত্র। সেই ক্রিমি কীট হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের মন জ্ঞেয় হইতেই অজ্ঞেয়ের দিকে গিয়াছে, বিপরীত ভাবে যায় নাই।

২১। উপসংহার।

এখনও যদি কেহ বলেন যে, মনের স্বাধীন জ্ঞান আছে, দেবতার, পরকালের অনুভূতি, তাঁহার মনে স্বতঃই উৎপন্ন হইতেছে, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, বাস্তবিকই কি প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি বলিতে পারেন যে, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা তাহার অনুভূতির কোন অংশ গ্রহণ না করিয়া, তিনি এই স্বাধীন জ্ঞান অনুভব করিতেছেন? মনের স্বাধীন জ্ঞানই যদি হইল, তবে ইন্দ্রিয়ের নিকট ভিক্ষা কেন? তিনি কি বলিতে পারেন যে, এই স্বাধীন জ্ঞানের সম্পূর্ণ অংশই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা সংগৃহীত হয় নাই? ইহা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানলব্ধ উপাদানসমূহের কল্পিত সংযোজনা মাত্র নহে? যদি বলেন, "না, তাহা নহে"। তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, ইহা যে তাঁহার সংস্কার মাত্র, ব্যাধি মাত্র নহে, কিম্বা হইতে পারে না, তাহা কি তিনি নিসংশয়ে বলিতে পারেন? যদি পারেন, তবে তাঁহার বিশ্বাস দূরীভূত করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে তাহা সরলান্তঃকরণে বলিতে পারে না, তাহাকে বুঝাইবার তাঁহারও কিছুই নাই; অন্যের দোহাই মাত্র দিতে পারিবেন—অমুক স্বামী, অমুক জ্ঞানানন্দ, এবম্প্রকার দেবতাদি সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন, এই সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করিতে পারিবেন। তবে নিজের চক্ষু কর্ণ তুলিয়া রাখিয়া পরচক্ষে সে দেখিতে প্রস্তুত নহে, তাহার কিছুই করিতে পারিবেন না। ইহাও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, স্বামীরাই বা মনের

স্বাধীন দৃষ্টির দ্বারা দেবতা দর্শন করিতে পারেন কেন, আর আমিই বা পারিনা কেন? হয় আমার সে দৃষ্টি শক্তি নাই, অথবা তাহার চর্চ্চা নাই। তবে দেখা যাইতেছে, সাধারণত লোকের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের পথই উন্মুক্ত থাকে, মনের স্বাধীন জ্ঞানের পথ অল্প লোকেরই পক্ষে সম্ভাবিত হয়। যদি কাহারও সেই উচ্চ জ্ঞানের উপায় না থাকে, বা তাহাতে বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অভাব থাকে, তবে তাহাকে 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' অবলম্বন করিতে হয়। এই সব মহাজনের উপর বিশ্বাস করিয়া অন্ধের ন্যায় তাঁহাদের অনুসরণ করিতে যে প্রস্তুত, সে তাহাই করিবে; যে তাহাতে প্রস্তুত নহে, তাহাকে অন্য চেষ্টা দেখিতে হইবে। যদি এই জ্ঞান সামান্যরূপে সকলেরই মনের ভিতর বিদ্যমান থাকে, তবে এক উপায় আছে: চর্চ্চার দ্বারা তাহার স্ফুরণ করা যাইতে পারে। ঐ চর্চ্চা আর কি?—যোগাদি। যোগাদির দ্বারা যতক্ষণ উচ্চজ্ঞান লাভ করা না যাইতেছে, ততদিন তুমি আমি কি করিব? বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইব, না যে অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান রহিয়াছে, তাহার অনুসরণ করিব? কে ইহা স্থির করিয়া দিবে? কে পথ দেখাইবে?—প্রবৃত্তি।

প্রবন্ধের স্থূল মর্ম্ম।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হইতেছে—প্রচলিত সামাজিক কুপ্রথাসমূহ যুক্তির দ্বারা অপ্রতিপন্ন করা। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রথম প্রশ্ন করা হইল:—কর্ত্তব্য কার্য্য কি?

উত্তর:—অপেক্ষাকৃত স্থায়ী প্রবৃত্তি সমূহের অনুসরণ ও অনুশীলন।

এই প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিপন্ন করিতে প্রবন্ধের অল্পাংশই ব্যয়িত হইয়াছে; আপত্তিনিরাকরণচেষ্টাতেই অধিকাংশ আবৃত হইয়াছে।

১ম। আপত্তি:—শাস্ত্রানুসরণই কর্ত্তব্য।

উত্তর:—অষ্টবিধ কারণে কেবলমাত্র শাস্ত্রানুসরণ অযৌক্তিক। অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে জ্ঞানের দ্বারা শাস্ত্রকে পরীক্ষা করিতে হইবে। ঐরূপ শাস্ত্রানুসরণ—জ্ঞানের অনুসরণ মাত্র; কারণ, জ্ঞানসম্মত না হইলে

শাস্ত্রানুসরণ করা হইল না, কিন্তু শাস্ত্রসম্মত না হইলেও জ্ঞানানুসরণ নিষিদ্ধ হইতেছে না।

২য়। আপত্তি :—আধ্যাত্মিকতা—অর্থাৎ ঈশ্বর, আত্মা, পরকালের অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য।

উত্তর :—এই আপত্তি নিরাকরণার্থে বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশবাদ ও দার্শনিক অজ্ঞেয়বাদের অবতারণা করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা গিয়াছে যে, ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল, অজ্ঞেয়। জ্ঞেয় বিষয় ছাড়িয়া অজ্ঞেয় বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতে পারে না।

৩য়। আপত্তি :—নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণ কর।

উত্তর :—ইহার উত্তরে দেখাইতে চেষ্টা করা গিয়াছে যে, জীবের পক্ষে তাহা পন্থা নহে—প্রবৃত্তির অনুসরণই পন্থা।

৪র্থ। পরিচ্ছেদে কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্দ্দেশের চেষ্টা করা গিয়াছে।

৪র্থ। আপত্তি :—জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যার উপর প্রথম চারি পরিচ্ছেদের যুক্তিযুক্ততা নির্ভর করিতেছে। জ্ঞানের বিস্তৃত ব্যাখ্যাতে ঐ সমস্ত যুক্তি অপ্রতিপন্ন হইয়া যাইবে।

উত্তর :—ইহার উত্তরে জ্ঞান কাহাকে বলে, মনের ক্রিয়া কি, তাহা দেখাইয়া চতুর্থ পরিচ্ছেদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্মের যুক্তিযুক্ততা সংস্থিত রাখিবার চেষ্টা করা গিয়াছে।

প্রাসঙ্গিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহের বিস্তৃত আলোচনা করা যায় নাই ; কারণ, তাহার আবশ্যকতা নাই। যতটা আবশ্যক, তাহারই আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকা গিয়াছে। বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বলিয়া মনের ক্রিয়ার বিচার শেষ পরিচ্ছেদে করা গিয়াছে।

—*—